নারায়ণ

সম্পাদক—
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বৈশাখ।
১৩২৭

সহকারী সম্পাদক—
শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

অগ্রহায়ণ, ১৩২২ হইতে বৈশাখ, ১৩২৩

দ্বিতীয় বর্ষ—প্রথম খণ্ডের

সূচীপত্র।

[বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক।]

সূচীপত্র।

[লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নামানুসারে]

লেখক বা লেখিকা	বিষয়		পৃষ্ঠা
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	অন্তর্যামী (কবিতা)	...	৪৩৬
" নরেন্দ্রকুমার ঘোষ	ভৈরবী (কবিতা)	...	৫৮৪
" পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ	নারীর অধিকার	...	২৯৭
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	নববর্ষ	...	৪৪
" পুলকচন্দ্র সিংহ	স্বর্গ-রাজ্য (কবিতা)	...	২৫৭
" পূর্ণচন্দ্র সেন	অনন্ত (কবিতা)	...	৫৭২
" প্রফুল্লকুমার সরকার	জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ	...	২২৫
" প্রফুল্লচন্দ্র বসু	ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র	...	৫২৪
" ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	সমুদ্র-দর্শনে (কবিতা)	...	১৫১
ঐ	ত্রিবিগ্রহ-তত্ত্ব (কবিতা)	...	২২৪
ঐ	শঙ্খের প্রতি (কবিতা)	...	২৮৮
ঐ	মহাপ্রসাদ (কবিতা)	...	৬৬৯
শ্রীমতী মানকুমারী বসু	নারায়ণ (কবিতা)	...	৫৮৫
শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার	প্রাচীন কবির কবিতা	...	৪৩৪
" বিপিনচন্দ্র পাল	ধর্ম্ম ও আর্ট		৭
ঐ	শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ১১৮, ৩১৩, ৪২০, ৫৪৪, ৬৭০		
ঐ	হিন্দু-শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার	...	১২৫
ঐ	বৈষ্ণব কবিতার কথা	...	৩২১
ঐ	ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন	...	৪৩৯
ঐ	তত্ত্বচিত গৌরচন্দ্র	...	৫৪৯
ঐ	মহাজনপদাবলী ও রসকীর্ত্তন	...	৫০৫
" শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	হিন্দুদিগের ভূতত্ত্ব	...	৪৬৯
" সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	বোল্-বোলা হৃদয়	...	৩৯৩
" ঐ	নিয়তির খেলা (কথা-নাট্য)	...	৫৮৭
" সন্তোষকুমার রায়	শীতে (কবিতা)	...	২৭৫
সম্পাদক	কিশোর-কিশোরী (কবিতা)	...	১
ঐ	প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (গল্প)	...	৯৭
ঐ	গান ১২৩, ১৬৪, ২০১, ২০১, ৪১৯, ৪৩৩, ৬৮০		
শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়	ছোট-গল্প	...	৩৭০
" সুশীলকুমার দে	মরীচিকা (কবিতা)	...	৫৪
ঐ	কাণ্ডারী (কবিতা)	...	৫৫
ঐ	দুই পথ (কবিতা)	...	৬৬৮
" হরনারায়ণ সেন	খেলা (কবিতা)	...	৪৬৮
" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	রাধামাধবোদয়		৩১, ৬৩৮
ঐ	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম		১৬৫, ২৭৬, ৫৩৩
ঐ	কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা	...	৪০৩

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা]   [অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল

কিশোর-কিশোরী

[৬]

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন ;
এস নাই কোন কালে
ফোট নাই কোন দিন,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
সব শূন্য পূর্ণ ক'রে
এমন মরম ভ'রে !

তুমি যে মধুর!
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার!
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার!

বারে বারে সেই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে!
কত ফুল কত হাসি,
কত ভাল-বাসা-বাসি,
কত দুখ্ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক্,
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,
কত সোহাগের কথা,
কত বুক্-ভাঙ্গা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি :—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙ্গিয়াছে!

জনমে জনমে পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে
মরণের পারে পারে
এক সঙ্গে একেবারে
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে!

যত ভাঙ্গা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙ্গেছিল,
সব্ই যে গো প্রাণপুটে
রাঙ্গা হয়ে ফুটে উঠে,
অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে!
প্রাণ ঢল ঢল!
আঁখি ভরা জল!
শত জনমের পাওয়া না পাওয়ার মাঝে
যত-না হারাণ ধন, সব্ই মিলিয়াছে!

যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা!
জনম জনম ধ'রে
সকল মরম ভ'রে
গুণ্ গুণ্ গাহি গান
ছল ছল দুনয়ান
খুঁজিত খুঁজিত যারে!
ওগো পাইলাম তারে!
সেই সন্ধ্যাকাশতলে
নব শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত!
ওগো তুমি সেই!
তুমি সেই সেই!
যারে পাই নাই কভু! যার তরে আশা,
জীবন কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা!

জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন !
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—
শতেক জনম ধ'রে
সকল পরাণ ভ'রে ?
সকল জনমে আঁখি
চহেনি কি থাকি থাকি
কোন সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে !
তারি চিত্র স্বপ্ন বেয়ে
ছিল নাকি মর্ম্ম ছেয়ে ?
তারি গন্ধ চিত্ত-হারা
করেনি কি আত্মহারা ?
গীত কাতরতা,
মিলন বারতা
আনে নাই থাকি থাকি ? হে প্রাণ রতন !
শত জনমের চাওয়া এ মধু মিলন !

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা !
যে দীপ জ্বালিনি ওরে ! সেই দীপ আলা !
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল দুলায়ে রঙ্গে ?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা !
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে !—
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে ! তারি আলো জ্বালা !

যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার
ফোটে কি মরমে
শতেক জনমে ?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা !
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ ! কি আলোক জ্বালা !

ওরে দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ কি জানি জেগেছে !
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধুম লেগেছে !
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে !
ফুলে ফুলে ফুলাফুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে !
লালে লালে বাঁধা হ'য়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে !
কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে ফুটি ফুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি ?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রঙ্গে ?
ওরে দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ কি ধুম লেগেছে !
পরাণ-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে !

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না পাওয়া মিলন
যেন রে স্বার্থক হ'ল ! পূরিল জীবন !
ওগো ফুল ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !

ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি!
কে বলে রে ধন্য ধন্য?
কে দেয় রে করতালি?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলেরে ধন্য ধন্য
এ ক'ার নূপুর বাজে?
কার পদ রজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভাকরে? হে মিলিত! হে মধু মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন!

ধর্ম্ম ও আর্ট

একজন বহুমান্যাস্পদ প্রাচীন সাহিত্য-রথী লিখিয়াছেন,—

> "নারায়ণের" বিরুদ্ধে এত অভিযোগ পাইয়াছিলাম যে তাহার গণনা করা যায় না। প্রথম সংখ্যায় "সবুজপত্রের" উত্তর পাঠ করিয়া যেমন আনন্দ পাইয়াছিলাম, তেমন ভাদ্র সংখ্যায় বিধবার পলায়নের ব্যাপার পড়িয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিধবা ননদের বিবাহ-রাত্রির উৎসবের গোলমালে আপনার প্রিয়জনকে লইয়া পলায়ন করিল। তাই কি লিখিতে হয়? না ছাপিতে হয়?"

গতানুগতিক, স্মৃতি-অনুগত, কেবলমাত্র প্রাচীন কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ধর্ম্মের প্রভাবে সাহিত্যের আদর্শ কতটা পরিমাণে সংকীর্ণ হইতে পারে, শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের চিন্তাশক্তি কতটা পরিমাণে অসম্বদ্ধ ও কল্পনাবস্তুহীন হইতে পারে, এই সামান্য সমালোচনাতে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

"নারায়ণে" হিন্দু বিধবার পলায়ন-বৃত্তান্ত-ঘটিত নাটক বা উপন্যাস যে প্রকাশিত হইতে পারে না, অথবা হইলেই যে "নারায়ণ" অশুদ্ধ হইয়া যাইবেন, এরূপ ধারণা আমাদের কাহারই নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত "নারায়ণ" এমন দুঃসাহসিক কর্ম্ম করেন নাই। ভাদ্র-সংখ্যায় যে এরূপ কোনও কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে, কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। একে একে প্রবন্ধগুলি তল্লাস করিয়া দেখিলাম, শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "দরদীয়া" নামক ছোট কথাটিতে একটি বালবিধবার বিবরণ আছে। সে একদিন শরতের দ্বিপ্রহরে আপনার শয়ন-কক্ষের বাতায়ন খুলিয়া, রাজপথে একখানি মুখ দেখিয়াছিল। বাতায়ন খুলিবামাত্র ঐ ব্যক্তির চক্ষের উপরে নিমেষের জন্য তার চক্ষুটি পড়িয়া-

ছিল। অমনি সেই অপরিচিত মুখখানি করুণায় ভরিয়া গিয়াছিল। চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল। এই ত ইহার পাপের সূচনা। ইহার কিছুদিন পরে, তার ননদের বিবাহ-রাত্রে দেখিল এই অপরিচিত ব্যক্তি তার শ্বশুর-বাড়ীর অতি নিকট-আত্মীয়, এত ঘনিষ্ঠ যে সচ্ছন্দে অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। বরের যখন বরণ হইতেছিল, তখন সে এক পার্শ্বে, অতি দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া, ঐ ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—"এখানে কেন? ওখানে চল।" ওখানে অর্থ যেখানে বরণ হইতেছিল। বিধবাটি শিহরিয়া উঠিল। জিব কাটিয়া বলিল—"সে কি, আমি যে বিধবা!" ঐ ব্যক্তি বলিল—"তাতে কি? তুমি যে মানুষ? তুমি যে স্ত্রীলোক! এর চেয়ে বেশী আর কি চাও?" এত বড় কথাটা এই বিধবাকে এতদিন কেউ বলে নাই। বিধবা ভাবিল—আমি রমণী, আমি মানুষ। এই দু'ইকে কি আমার বৈধব্য একা বাধা দিতে পারে? "কতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলাম, জানি না। হঠাৎ তাঁর হাতের স্পর্শে সমস্ত শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ হইল। কোমল স্বরে সে বলিল—এখন তবে চল। বিহ্বল কণ্ঠে বলিলাম—চল।"

পলায়ন-ব্যাপার ত এই। হরি, হরি, এ পাপের কথাও কি লিখিতে নাই? ইহাও কি ছাপিতে নাই? বেচারী এই সামান্য স্নেহটুকুও কি পাইবার অধিকারী নয়? আর সে গেল ত বরণ-তলায়! গেল পরিবারের একজন অতি নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে! কিন্তু তাহা হইলে হয় কি? ঐ যাওয়া হইতেই অন্য যাওয়াও ত ক্রমে ঘটিতে পারে! বিধবার নিকট চূণ চাওয়া ত নিরাপদ নহে। (হিন্দু বিধবার জন্য নিরম্বু ব্রহ্মচর্য্যই কেবল বিহিত। তার প্রাণও যে মানুষের প্রাণ,—তার রক্ত-মাংসের শরীরটাকে ত অস্বীকার করিতেই হইবে,—এক বৈধব্যই পুরুষানুক্রমাগত রক্তমাংসের ক্ষুৎ-পিপাসাকে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলে, শাস্ত্রবিধির এমনই মহিমা!

—বিধবার হৃদয়টাও যে আমাদের জরাজীর্ণ হৃদয়েরই মতন স্নেহ-প্রীতি-কারুণ্য-সহানুভূতির জন্য তৃষিত, এই কথাও কি বলিতে আছে? ইহাতেই যে ধর্ম্মের বাঁধ ভাসিয়া যাইতে পারে। তাই, আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে বাঁচাইতে হইলে, সাহিত্যে বিধবাকে কেবল ব্রহ্মচারিণীই সাজাইয়া রাখিতে হইবে। আর্য্যনীতি রক্ষা করিতে হইলে, বৈরাগ্যের ভস্ম মাখাইয়া কেবল তার রূপ-যৌবনকে নয়, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যধর্ম্মকে পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে।)

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলব ন পুনঃ পতত্রিণঃ

একথা কেবল কুমারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। "বিবাহ হইবার পূর্ব্বে যে বিধবা" হয়, তার সম্বন্ধেও অমন সর্ব্বনেশে কথা তুলিও না!)

(এই ধর্ম্ম ও এই নীতির হাতে কি সাহিত্যের শাসন-দণ্ড অর্পণ করা যায়? এই ধর্ম্মের ও নীতির শাসনাধীনে কোথাও কি কোনও সাচ্চা আর্ট বাঁচিয়া থাকিতে পারে, না সহজভাবে সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেই কি কখনও এরূপ হইয়াছে? সজীব সাহিত্য মাত্রেই গতানুগতিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানবপ্রকৃতির উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনের পাপ লোকে ভুলিয়া যায়; নতুবা যে রামায়ণ-মহাভারতের উপরে আমাদের আধুনিক সনাতন-আদর্শের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, তাহার মধ্যেই কি এই গতানুগতিক ধর্ম্মের ঐকান্তিক আনুগত্য দেখিতে পাই? মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মে কোন্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে? মহাবীর কর্ণের জন্মকাহিনীই বা কোন্ সনাতনী নীতির প্রচার করিয়াছে? অথচ কুন্তীর নাম না লইয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলে সে দিনটা ভাল যায় না। অতিপ্রাকৃতের আবরণ দিয়া এগুলিকে যতই ঢাকিয়া রাখিতে চাই না কেন, সমুদায় শ্রুতি-স্মৃতি-রচিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকে অতিক্রম করিয়া, এই সকল পৌরাণিকী কাহিনীর ভিতর হইতে সার্ব্বজনীন ও সহজ মানবধর্ম্মটিই ফুটিয়া বাহির হয়। এই সহজ বস্তুটি আমরা হারাইয়াছি। পুঞ্জীকৃত

শাস্ত্রবিধির চাপে পড়িয়া আমাদের সহজ মানবপ্রকৃতিটি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। পরাশরে বা কুন্তীতে ইহা হয় নাই। এই জন্যই তাঁহাদের যাহাতে অধর্ম্ম হয় নাই, আমাদের তাহাতে পাপস্পর্শ করিতে পারে। পরাশরের যে অধিকার ছিল, আমাদের তাহা নাই। তাঁহার বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ওজনে আমাদের ক্ষুদ্রতর জীবনের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয় না। এসকল কথা বুঝা যায়। এসকল কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁহাদের জীবন সহজ, স্বাভাবিক ছিল। আমরা শত কৃত্রিমতার জালে আমাদের জীবনকে জড়াইয়াছি। এই কৃত্রিমতাও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই। জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন আত্মরক্ষার প্রেরণা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে ঐ অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে যাইয়া, বহুবিধ ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপেই জীবের ক্রমবিকাশ-ধারায়, তার জীবনের জটিলতা ও এই জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কৃত্রিমতাও বাড়িয়া যায়। সমাজ-জীবনেও ইহা ঘটিয়া থাকে। সমাজ আত্মরক্ষার জন্য বহুবিধ কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। সভ্য সমাজের বহুবিধ রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ এই ভাবেই, এই প্রয়োজনেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজ-জীবনে প্রচুর কৃত্রিমতা আছে। এসকল কৃত্রিমতা সমাজ-বিকাশেরই অঙ্গ। এসকল বিধি-বন্ধন যতই কৃত্রিম হউক না কেন, তাদের কোনও প্রয়োজন বা উপকারিতা নাই, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু জীবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাহা গড়িয়া উঠে, সেই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা আপনি, আপনার প্রয়োজন সাধন করিয়া, ক্রমে ঝরিয়াও পড়ে। না পড়িলে নূতন জীবনের নূতন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এককালে যাহা গতির সহায় ছিল, তাহাই ক্রমে গতির ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্যই এসকল কৃত্রিম বিধিবন্ধনের হাতে, চিরদিনের জন্য জীবনের নিয়তি বা সমাজের গতির ভার অর্পণ করা যায় না।

এইরূপ কৃত্রিমতার দ্বারা সত্যধর্ম্মও গড়ে না, সজীব আর্টও ফুটিয়া উঠে না। এই কৃত্রিমতার হাত হইতে ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্ম-সাধনকে রক্ষা করিবার জন্যই যুগে যুগে যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই জন্যই যুগে যুগে সেই যুগের যুগসাহিত্য পুরাতনের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া, সহজ মানবপ্রকৃতি ও অকৃত্রিম মানব-প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া, নূতন নূতন রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া, সমাজ-বিকাশের গতিবেগে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সামাজিক বিধি-নিষেধও ছিল, বহু-বিধ আচার-বিচারও ছিল, এসকলের আশ্রয়ে একটা বৈধ-ধর্ম্মও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু যাহাকে সনাতন ধর্ম্মরূপে বরণ করিয়াছিল, এসকল বিধি-নিষেধের উপরে একান্তভাবে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই এসকল বিধিনিষেধ নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত ছিল। জীবকে তার সত্যকার স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই এসকল শাসনসংযমের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। আপনার স্বভাবকে যতক্ষণ মানুষ সত্যভাবে, পরিপূর্ণরূপে না পাইয়াছে, ততক্ষণ তার সত্য ধর্ম্ম হয় না; হিন্দু সাধনা ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। লৌকিক ধর্ম্ম এই সত্য-ধর্ম্মের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন-রূপেই গৃহীত হইয়াছিল। এই লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ধর্ম্মজীবনের গোড়ার কথা, শেষের কথা নহে। বালি-কারা যেমন পুতুল দিয়া আপনার কল্পিত সংসার পাতিয়া খেলা করে, অথচ এই খেলার ভিতর দিয়াই পরজীবনের সত্যকার সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিবার সঙ্কেত ও অভ্যাস শিক্ষা করে; এই লৌকিক, বেদস্মৃতিসদাচারসম্মত ধর্ম্মের সাধন করিয়াও হিন্দু সেইরূপই তার নিত্য সনাতন-ধর্ম্মের বাহিরের সঙ্কেত লাভ করে। লৌকিক ধর্ম্ম তন্ত্রমন্ত্রের ধর্ম্ম, বেদস্মৃতির ধর্ম্ম। কিন্তু হিন্দুর সত্য ধর্ম্মবস্তু তন্ত্রেও ছিল না, মন্ত্রেও ছিল না; বেদেও ছিল না, পুরাণেও ছিল না; সে-ধর্ম্ম ছিল সহজ, সতেজ, সরল মানবপ্রকৃতির মূলে।

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

—ইহাই সনাতন-ধর্ম্মের কথা। ইহাকেই গীতায় স্ব-ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই ধর্ম্মকে পাইয়াই শ্রুতি নিজহাতে আপনার সকল প্রামাণ্য-মর্য্যাদায় তিলাঞ্জলি দিয়া, ষড়ঙ্গ ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যা এবং যাহার দ্বারা অক্ষরপুরুষকে পাওয়া যায়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বা পরাবিদ্যা বলিয়াছেন। এই অক্ষর পুরুষ শ্রুতিস্মৃতিতে, ক্রিয়াকলাপে, আচার-বিচারে নাই। আছেন কেবল জীবের প্রকৃতির মধ্যে। এই গুহাহিত, গহ্বরেষ্ট, পুরাণ পুরুষকে জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আপনার আত্মার মধ্যেই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব জন্যবস্তু নহে, যাগযজ্ঞাদি কোনও ক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে উৎপাদন করা যায় না। কোনও সংযম-সাধনের দ্বারাও এবস্তুর সৃষ্টি হয় না। এই ধর্ম্মবস্তু নিত্যসিদ্ধ। অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, যেখানে আগুন আপনার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইখানেই এই দাহিকাশক্তি বিদ্যমান থাকে ; জলের তারল্য ও শৈত্য যেমন নিত্যসিদ্ধ ; বায়ুর গতি যেমন নিত্যসিদ্ধ ; জীবের ধর্ম্মও সেইরূপই নিত্যসিদ্ধ। মহাভারত এই ধর্ম্মকেই জীবের একমাত্র সুহৃৎ বলিয়াছেন—নিধনেও ইহা জীবের অনুগমন করে। এই ধর্ম্মই সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ। এই স্ব-ধর্ম্মে জীবের মৃত্যুও শ্রেয় ; কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। সকল শ্রুতি-স্মৃতি যাঁহাকে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সকল জীবের প্রকৃতির মূলে, ঐ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া, তার নিয়তি ও গতি রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইজন্য জীবের প্রকৃতির মধ্যেই সকল শাস্ত্রের চাবি রহিয়াছে। ঐ প্রকৃতির অভিধানের দ্বারাই সকল শাস্ত্রসাহিত্যের অর্থ করিতে হয়। এইজন্য হিন্দু

যতই শাস্ত্র-অনুগত হউক না কেন, মানুষ সর্ব্বদাই যে শাস্ত্র অপেক্ষা বড় হইয়া আছে একথা কখনও ভুলে নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা গুরু বড়। আর গুরুশাস্ত্র অপেক্ষা স্বানুভূতি হীন নহে। স্বানুভূতির সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিয়াছে, ততক্ষণ শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুবাক্য কিছুই প্রামাণ্য হয় না।

ধর্ম্মের তত্ত্ব জীবের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে বলিয়াই, হিন্দু সাধুসন্তেরা জীবের তাপ দেখিয়া কারুণ্যে গলিয়া যান বটে, কিন্তু পাপ দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়েন না। এইজন্য হিন্দুধর্ম্ম কোনও দিন নরকের আগুন জ্বালাইয়া বিধর্ম্মীকে বা অধর্ম্মীকে পুড়াইয়া মারে নাই। শিশু হাঁটিতে যাইয়া পদে পদে পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, অভিজ্ঞ পিতামাতা যেমন ভীত হন না; এইরূপে পড়িতে পড়িতেই ক্রমে সে দাঁড়াইতে শিখিবে, হাঁটিতে পারিবে, ইহা জানিয়া, তাঁরা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইয়া রহেন; আত্মদর্শী মহাজনেরা জীবের পাপাচরণে সেইরূপ স্থির ও নিশ্চিন্ত রহেন। এই পথেই, বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, জীব ক্রমে সজ্ঞানে আপনার শুদ্ধসত্ব প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা জানিয়া তাঁহারা কদাপি জীবের এই প্রকৃতিকে অযথা নিগ্রহ করেন না।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?

বলিয়া, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ ও অহিতাচারকে উদার চক্ষে দর্শন করেন। বরঞ্চ ভিতরে, প্রকৃতিব মধ্যে, যার পিপাসা আছে, বাহিরে তার সংযম-সাধনকে মিথ্যাচার বলিয়া বর্জ্জন করিতেই বলেন। এমন কি প্রকৃতির প্রতিকূলে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসকে, তাঁহারা অধর্ম্ম বলিয়াই নিন্দা করিয়াছেন। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে অজ্ঞ লোকে কেবল নিজেরাই খামাকা ক্লেশ পায় যে তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ পরম পুরুষকে পর্য্যন্ত ক্লিষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া, এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সত্য সনাতন-ধর্ম্মের হাতে জীবনের সকল কর্ম্মের শাসনভার

স্বচ্ছন্দেই ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। কারণ রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য,—বিশাল ও জটিল মানব-জীবনের সকল বিভাগের সকল ধর্ম্ম ও সকল কর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াই, এই বিশ্বজনীন সনাতন-ধর্ম্ম আপনার সিদ্ধিলাভ করে। রাষ্ট্রকর্ম্মাদি এই ধর্ম্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। অঙ্গের পূর্ণতা সাধন করিয়াই, অঙ্গী সর্ব্বথা আপনার সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্গকে আপনার অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন করিয়াই, অঙ্গী যুগপৎ তাহাদিগকেও সার্থক করে, আপনিও তাহাদের সাহায্যে সার্থকতালাভ করে। অঙ্গকে পঙ্গু করিলে, অঙ্গী আপনি পঙ্গু হয়। অঙ্গকে পুষ্ট করিলে, অঙ্গী আপনি পুষ্টিলাভ করে। এই সনাতন ধর্ম্মও সেইরূপ জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে আপন আপন অধিকারে স্বাধীন ও স্বরাট করিয়া, আপনি আপনাকে পূর্ণ ও সার্থক করে। সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে পূর্ণ করাই এই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। আর্টও মানবপ্রকৃতিকেই সার্থক করিয়া আপনার সার্থকতা-লাভ করে। এই ধর্ম্ম আর্ট অপেক্ষা বড়। আর্ট জীবনের একাংশকে মাত্র পূর্ণ করে, এই ধর্ম্ম সমগ্র জীবনকে পূর্ণ করে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরস্পরের বিরোধ ঘটিলে, এই ধর্ম্মই কেবল তার মীমাংসা করিতে পারে। লৌকিক ধর্ম্মের সঙ্গে আর্টের বিবাদ বাধিলে, এই সনাতন ধর্ম্মকেই সালিশী করিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিতে হয়। এই ধর্ম্ম আর্ট অপেক্ষাও বড়, লোকে যাহাকে সচরাচর ধর্ম্ম বলে, তাহা অপেক্ষাও বড়। এই ধর্ম্মের হাতে আর্টের শাসন-সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিতে কেহ আপত্তি করিবে না।

লৌকিক ধর্ম্মের বা নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে সাহিত্যের ও আর্টের বিরোধ ঘটিতে পারে; কিন্তু এই সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে তার কখনওই বিরোধ সম্ভবে না। কারণ যে মানব-প্রকৃতিকে এই ধর্ম্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব-প্রকৃতির অন্তঃপ্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টেরও সৃষ্টি হয়। যেখানে সাহিত্য এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

পড়ে, যেখানেই ইহা বর্ত্তমান অনুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরাতন শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিতে চাহে, সেইখানেই ইহা কৃত্রিম, অলীক, অসার, বস্তুতন্ত্রতাহীন ও শূন্যগর্ভশব্দাড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেই ইহার বহুল প্রমাণ পড়িয়া আছে। প্রতি বৎসর বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "ব্যাখ্যান", ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও উপদেশাদি, পরমহংস রামকৃষ্ণের "কথামৃত" এবং আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের "ব্রহ্মপূজা", "যোগসাধন", "আত্মজীবন-চরিত", "আশাবতীর উপাখ্যান" এবং "বক্তৃতা ও উপদেশ"—ছাড়া সত্য ও জীবন্ত ধর্ম্ম-কথা আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব"ই বোধ হয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির উপরে ধর্ম্মের আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহর্ষি প্রভৃতির ধর্ম্মকথা প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে ফুটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্বও" এক প্রকারের অনুভূতি-প্রসূত। তবে সাধকের অনুভূতি ও মনীষীর অনুভূতির মধ্যে তারতম্য আছে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হইতে সাধকের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। ঐ অভিজ্ঞতার বহির্লক্ষণের আশ্রয়ে, বৈজ্ঞানিক কল্পনাবলে, মনীষীর অনুভূতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইংরাজিতে সাধকের অনুভূতিকে religious experienceএর ফল, আর মনীষীর অনুভূতিকে scientific imaginationএর ফল বলিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে এই প্রভেদ আছে। কিন্তু মহর্ষি প্রভৃতির ধর্ম্মকথা আর বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব. এই প্রভেদ সত্বেও, তাঁহাদের নিজস্ব বস্তু। এই জন্যই এ সকল গ্রন্থে শব্দ সত্যকে, ভাষা ভাবকে, কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া যায় নাই। এ সকল পুস্তকে শ্রুতিস্মৃতির প্রামাণ্য লেখকদিগের নিদারুণ দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। এসকলে অপূর্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু অসত্য নাই। আধুনিক বাঙ্গলা কাব্যেও যেখানেই

কবিকল্পনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়াছে, সেইখানেই যুগপৎ সত্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সেখানে শব্দ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ মিলিয়া সত্য জীবন্ত রসমূর্ত্তি সকল গড়িয়া তুলিয়াছে। আর যেখানেই কবিকল্পনা শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে গিয়াছে, সেইখানেই শব্দ অর্থকে, ভাষা ভাবকে, ঝঙ্কার রসকে অভিভূত করিয়া, একটা অলীক সৃষ্টি রচনা করিয়াছে। মাইকেলের "মেঘনাদবধে" একটা সত্য অনুভূতির প্রমাণ পাই। উপাখ্যানভাগ মাত্র কবি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া তিনি যেসকল চিত্র ও রস ফুটাইয়াছেন, তাহা তাঁর নিজের, রামায়ণের নহে। এই মহাকাব্যে শব্দের ঝঙ্কারে কবিকল্পনার সত্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। কিন্তু "মেঘনাদবধে" যে বস্তুতন্ত্রতা আছে, "ব্রজাঙ্গনায়" তাহা নাই। এই জন্য "ব্রজাঙ্গনা" শব্দের লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য্য দিয়া অনুভূতির দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী"তে এবং নবীনচন্দ্রের "অবকাশরঞ্জিনী"তে কোনও গভীর বা জটিল রস না ফুটিলেও, যতটুকু রস আছে, তাহা সত্য ও বস্তুতন্ত্র, কবিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ। এইজন্য এই দুইখানি গীতি-কাব্যে শব্দে ও অর্থে, সত্যে ও কল্পনাতে একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রঙ্গলালের "পদ্মিনীর উপাখ্যানে" এবং নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে"ও একটা সত্য, সজীব, সতেজ রস ফুটিয়াছে। আধুনিক কালের শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী সে সময়ে মর্ম্মে মর্ম্মে যে বেদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণের ভিতরে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই প্রেরণায় রঙ্গলালের "পদ্মিনী" এবং নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" রচিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে একটা সত্য, সতেজ অনুভূতি বিদ্যমান ছিল। এইজন্য ইহাদের ভাষা ও ভাবের, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা সঙ্গতি রহিয়াছে, কোথাও বিশেষ সত্যাভাস বা রসাভাস নাই। কিন্তু

নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" ও "রৈবতক" একটা সাময়িক, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়ামুখে রচিত হয়। মূলে রাষ্ট্রীয় জীবনের হীনতা-বোধই এই প্রতিক্রিয়াতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। ইংরাজের স্পর্দ্ধা বাঙ্গালীর আত্মসম্মান-বোধে পদে পদে আঘাত করিতেছিল। ইউরোপের সভ্যতাভিমান বাঙ্গালীর জাত্যাভিমানকে চাগাইয়া তুলিতেছিল। ইউরোপের প্রতিপক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বাঙ্গালী তখন পুরাতনের স্মৃতির দ্বারা বর্ত্তমানের দুর্গতিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মূলতঃ এই ভাবেই, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর আগেকার তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানের সূচনা হয়। ইহাতে তখনও নবীনে-প্রাচীনে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস জাগে নাই। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই তখন এই সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরে একটা কৃত্রিম ও কল্পিত "সনাতনীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া, বর্ত্তমানের সহজ ও অনিবার্য্য বিকাশ-গতির একান্ত প্রতিরোধ করিবারই চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কৃত্রিম ও কল্পিত "সনাতনীর" প্রেরণাতেই নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" ও "রৈবতকের" জন্ম হয়। এই জন্যই এ দু'খানি কাব্য তেমন উৎকর্ষলাভ করে নাই। কৃত্রিম কল্পিত ধর্ম্মের চাপে পড়িয়া আর্ট পঙ্গু হইয়াছে। এই জন্যই নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন, উভয়ই অমন অলীক হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রাচীনের প্রতিকৃতিও ফুটে নাই, নূতনের অনুভূতিও জাগে নাই। ইহাঁরা কোনও গভীর রস বা সার্ব্বজনীন আদর্শ ফুটাইয়া সাহিত্যে অচ্যুত-প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব নাই। বৎসর বৎসর বোধ হয় শতাধিক ছোটবড় উপন্যাস বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে নির্গত হইতেছে। কিন্তু বৎসরে একখানিও পাঠযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয় কি না, সন্দেহ। বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বাঙ্গালা উপন্যাসের মধ্যে, এক বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ছাড়া, "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর একখানিও কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। আর বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই, অসাধারণ কবিকল্পনাপ্রসূত না হইয়াও, "স্বর্ণ-লতা" অমন অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। অন্যদিকে, এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ," "দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারামের" আর গুণাগুণ যাহাই থাকুক না কেন, রসের বিচারে, কাব্যের হিসাবে, ইহারা লেখকের অলোক-সামান্য প্রতিভার গৌরব রক্ষা করে নাই। কিন্তু এই অপূর্ণতা সত্বেও, "আনন্দমঠে," দেবীচৌধুরাণীতে" কিম্বা "সীতারামে" যে ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইযাছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রাচীনের প্রতিধ্বনি হইলেও, কোনও দিকেই নিতান্ত কৃত্রিম নহে। এই গ্রন্থ তিন-খানিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতা-ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিযাছেন। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের গীতাভাষ্য মায়াবাদী বৈদান্তিকের বা ভাববাদী বৈষ্ণবের গীতা-ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি নহে। গীতাকেই কেবল তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, গীতা-ধর্ম্মের প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র গীতোপদেশকে অবলম্বন করিয়া, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সাধনার অনু-শীলন-ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের গতানু-গতিক সনাতনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই, আধুনিক ইউরো-পের অন্ধ অনুকরণও করিতে যান নাই। কিন্তু আধুনিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম ভাব ও আদর্শের সঙ্গে, ভারতের প্রাচীন সাধনার নিগূঢ়-তম প্রেরণার সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়া, আমাদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া, বর্ত্তমান হিন্দুসাধনা ও হিন্দু চরিত্রকে বিশ্ব-সাধনার ও বিশ্ব-মানবের অঙ্গীভূত করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে," "গীতাভাষ্যে," এবং "আনন্দমঠ," "দেবীচৌধুরাণী" ও "সীতারাম" এই তিনখানি উপন্যাসে তিনি এই সমন্বয়সূত্রেরই ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য তাঁর নিষ্কাম-কর্ম্ম প্রাচীনেরা গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মকে যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নিষ্কাম কর্ম্ম ইউরোপের নিরীশ্বর হিতবাদ বা হিউম্যানিটি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে ভগবদভক্তি-প্রেরিত লোক-সেবা বা

লোকশ্রেয় বলা যাইতে পারে। এই সমন্বয় করিতে যাইয়া বঙ্কিম-চন্দ্র আমাদিগের নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তিনি কেবল পুরাতন পৌরাণিকী কিম্বদন্তির অবতার নহেন; কিন্তু আধুনিক আকাঙ্ক্ষার সুপারম্যান্ (Superman) বা নরোত্তম। উনবিংশ খৃষ্টশতাব্দীর উদার মতবাদ "Ecce Homo" বলিয়া যে খৃষ্টাবতারকে দেখাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই উদার মতবাদের আশ্রয়েই আমাদিগের নিকটে কৃষ্ণাবতারকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই প্রেরণা প্রাপ্ত হন নাই। "অবকাশরঞ্জিনী"তে ও "পলাশীর যুদ্ধে" তিনি আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। "কুরুক্ষেত্রে" ও "রৈবতকে" পরধর্ম্মের অনুধাবন করিয়াছেন। এইজন্য তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিকী অবতারও নহেন, আধুনিক সুপারম্যানও নহেন। কিন্তু হিন্দু অবতারের শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-রঞ্জিত ইউরোপের প্রিন্স বিস্‌মার্ক বা কার্ডিন্যাল রিশেলু মাত্র।

আমাদের বহুতর আধুনিক সৃষ্টিই এইরূপ কৃত্রিম, কল্পিত, না-হিন্দু-না-ইউরোপীয় হইয়াছে। কেবল সাহিত্যে বা আর্টে নয়, জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই, এই প্রাচীনের প্রেতাত্মা আমাদের উপরে চাপিয়া, আমাদিগকে পথ-হারা করিয়া তুলিতেছে। প্রাচীনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে, এই গতানুগতিকতায় অতটা অনিষ্ট করিতে পারিত না। আমরা এখন যাহাকে প্রাচীন বলি, আমাদের পিতৃপিতামহেরা তাহাকেই একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কিন্তু সেই প্রাচীন তাঁহাদের নিকটে সত্য ছিল। সেই প্রাচীনের সঙ্গে তাঁহাদের একটা সত্য ও সহজ প্রাণগত যোগ ছিল। এই সহজ-যোগ ও প্রাণগত সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁরা নিঃসঙ্কোচে প্রাচীনকে নিজেদের মনোমত করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা জাত মানিতেন, একটা পুরাগত সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া জাতিধর্ম্ম-বিচারকে তাঁহারা বিনা প্রশ্নে ও

বিনা বিচারে মানিয়া চলিতেন। মানুষ যেমন কেহ লম্বা হয়, কেহ বা খাট হয়; কেহ গৌর হয়, কেহ বা শ্যামবর্ণ বা কাল হয়; ব্রাহ্মণ শূদ্রাদিও সেইরূপ একটা স্বাভাবিক জন্মগতভেদ, এই ভাবেই তাঁহারা জাতিভেদকে দেখিতেন। এইজন্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ বলিয়া একটা বিশেষ অভিমানও ছিল না, শূদ্রের শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ ক্ষোভও হইত না। তাঁহারা জাত মানিতেন বলিয়াই, তাঁহাদের মধ্যে সমাজদ্রোহী জাত্যাভিমান ছিল না। আমরা জাত মানি না বলিয়াই, আমাদের জাতের অভিমানটা বেজায় বাড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবনের প্রত্যেক বিভাগে একটা সাংঘাতিক কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম গতানুগতিক, আচার মৌখিক, নীতি অস্বাভাবিক, কর্ম্ম কাপট্যাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব বস্তুকে আমরা হারাইয়াছি। এই কৃত্রিম, কল্পিত, অস্বাভাবিকতাকেই ধর্ম্মের সিংহাসনে বসাইতেছি। ধর্ম্মের নামে এই কৃত্রিমতা ও কল্পনার হাতে সাহিত্যের বা আর্টের শাসনভার অর্পণ করা যায় কি?

মানবপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য ও আর্ট সর্ব্বদা আপনার অমর সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। সহজ মানব-ধর্ম্মের মুক্ত স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াই সাহিত্য সংসারকে অপূর্ব্ব রূপরসে সাজাইয়া তোলে। সনাতনীর রুদ্ধজলে বদ্ধ হইয়া, কোনও সাহিত্য বা কোনও আর্ট আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। মহাকবি কালিদাস ত আমাদের মতন সমাজদ্রোহী ছিলেন না। কিন্তু শকুন্তলার অলোকসামান্য চিত্রটি তিনি কি সনাতন সমাজ-ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া আঁকিয়াছেন, না সহজ ও সার্ব্বজনীন মানব-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আঁকিয়াছেন? কালিদাসের সমসাময়িক হিন্দুসমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছিল না। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ গোপন-বিবাহ। ধর্ম্মের প্রয়োজনে নহে, কামের প্রেরণাতেই, গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, শাস্ত্রেই একথা বলে। ধর্ম্মের প্রয়োজনে যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, প্রজাসৃষ্টি তার লক্ষ্য,

সমাজ তার সাক্ষী থাকে। কাম-প্রণোদিত গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমাজের অতি শৈশবের কথা। সমাজের সে অতি-শৈশবে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ও আসুর বিবাহ দু'ই প্রচলিত ছিল। তখন না ছিল শ্রুতি, না ছিল স্মৃতি; না ছিল বর্ণ, না ছিল আশ্রম; ছিল কেবল সহজ, সতেজ, সরল মানব-প্রকৃতি। তখন বিবাহমাত্রেই হয় গান্ধর্ব্ব না হয় আসুর বিবাহ ছিল। কালিদাসের বহু বহু যুগযুগান্ত পূর্ব্বে সমাজ সে শৈশবাবস্থা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ আপনার প্রকৃতিকে ছাড়ায় নাই। এই প্রকৃতির প্রেরণাতেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন হইল। সমাজ এই মিলনের সাক্ষী রহিল না। শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের কন্যা বলিয়াই জানিয়াছিলেন। কণ্ব ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরুদ্ধ। সমাজ এ বিবাহকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। কিন্তু মানব-প্রকৃতি ও মানব-হৃদয় ত এই মানব-কল্পিত সমাজ-ধর্ম্মের বশ নহে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সহজ প্রকৃতি, আপনার অন্তঃপ্রেরণায় এই কল্পিত, কৃত্রিম সমাজধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া, আপনার চরিতার্থতা সাধন করিল। দুষ্মন্ত গোপনে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজদ্রোহী হইলেন। শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয় কন্যা করিয়াও, কবি দুষ্মন্তের সমাজ-দ্রোহীতার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। তাহাতে কেবল কণ্বের সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষার একটা পথ বাহির করিয়াছেন মাত্র। শকুন্তলা সমাজ-ধর্ম্ম ভুলিয়াই দুষ্মন্তকে গোপনে আত্মদান করিলেন। সমাজ-ধর্ম্ম ভুলিয়াই তিনি আতিথ্যসৎকারও ভুলিয়া গেলেন। এই জন্যই সমাজ-ধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার রূপ ধারণ করিয়া, ইহাঁকে অভি-শম্পাত করিলেন। এই অভিশম্পাতেই দুষ্মন্তের স্মৃতিলোপ, শকু-ন্তলার প্রত্যাখ্যান ও উভয়ের বিরহ ঘটাইল। পরিণামে কবি, অপূর্ব্ব কৌশলে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্রের আশ্রয়ে, মানব-ধর্ম্মের ও সমাজ-ধর্ম্মের এই বিরোধ ভঞ্জন করিলেন। কারণ, সমাজ-স্থিতি-রক্ষাই সমাজ-ধর্ম্মের মূল কথা। প্রজোৎপত্তির দ্বারা সমাজস্থিতিভঙ্গ নিবা-

রিত হয়। সতেজ, শক্তিমান পুত্রোৎপাদন করিয়াই সকল সমাজ-দ্রোহী দাম্পত্য-বন্ধন ঐ দ্রোহীতার প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। শকুন্তলাতে আদিতে সহজ মানব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, মধ্যে সমাজ-ধর্ম্মের প্রভুত্ব, আর পরিণামে ঐ সহজ মানবধর্ম্মের ফলে এবং তাহারই উপরে, সমাজ-ধর্ম্মের ও মানবধর্ম্মের মিলন, সন্ধি ও সামঞ্জস্য দেখি। শকুন্তলা পড়িয়া মনে হয় যে আমাদের মধ্যে যেমন, কালি-দাসের সমসাময়িক হিন্দুসমাজেও সেইরূপ, গতানুগতিক সনাতনীর প্রভাব সহজ মানবের সহজ প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে চাপিয়া মারিতেছিল। কালিদাস এই আত্মঘাতী সমাজ-ধর্ম্মের হাত হইতে সহজ মানব-প্রকৃতিকে তাহার স্ব-ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সহজ প্রেমের সরল অভিনয়ের সূত্রপাত করিলেন। মানব-ধর্ম্ম সার্থক হইল। পরে সমাজের শাসনদণ্ডের দ্বারা ইহার নির্য্যাতন করিলেন। কিন্তু পরিণামে ঐ সহজ ও স্বাভাবিক মানবধর্ম্মেরই জয় হইল। সমাজ রস বুঝে না, কিন্তু আপনার স্বার্থটি খুবই বুঝে। প্রজোৎপাদনে এই স্বার্থ সাধিত হইল। এইরূপে শ্রেষ্ঠতম ও মুখ্য-তম সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক মানবধর্ম্মের মিলন ঘটাইয়া, কালিদাস এই চিরন্তন সমাজ-সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেন। সমসাময়িক সনাতন প্রথার একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিলে, কালিদাস কোনও দিন এই অপূর্ব্ব রস-চিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

ফলতঃ এই রস-বস্তু, অন্তরের বস্তু; আর সচরাচর আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, তাহা একটা বাহিরের বস্তু। কতক-গুলি প্রচলিত মত, কতকগুলি অভ্যস্ত ও পূরাগত ক্রিয়াকলাপ, কতকগুলি গতানুগতিক আচার-বিচার লইয়াই এই ধর্ম্ম গঠিত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীনেরাও এই বেদস্মৃতিসদাচারগত ধর্ম্মের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের সনাতনত্বের দাবী কেবলমাত্র লোকরঞ্জনের নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হয়,

এই কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ধর্ম্ম সনাতন নহে, সনাতন হইতেই পারে না; কারণ যুগে যুগে এধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। লোকে যাহাকে সদাচার বলে, ইউরোপীয়েরা যাহাকে মর‍্যালিটি (morality) বলেন, আধুনিক বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা নীতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও নিত্য-বস্তু নহে। এক যুগে যাহা সদাচার, অপর যুগে তাহা অনাচার! এক দেশে যাহা মর‍্যালিটি অপর দেশে তাহা দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। বৈদিক সমাজে বিধবার "নিয়োগের" বিধান ছিল; এখন বেদের দোহাই দিয়াও এই সনাতন প্রথার প্রবর্ত্তন বা সমর্থন করা যায় না। মনুর ক্ষেত্রজ সন্তানেরা এখন জারজ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এদেশের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে দাসীপুত্রেরা পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল, এখন ইহা বিগর্হিত হইয়াছে। অন্যদিকে এমন অনেক বিষয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহা এখন শনৈঃ শনৈঃ সমাজের শিষ্টজনেরা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠভাবে অবলম্বন বা আচরণ করিতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিধির দোহাই দিয়া এখনও এসকল অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের আন্তরিক ধর্ম্মবুদ্ধিও এগুলিকে আর এখন পাপ-চক্ষে দর্শন করে না। দেশভেদে, কালভেদে, সর্ব্বত্রই লৌকিক ধর্ম্মের ও সামাজিক সদাচার বা সুনীতির এইরূপ পরিবর্ত্তন নিয়তই ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায়, এই চঞ্চল ধর্ম্মের বা নীতির হস্তে জীবনের অপরাপর বিভাগের নেতৃত্বভার একান্তভাবে অর্পণ করা যায় কি? এই নীতির দ্বারা রসসৃষ্টির বা আর্টের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিকে চাপিয়া রাখাই কি সঙ্গত হয়?

ফলতঃ এই রস-স্ফূর্ত্তি বা আর্ট যুগে যুগে লৌকিক ধর্ম্মের ও নীতির বা মর‍্যালিটির আদর্শের পরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। মানুষের চারিদিকের নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে।

যেখানে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া একই প্রকারের নৈসর্গিক ব্যবস্থানের মধ্যে বাস করে, কিম্বা বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও ভিন্ন সমাজের সঙ্গে তাহার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা না জন্মায়, সেইখানেও কবি-প্রতিভা নিয়তই ঐ সকল পুরাতন দৃশ্য এবং সম্বন্ধের মধ্যেই নব নব রূপ ও রস প্রত্যক্ষ করিয়া, নূতন নূতন রস-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সকল রস-মূর্ত্তির সাহায্যে জনসাধারণের অনুভূতি ও কল্পনাকে নিত্য নব নব ভাবে জাগাইয়া, তাহাদের অন্তরে নব নব আদর্শ ফুটাইয়া তোলে। এই সকল ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজের লোকের মতামত ও মতিগতি অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সমাজের ধর্ম্ম ও নীতি নব নব আকার ধারণ করে। দার্শনিকেরা বিচার করিয়া, তার্কিকেরা তর্কযুক্তির দ্বারা, রাজশক্তি আপনার প্রতাপের প্রভাবে ও সমাজপতি এবং পুরোহিতগণ ধর্ম্মভয় জাগাইয়া বা সমাজের শাসনদণ্ড তুলিয়া, যাহা করিতে পারেন না, কবিগণ অলক্ষিতে তাহা সাধন করেন। কবির সৃষ্টি লোককে আনন্দ দান করে। রস-রাজ্যে লোক এই আনন্দই খোঁজে। তাহারা কবিকল্পনা-প্রসূত নব নব রস-মূর্ত্তি সকলকে কেবল অন্তরে অন্তরে সম্ভোগই করে, ইহাদের তত্ত্ববিচারে বা ধর্ম্ম-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় না।

রস-সৃষ্টির বা আর্টের সঙ্গে সমসাময়িক ধর্ম্মের বা নীতির কোনও সম্বন্ধ যে থাকে না, তাহা নহে। বরঞ্চ সর্ব্বত্রই এই ধর্ম্মের ও নীতির দ্বারা আর্টের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, ধার্ম্মিকেরা আপনাদের আচরিত ধর্ম্মে, অথবা নীতিবাদীরা আপনাদের বিধিনিষেধাদিতে যে বস্তু প্রত্যক্ষ করেন না, কবিপ্রতিভা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক যখন মতবাদে আবদ্ধ, কবি তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কৃতার্থ হইয়া, এই মতবাদের মধ্যে প্রাণ ও রস সঞ্চার করিয়া, তাহাকে জীবন্ত ও আনন্দময় করিয়া তোলেন। মত বস্তু চঞ্চল, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মত মাত্রেই স্বল্পবিস্তর অনুমান-প্রতিষ্ঠ। তত্ত্ব বস্তু নিত্য, প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত। এই নিত্য তত্ত্ব-

বস্তুকেই ঐ চঞ্চল মতবাদ দেশকালের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। তত্ত্ববস্তু জ্ঞান-বস্তু এবং আনন্দ-বস্তু। তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে নূতন সত্যের আলোকে পুরাতন ও পুরাগত মিথ্যা-কল্পনা নষ্ট হয়। আর তত্ত্বের আনন্দের প্রেরণায় এই নূতন সত্যকে সমগ্র জীবন দিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। কবি এই আনন্দময়ী রস-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া, লোকের চিত্তকে প্রথমে মুগ্ধ করেন। এই লোভেই তাহাদের অন্তরে এই রস-মূর্ত্তিকে নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে। কবির সৃষ্টিতে প্রথমে লোকে কেবল আনন্দই পায়। ইহার মধ্যে কেবল আনন্দই খোঁজে। এই আনন্দ পাইয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত হয়। তখন এসকলের আশ্রয়ে অন্য কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। যখন সে জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তখন কবির কাজ অনেকটা ফুরাইয়াছে। তখন তাঁর প্রেরিত রস-বস্তু সমাজ-প্রাণের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তখন সমাজ-গতি আপনার অন্তঃপ্রেরণায় এই রসের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিবর্ত্তনের হাওয়া তখন ছুটিয়াছে। নূতন আদর্শের বান তখন ডাকিয়াছে। সেই ডাকে, কার্পণ্যোপহত স্থবির সামাজিকেরা সমাজ-স্থিতি-ভঙ্গ-নিবারণের জন্য "সনাতনীর" নামে রস-সৃষ্টির সহজ স্ফূর্ত্তিকে চাপিয়া রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ রস যে তাঁহাদের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে এতাবৎকাল গোকুলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ জ্ঞান তাঁহাদের হয় নাই। যখন তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে পারিতেন, তখন তাঁহারা ঘুমাইয়াছিলেন। তখন তাহার কোমল মুখ দেখিয়া ইহারা নিজেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাহাকে কেবল সুখ-কল্পনা মাত্র বলিয়া সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এবস্তু যে মিছরির ছুরী এবোধ তখন ইহাদের জন্মে নাই। এখন সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, আপনি আপনার রাজ্য অধিকার করিয়াছে, লোকের মতিগতি ফিরাইয়াছে, এখন ইহার গতিরোধ করে কে? এই নিষ্ফল প্রয়াসে কেবল বিপ্লবের সৃষ্টি করে মাত্র।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিন্দুর ধর্ম্মে ও হিন্দু সমাজে যেমন সকল ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোনও ধর্ম্মে ও কোনও সমাজে ঘটে নাই। অথচ আমাদের ইতিহাসে কোনও সাংঘাতিক বিপ্লবের কথাও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপনিষদ বেদের দেববাদ ও যাগযজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন, অথচ যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মারামারি কাটাকাটি হইল না! হিন্দু প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের মধ্যে দুইটি শাখা গড়িয়া, একটির মধ্যে যাজ্ঞিকদিগের এবং অপরটির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীদের স্থান করিয়া দিল। ধর্ম্মের দুই কাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল; এক কর্ম্মকাণ্ড, অপর জ্ঞান-কাণ্ড। যাজ্ঞিকেরা যে দেবতার নামে যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন। ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিলেন। ব্রহ্মকে আমলেই আনিলেন না। অথচ তাঁহাদের আর্য্যত্ব বা হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব বা ঋষিত্ব পর্য্যন্ত কেউ অস্বীকার করিল না। ব্রাহ্মজ্ঞানীরা যজ্ঞ ও দেবতা সকলই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কেহ কেহ বা সত্য বলিয়া মানিয়াও ইহাদিগকে মুক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বর্জ্জন করিলেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞান-দৃষ্টিতে ও সত্যের চক্ষে গরু, হাতী, চণ্ডাল এবং কুক্কুরের সমান বলিয়া প্রচার করিলেন। অথচ কেহ ইহাঁদের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করিল না। সমাজ নিঃশব্দে, অলক্ষিতে কর্ম্মকাণ্ডীদিগকে বুকে করিয়া ও জ্ঞানকাণ্ডীদিগকে মাথায় করিয়া লইল! আধুনিক ইউরোপে যেমন বিবাহের পূর্ব্বে যুবতীগণ বহুপ্রণয়ী ও প্রণয়পিপাসুর সঙ্গে বিবিধ প্রকারের প্রীতি ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, প্রাচীন ভারতে, সনাতন বৈদিক যুগেও সেরূপ হইত, শ্রৌতসূত্রের ও গৃহ্যসূত্রের বহুবিধ মন্ত্রে তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে লইয়া যাইবার সময়, তাহার উপপতিকে বিনাশ করিবার জন্ম মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইত। এখন এসকল মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। কিন্তু একদিন যে এগুলির একটা সত্য অর্থ ছিল, তাহার কি

আবার কোনও সন্দেহ আছে? তারপর রামায়ণ মহাভারতে কত ঘোরতর সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অথবা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দ্রোণ ও কৃপ মহারথী হইতে পারিতেন না। সূর্য্যের সার্টিফিকেট লইয়াও কবি-কল্পনা রাধেয়কে ক্ষত্রিয় করিতে পারিত না। মহাভারতে কত ভাঙ্গা-গড়ার প্রমাণ পাই, অথচ কোনও সাংঘাতিক সামাজিক বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। জীব যেমন আপনার জীবনের প্রয়োজনে, নূতন নূতন অবস্থায় পড়িয়া, আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে, হিন্দুসমাজ যুগে যুগে তাহা করিয়াছে। জীবের গঠন-বিকাশে কোথায় পুরাতনের শেষ আর কোথায় নূতনের সূচনা, ইহা যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; হিন্দুর সমাজ-বিকাশেও কবে, কোন্ সূত্রে কোন্ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়াছে, পূর্ব্বাপর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল ইহাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। হিন্দু চিরদিনই, নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে প্রাচীনকে বদলাইয়া বর্ত্তমানের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে।

মহাভারত ও রামায়ণের অতি পুরাতন কথা ছাড়িয়া, এই চারি পাঁচ শত বৎসরকাল মধ্যে আমাদের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাবেই আমাদের সমাজে রঘুনন্দন কর্ত্তৃক নব্যস্মৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রঘুনন্দন প্রাচীন শ্রুতিস্মৃতিকে এমনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন যে, রঘুনন্দনের পুত্র, পিতৃব্যবস্থানুযায়ী উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিলে পরে, রঘুনাথ শিরোমণি নাকি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই নব্য-স্মৃতির উপরেই আধুনিক বাঙ্গালীর "সনাতনী" প্রতিষ্ঠিত! আমাদের স্থবির সামাজিকগণ যে "সনাতনীর" দোহাই দিয়া মানবের সমাজ, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধকে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, তাহার সনাতনত্ব সাড়ে-চারিশত বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমের দাবী করিতে

পারে না। আর রঘুনন্দনের পরে, এই চারিপাঁচশত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কত কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে! এই কালের মধ্যে কত ব্রাহ্মণ কত শূদ্র গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছেন। কত তথাকথিত হীনজাতির লোকে কত নূতন নূতন সাধন ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, কত ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদিকে আশ্রয় দিয়াছেন। "লোকের মধ্যে লোকাচার" মানিয়া চলিয়া, কত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-শূদ্র সদগুরুর সমাজে "সদাচার" অবলম্বনে কত অন্ত্যজ জাতির অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ দুই শ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত অনাচারকে সমাজ নিঃশব্দে ও নিঃসঙ্কোচে হজম করিয়া লইয়াছে, তার সন্ধান করিলে, আমাদের "সনাতনীর" প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য হয়।

আপনার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধি ও সঙ্গতি করিবার শক্তি ও নিপুণতাতেই জীবের জীবনী-শক্তির প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তি ও নিপুণতা যার আছে, সেই জীবই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে। ইহাতেই সমাজের জীবনী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমাজের এই শক্তি ও নিপুণতা নাই, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ান-সমাজ ইহার অভাবেই লোপ পাইতেছে। এই শক্তি ও নিপুণতা আছে বলিয়াই হিন্দু শত সহস্র বৎসরের অশেষ প্রকারের ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও আপনার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, "সনাতনীকে" প্রাণপণে রক্ষা করিয়াই যে হিন্দু আজও বাঁচিয়া আছে, একথার সাক্ষী হিন্দুর ইতিহাস কোথাও দেয় না। কিন্তু যুগে যুগে হিন্দু আপনাকে যুগ-প্রয়োজন সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়াই বাঁচিয়া আছে, ইহাই সত্য।

কি করিয়া প্রাচীনকে নূতনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, ইউরোপ এখনও ভাল করিয়া তার সঙ্কেতটি শিক্ষা করে নাই। এই

জন্যই প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যাইয়া, ইউরোপ সর্ব্বদাই বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। ইউরোপ দেহটাকে সর্ব্বদাই আত্মা অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিয়াছে। তার পরকাল পর্য্যন্ত দেহাশ্রিত। দেহাত্মধ্যাস ভাল করিয়া নষ্ট হয় নাই বলিয়াই, ইউরোপ সমাজ জীবনের ও ধর্ম্ম-জীবনের বাহিরের ঠাট্‌টাকে লইয়া এত মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে। পুরাতন ঠাট্‌টা গেলে পরিচিত প্রাণটাও গেল, রক্ষণশীলেরা এই ভয়ে সেই ঠাট্‌টাকে প্রাণপণে বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। নূতন কাঠাম প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নূতন ভাব বা আদর্শও কিছুতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না, উন্নতিশীলেরা ইহা ভাবিয়া নূতন কাঠামের স্থান করিবার জন্য সকলের আগে পুরাতন ঠাট্‌টাকে নিঃশেষে ভাঙ্গিতে গিয়াছেন। এইরূপেই ইউরোপে ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দু দেহের প্রতি যত লক্ষ্য করিয়াছে, প্রাণের প্রতি ততোধিক লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপায় ও উপলক্ষ্যকে উপেক্ষা করিতে ভীত হয় নাই। এইজন্য হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর ধর্ম্মে, হিন্দুর জীবনে ও হিন্দুর সাধনায়, যুগে যুগে অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক বিপ্লব প্রায় ঘটে নাই।

যতদিন হিন্দুর দৃষ্টি অন্তর্মুখীন ছিল, আত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা ছিল, অদ্বৈত-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন হয় নাই, ততদিন হিন্দুর ধর্ম্ম বা সমাজনীতি তার আর্ট বা রস-সৃষ্টিকে চাপিয়া রাখিতে চাহে নাই। হিন্দু ব্রহ্মচর্য্যেরও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে, আবার আপনার সাধনাসৃষ্ট স্বর্গে বা ইন্দ্রলোকে মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতিকেও স্থান দিয়াছে। তার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পর্য্যন্ত সহজ শারীর ধর্ম্ম বা মানব ধর্ম্মকে নির্ম্মূল বা অতিক্রম করেন নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্ম্মে এবং আর্টে কোনও বিরোধ বাধে নাই। ততদিন হিন্দুর ধর্ম্মেও আর্ট ছিল, আর্টেও ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের আর্ট ধর্ম্মকে মানিয়া চলিয়াছে; আর্টের ধর্ম্ম আর্টকেই মানিয়া চলিয়াছে। কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে যায় নাই। হিন্দু জানিত যে ধর্ম্মের যেমন একটা

নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য ধর্ম্ম উপযোগী বিধি-নিষেধাদি গড়িয়াছে; এই সকল বিশেষ বিধি-নিষেধ ও সংযমসাধনাদিই সমাজ-ধর্ম্মের ও সাধন-ধর্ম্মের অঙ্গ; সেইরূপ আর্টের বা রস-রাজ্যেরও একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে; সেই লক্ষ্য সাধনোপযোগী শাস্ত্রবিধি আর্ট আত্মপ্রয়োজনেই গড়িয়া তোলে। তাহাকে এসকল শাস্ত্রবিধির আনুগত্য অবলম্বন করিয়াই, আপনার সার্থকতালাভ করিতে হয়। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হিন্দু যুগপৎ সাধন-ধর্ম্মের শুদ্ধতা ও আচার-বিচার এবং সংসার-ধর্ম্মের ভোগবিলাস; নীতির শাসন এবং আর্টের স্বাধীনতা উভয়ই রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। আর্টের সহজ, স্বাভাবিক রস-স্ফূর্ত্তি বা রসবিকাশে আমাদের খৃষ্টীয়-নীতিবাদ-সমাচ্ছন্ন কৃত্রিম ধর্ম্মবুদ্ধি পদে পদে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহেরা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কাব্যের রসোদ্গার পাঠে কখনও ভ্রুকুঞ্চিত করিতেন না। এসকলে তাঁহাদের ধর্ম্মে বা নীতিতে আঘাত করিত না। আর যতদিন না আমরা এই ইউরোপের আমদানী খৃষ্টীয়ান্ নীতিবাদের বাহিরের সভ্যতা-ভব্যতার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম বা নীতি, স্বভাব বা রস-সৃষ্টি, কিছুই সত্যোপেত ও সজীব হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাধামাধবোদয়

[১]

ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়া অবধি ইংরাজী ধরণের কাব্য নাটক উপন্যাস নবন্যাস নভেল গুপ্তকথা গীতিকাব্য ব্যঙ্গকাব্য নক্সা দপ্তর-প্রসঙ্গ রচনা প্রহসন অপেরা প্রভৃতি নানানরকম তরবেতর সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। লোকে পড়িয়া কত আমোদ পাইতেছে। গ্রন্থকারের কত যশ লাভ হইতেছে—ধনলাভ হইতেছে। এই সকল কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া কত লোক সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন, কত লোকের উপর আপনাদের মনের ঝাল ঝাড়িতেছেন; ক্রমে সাহিত্য ও দোষগুণ বিচার লইয়া কি একটা প্রকাণ্ডকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইংরাজী লেখাপড়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে কত পুরাণের তর্জ্জমা, রামায়ণ মহাভারতের তর্জ্জমা, কত কীর্ত্তনের গান, কত চরিত, কত লীলা, কত বিলাস, কত মঙ্গল হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে বড় একটা খোঁজ-খবর নাই। সেকালে কত কাব্য, এমন কি মহাকাব্য পর্য্যন্ত, লেখা হইয়া গিয়াছে তারও কোন খোঁজ-খবর নাই। তার খোঁজও নাই—তার দোষগুণ বিচারও নাই। তাহা লইয়া দলাদলিও নাই, ঝালঝাড়াও নাই।

কয়েক বৎসর ধরিয়া সেকেলে কাব্যের কতকটা খোঁজ আরম্ভ হইয়াছে। বটতলা কতক ছাপাইয়াছিল। এবিষয়ে এখন সাহিত্য-পরিষদ্ বটতলার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন; সেকেলে বই খুঁজিয়া ভাল কাগজে ছাপাইতেছেন, নানা দেশ হইতে পুঁথি আনিয়া পাঠ ঠিক করিতেছেন। যাঁহারা ছাপাইতেছেন তাঁহারা অনেক বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিতেছেন, অনেক দেখিতেছেন শুনিতেছেন ভাবিতেছেন, চিন্তা

করিতেছেন—পাতের তলায় নোট দিয়া পাত পূরাইতেছেন, বড় বড় ভূমিকা লিখিতেছেন, নানারকমের সূচী দিতেছেন; কিন্তু লোকে বড় আদর করিতেছে না। সেকালের কবিদের এত রস ও ভাবময় কাব্য ইঁদুর ও উইয়ে পরম সুখে আস্বাদন করিতেছে। সাহিত্যপরিষদে ভাল গুদাম নাই, সুতরাং শীঘ্রই সে সকল কাব্য জায়গা জোড়া করিবার অপরাধে মণদরে বিক্রয় হইয়া বাবুদের জুতা বাঁধিবার কাগজ হইয়া দাঁড়াইবে।

যাহা হউক মন্দের ভাল, কিছু খোঁজ ত হইতেছে, দুজন দশজন পড়িতেওছে। তাই আমি ভরসা করিয়া একখানি সেকেলে মহাকাব্যের দোষগুণ বিচার করিব মনে করিয়াছি। কাব্যখানি যে মহাকাব্য সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কবি উহাকে মহাকাব্য বলেন নাই, আর পণ্ডিত মহাশয়েরাও বলিবেন না। কারণ তাহাদের মতে "সর্গবন্ধো মহাকাব্যং।" কিন্তু আমাদের কাব্যে সর্গই নাই। উহার ভাগগুলির নাম উল্লাস। মহাকাব্যে বাইশের অধিক সর্গ থাকে না, ইহাতে চৌত্রিশটি উল্লাস আছে, একেবারে শতকরা ৬০টি বেশী! ইহাকে মহাকাব্য বলিলে অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইবে এবং যে বলিবে, মহামহাপণ্ডিতেরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন।

আমি যে কাব্যখানির কথা বলিতেছি সেখানি ১২৯৭ সালে কবির পুত্র মাড়োগ্রামনিবাসী শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ-রচনাকালও কবি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন— "শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রীতয়ে ভবতু শাকেহব্দেক্ষ্মাসপ্তসপ্তক্ষ্মামিতে বৃষসংক্রমে গঙ্গাতীরে পানিহাটীগ্রামেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥ হরি ওঁ॥" সুতরাং ১৭৭১ শকাব্দে গ্রন্থখানি রচনা হয়। অর্থাৎ ইহাতে ৭৮ যোগ করিলে ইংরাজী ১৮৪৯ সনে কাব্যখানি লেখা হয়; অর্থাৎ মেঘনাদবধ বাহির হইবার দশ বৎসর পূর্ব্বে।

কবিও যে বিশেষ অপরিচিত তাহা নহেন। তিনি "শ্রীমৎকলিযুগ-

পাবনাবতার ভগবন্নিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীলকিশোরীমোহনগোস্বামীসূনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী।" সুতরাং বৈষ্ণব সমাজে তিনি খুব সুপরিচিত। যদিও তিনি খড়দহের গোস্বামী নহেন, তথাপি তিনি নিত্যানন্দবংশীয়। যাঁহারা কাব্য বুঝেন, তাঁহাদের কাছেও তিনি অপরিচিত নহেন। কারণ তাঁহার পুত্র কাব্যপ্রকাশকালে বলিতেছেন, "যিনি শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুররসাশ্রয় ভক্তজনগণমানসরসায়ন পরমকরুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীমদ্রামচন্দ্রের জন্মাদি সুচারু লীলাপ্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমদ্রাম রসায়ন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন সেই মহাত্মা রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত, এক্ষণে তৎপুত্র মাড়োগ্রামনিবাসী শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর দ্বারা প্রকাশিত"। সুতরাং রামরসায়ন ও আমাদের মহাকাব্য একজন কবির লেখা, তাঁহার নাম রঘুনন্দন গোস্বামী। তিনি নিত্যানন্দবংশীয়, তাঁহার নিবাস মাড়োগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান।

রামরসায়ন গ্রন্থখানিও যে বিশেষ সুপরিচিত তাহা নহে। তবে যে কেহ রামরসায়নের ঝঙ্কার শুনিয়াছেন, তিনি উহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। রঘুনন্দনের রাম লক্ষ্মণবর্জ্জন করিলেন না, সরযূতে ঝাঁপ দিলেন না। তিনি সীতার সহিত অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধদের সুখাবতী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, মিল্টনের Paradiseএর বর্ণনা পড়িয়া একদিন বিচিত্র আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষ্ণবের বৃন্দাবনধাম পরম সুখের সামগ্রী, কিন্তু রঘুনন্দনের অশোকবন অতি বিচিত্র। সে বর্ণনা বোধ হয় মাধুর্য্যে এ সকলকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সে পবিত্রতা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রচনার সে মাধুরী, ছন্দের সে ঝঙ্কার বোধ হয় সাহিত্যে অতুল।

কিবা অভিরাম সুখধাম সে অশোকবন।
যারে বর্ণিবারে নাহি পারে কোনো কবিজন॥
প্রভু ইচ্ছামতে এ জগতে যাহার প্রকাশ।
কৈলে বিবেচন সেই বন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥

যেই হেতু সেই পুরী সেই বৈকুণ্ঠ অভেদ।
যত শোভা তার তাও তার এই কহে বেদ॥
অন্তপুর কাছে রহিয়াছে সেই উপবন।
যার উপমান দিতে স্থান না হয় নন্দন॥
তারে যেই পায় তার যায় সব শোকগণ।
তেঁই বেদগণে তারে ভণে অশোক-কানন॥
তার চারিপাশে পরকাশে স্ফটিক প্রাচীর।
যারে লঙ্ঘিবারে নাহি পারে আপুনি সমীর॥
তার আছে দ্বার পরিষ্কার দুই দুই স্থানে।
এক সভা-প্রান্ত আর অন্তঃপুর সন্নিধানে॥
তার দ্বারে বসি চর্ম্ম অসি ধারণ করিয়া।
আছে ষণ্ডগণ বিলক্ষণ ভূষণ পরিয়া॥
তার পথ সব অসম্ভব সুন্দর চিকণ।
যাহে করি যত্ন নীলরত্ন করেছে পাতন॥
মাঝে মাঝে তার রক্ত আর ধবল পাষাণ।
দিয়া সাজায়েছে নাহি আছে যার উপমান॥
আলবালচয় স্বর্ণময় পরম শোভন।
দিয়া নানা মণি থানি থানি করেছে সাজন॥
তাহে বৃক্ষগণ সুশোভন না হয় বর্ণন।
পীতমণিময় যার হয় স্কন্ধ শাখাগণ॥
যত পত্র তার চমৎকার হরিন্মণিময়।
যার পুষ্প সেই বর্ণ সেই মণীকৃত হয়॥
হেন তরুততি আছে কতি সেইতো কাননে।
তাহা কহিবারে কেবা পারে একক বদনে॥
কত মনোহর নাগেশ্বর অশোক চম্পক।
লোধ্র কাঞ্চনার কর্ণিকার শেফালিকা বক॥
তাহে নানাজাতি যূঁথি জাঁতি মল্লিকা টগর।
করবীর কুন্দ মুচুকুন্দ বকুল বিস্তর॥

কত সুবিরাজ গন্ধরাজ পুন্নাগ আমলী।
কত সপ্তপর্ণ নানাবর্ণ ঝিণ্টী কৃষ্ণকলি॥
কিবা স্থলপদ্ম শোভাসদ্ম মাধবী মালতী।
কত পরিষ্কার গুলানার বান্ধুলী শেবতী॥
এই আদি কতি পুষ্পজাতি আছে তরুলতা।
রহু তা সবার গণিবার দূরেতে বারতা॥
তাহে আমলকী হরিতকী কপিত্থ কাঁটাল।
কত নারিকেল মিষ্টবেল দাড়িম্ব রসাল॥
কত নাগরঙ্গ সুছোলঙ্গ বাতাপি খর্জ্জূর।
কত দ্রাক্ষা তাল রম্ভা জাল কমলা আঙ্গুর॥
কত মিষ্টরস আনারস অঞ্জীর বাদাম।
কত আম্রাতক মন্দারক লোনা পীলু জাম॥
এই আদি করি ফলধারী যত তরুগণ।
তাহা সংখ্যা করে এ সংসারে নাহি হেন জন॥
সেই বনে ছয় ঋতু রয় সদা মূর্ত্তিমান।
তাহে ঋতুপতি সদা অতিশয় শোভমান॥
তাহে মনোরম বিহঙ্গম কোটি কোটি চরে।
কিবা নীলকণ্ঠ কদ্রুকণ্ঠ মিষ্ট রব করে॥
তাহে সারি সারি দিব্যসারি বসি কথা কয়।
যাহা শুনি নরবাক্যে বড় ঘৃণাবুদ্ধি হয়॥
কত কাকাতুয়া টিয়া শুয়া কাজলা মদনা।
কত দহিয়াল হরিতাল ফুলটুশী ময়না॥
এই আদি মিষ্টভাষী হৃষ্ট কত বিহঙ্গম।
তাহে অলি সব করে রব অতি মনোরম॥
তাহে কৃষ্ণসার রঙ্কু আর রৌহিষ শম্বর।
এই আদি যত মৃগ কত খেলে মনোহর॥
তাহে আছে কত নানামত কৃত্রিম অচল।
যাহা দেখি মজে মহালাজে পর্ব্বত সকল॥

তাহে মনোহর সরোবর আছে অগণিত।
নানা মণিচয় বদ্ধ হয় যাহাদের ভিত॥
চারি দিকে চারি ঘাট পরিষ্কার সুচিকণ।
সেই নানা বর্ণ শিলা স্বর্ণ পট্টে সুশোভন॥
তাহে শোভে জল সুনির্ম্মল দর্পণ সমান।
যাহা করি পান সুধাজ্ঞান করে সুবিদ্বান॥
সেই জলান্তরে খেলা করে কত জলচর।
যেন অন্ধকারে উড়ি ফেরে খদ্যোতনিকর॥
তাহে শোভে কত রক্ত সিত অসিত কমল।
কত ইন্দীবর মনোহর কৈরবপটল॥
তাহে করে রব হংস সব শরালি সারস।
কত চক্রবাক ছাড়ে বাক ডাহুক সরস॥
তাহে ভৃঙ্গততি করে অতি মধুর ঝঙ্কার।
যাহা শুনি চিত্ত বিচলিত না হয় কাহার॥

কিন্তু রামরসায়নের কথা ত বলিতে বসি নাই—আমরা রঘুনন্দনের অপর কাব্যের কথা বলিতেছি। রামকথা ও কৃষ্ণকথা এই দুই কথাই ভারতবাসীর প্রধান সম্বল। রঘুনন্দন রামকথা রামরসায়নে বলিয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য কৃষ্ণকথায় পূর্ণ। উহার নাম 'রাধামাধবোদয়'। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধিকার রাগোদয় হইতে রাসলীলা পর্য্যন্ত একাব্যে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাথুর লীলাও নাই প্রভাস লীলাও নাই—ইহার এক লীলা বৃন্দাবন লীলা। সে লীলা আনন্দের ঝরণা, প্রীতির উচ্ছ্বাস ও সুখের ফোয়ারা। সমস্ত কাব্যখানিতে অসুখের নামগন্ধ নাই। কবি গোস্বামী, কীর্ত্তন তাঁহার সিদ্ধ বিদ্যা, কৃষ্ণলীলা তাঁহার মজ্জাগত। তিনি যখন কৃষ্ণলীলা লিখিতে বসিয়াছেন, তখন সঙ্কীর্ত্তনের পদগুলি ভাঙ্গিয়া পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি সুললিত ছন্দে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পড়িতে গেলে সব

সময়েই মনে হয় যেন কীর্ত্তনের গান শুনিতেছি, যেন রেণেটী ও মনোহরসাহী সুর কানে বাজিতেছে। কবির ভাষা তাঁহার ছন্দের ঠিক অনুরূপ—এখনকার মত চোয়ালভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ তাহাতে নাই। লম্বা সমাসের, দূরান্বয়ের, ইংরাজী ভাবের ছড়াছড়ি নাই।

তাঁহার কাব্যের প্রথমেই কৃষ্ণের বংশীধ্বনি। সে বংশীধ্বনিতে সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল পূর্ণ হইয়া গেল। তবে এখনকার সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতালের ধারণা একরূপ, সেকালে আর একরূপ ছিল। জিনিযটা একই কিন্তু লেখার ভঙ্গী আর একরূপ।

সেইকালে কাননেতে শ্রীনন্দনন্দন।
করিলেন কৌতুকেতে মুরলী বাদন॥
সেই শব্দে এ তিন ভুবন আচ্ছাদিল।
তাহে নানা স্থানে নানা ভাব উপজিল॥
বিধাতার ধ্যান-ভঙ্গ করিল সে রব।
কাঁপিতে লাগিল তাঁর কলেবর সব॥
বুঝি বেণু-রবে তাঁর আসন কমল।
প্রফুল্ল হইল তেঁই করে টলমল॥
সনকাদিমুনিদের সমাধি ভাঙ্গিল
নয়নেতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল॥
বুঝি বেণু-রবে দ্রব হইয়াছে মন।
দেখিছে বাহিরে আসি সে নন্দনন্দন॥
সেই রব শুনি ভব হইল স্তম্ভিত।
বুঝি কৃষ্ণে দেখিতে গিয়াছে তাঁর চিত॥
মুরলীর রব শুনি কাঁপে মরুত্বান্।
তাহাতে আমার মন করে অনুমান॥
সেই শব্দ শুনি খসে শচীর বসন।
তাহা দেখি কোপে কাঁপে সহস্রলোচন॥
পাতালে পন্নগ পতি স্তম্ভিত হইলা।
সেই হেতু পতি-ভয়ে ভূমি কি কাঁপিলা॥

যমুনাদি নদী যত হইল স্থগিত।
নিজ নিজ গতি ভুলে অত্যন্ত বিস্মিত॥
মকর কচ্ছপ মীন আদি জলচর।
মুখ তুলি তুলি ভাসে জলের উপর॥
জলের ভিতরে ভাল শ্রবণ না হয়।
সেই লাগি মুখ তুলি তাহারা ভাসয়॥
ময়ুর কোকিল আদি বিহঙ্গম সব।
তারা শুনে ত্যজি ত্যজি নিজ নিজ রব॥
গো মৃগ মহিষ আদি যত পশুগণ।
আহার ত্যজিয়া শুনে সেই বেণুস্বন্॥
বৎস সব দুগ্ধ পান করিতে করিতে
মুরলীর শব্দ শুনি মোহ পায় চিতে॥
অতএব সেই দুগ্ধ গিলিতে না পারে।
গড়ায়ে গড়ায়ে ভূমে পড়ে মুখদ্বারে॥
অপর কি কব যত তরুলতাগণ।
মঞ্জরী-ছলেতে করে পুলক ধারণ॥
যে যে তরুলতা আগে শুষ্ক হয়ে ছিল।
তাহারাও দল ফুল ফলেতে ভরিল॥
অপর কি কব আর মাধুরী তাহার।
পাষাণ গলিয়া গেল সংযোগে যাহার॥

এই বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার ভাবোদয় হইল। কবি তাঁহার প্রথম উল্লাসের নাম রাখিয়াছেন 'রাধাভাবাঙ্কুরোদ্গম'। কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজান, তখন রাধিকা সখীগণকে লইয়া অট্টালিকার উপরে কন্দুক ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের রূপও দেখেন নাই, গুণও শুনেন নাই। কিন্তু সেই বংশীধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে সুধা-ধারায় আর্দ্র করিয়া দিল এবং সেই সুধাসিক্ত হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর উদয় হইল। তাঁহার গণ্ডদেশ পুলকিত হইল, হাত কাঁপিতে লাগিল, হাত হইতে গেঁদ পড়িয়া গেল।

যিনি কন্দুক-ক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, তাঁহার হাত হইতে গেঁদ পড়িয়া গেল দেখিয়া সখীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি হইল" ? শ্রীরাধিকা বলিলেন, "ওই শুন কি শব্দ হইতেছে—উহাতে আমার কান ভরিয়া গিয়াছে—মন মজিয়া গিয়াছে, আমি হাত ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া সখীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে উহা বাঁশীর রব, কৃষ্ণ ওই বাঁশী বাজাইতেছেন। তখন রাধিকা ললিতার নিকট কৃষ্ণের পরিচয় লইলেন ;—

সখি ওই কৃষ্ণ হন কাহার তনয়
কেমন তাহার রূপ কি গুণ ধরয়।

ললিতা বলিলেন—

সখি দিয়া মন করহ শ্রবণ
নন্দের নন্দন গোকুলে রহে।
কৃষ্ণ তাঁর নাম অতি অভিরাম
যার কোটি কাম সমান নহে॥

* * * * * *

যত গুণ তার আছে তাহা কার
সখি গণিবার শকতি আছে
শ্রীরঘুনন্দন হন কি না হন
গুণের ভবন তাঁহার কাছে॥

এই সকল কথা শুনিয়া রাধিকা একটু উন্মনা হইলেন এবং অসুখ করিয়াছে বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

কবির দ্বিতীয় উল্লাসের নাম রাধার 'রাগবিকাশ'। সেই রাত্রেই রাধিকা স্বপ্ন দেখিলেন—

দেখিছেন তাহে রাধা যমুনার ধারে।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীনন্দ-কুমারে॥

কিন্তু স্বপ্নের খেলা ; কিছুক্ষণ পরেই রাধিকা কৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলিলেন ;—

এই রূপ দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল।
দেখিতে না পান আর রাধিকা গোপাল॥
তবে তিঁহ অতিশয় হইলা বিহ্বল।
ভুজঙ্গিনী যেন মণি হারায়ে বিকল॥
হায় হায় কি হইল কি হইল বলি।
জাগিয়া উঠিল তিঁহ করিয়া বিকলি॥

সখীরা নিকটে শুইয়া ছিল তাহারাও জাগিয়া উঠিল এবং বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্বপ্ন দেখিয়াছ"? রাধিকা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না, নখদিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন। সখীরা প্রথম অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বলিলেন, 'লজ্জাই তোমার বড় হল, তবে আমরা কেহ নই?'—

থাক তুমি সেই প্রিয় সখীরে লইয়া।
মোরা কি করিব আর এখানে থাকিয়া॥
এত কহি ললিতা বিশাখা দুইজন।
উদ্যম করেন কুঠী করিতে গমন॥

তখন নিরুপায় হইয়া রাধা স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন;—

দেখিতে দেখিতে সেইরূপ ক্ষণকাল।
স্বপ্ন হরিয়া নিল বিধি হয়ে কাল॥
অতএব সেই রূপ না পাই দেখিতে।
উঠিলাম বৈকল্য করিয়া আচম্বিতে॥
* * * * * *
কে বটে সে কোথা রহে তনয় কাহার।
তাহা অনুভব নাহি আসয়ে আমার॥
তথাপি দেখিতে তারে মন সদা চায়।
কি করিব সখি হল মোর বড় দায়॥

বিশাখা বলিলেন, "দেখ আমি বেশ ছবি আঁকিতে পারি। আমি গোকুলে ঘরে ঘরে ঘুরে আসি, তুমি যে রূপ বর্ণনা করিলে, সে রূপ

যেখানে দেখিব আঁকিয়া আনিব। এই বলিয়া বিশাখা বাড়ী গেল এবং কৃষ্ণের ছবি আঁকিয়া আনিয়া রাধিকাকে দিল।

কিবা বিশাখার সেই চিত্র চমৎকার।
যাহে চিত্রবুদ্ধি নাহি হইল রাধার॥
স্বপ্নদৃষ্ট সেই এই হয় বলি মানি।
চমকিত হইয়া উঠিলা ঠাকুরাণী॥

* * *

হেন মত সৌভাগ্য কিবা হইবে আমার।
দেখিতে পাইব তারে এই ছবি যার॥

রাধিকা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ললিতা আসিয়া উপস্থিত। ললিতা বলিলেন, কেমন ছবি ঠিক হইয়াছে? রাধিকা বলিলেন—

এই চিত্র যার তাহার দর্শন লাগিয়া।
অধিক উৎকণ্ঠা করিতেছে মোর হিয়া॥

ললিতা জিভ কাটিয়া বলিলেন, সেটি ত কিছুতেই হইতে পারে না। তুমি পতিব্রতা, কিরূপে পরপুরুষ দেখিতে চাহিতেছ। তোমার স্বামী আছে, শ্বাশুড়ী আছে, ননদ আছে, ঘর গৃহস্থালি আছে, তোমার কি পরপুরুষে মন দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তোমার অখ্যাতি হইবে, লোকে তোমায় ধিক্কার দিবে। তোমার পিতা রাজা, তাঁর মুখ হেঁট হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন রাধিকা বিরস-বদনে বলিলেন—

সখি, আপনার মন বশ করিবারে।
করিতেছি আমি যত্ন বিবিধ প্রকারে॥
কিন্তু এহ কোন মতে স্থিরতা না পায়।
যদি জান তবে কিছু বলহ উপায়॥

তখন ললিতা রাধিকার ভাবাঙ্কুর পুষ্ট হইয়াছে জানিয়া বলিলেন—

সখি, আমাদের গুরু হন পৌর্ণমাসী।
বিশেষে তোমায় তাঁর দেখি স্নেহরাশি॥

অতএব এই কথা জানাইবা তায়।
করিবেন তিঁহ ইথে উচিত উপায়॥

এই বলিয়া বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া ললিতা পৌর্ণমাসীদিদির বাড়ী গেলেন এবং তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিলেন। পৌর্ণমাসী সুখী হইলেন এবং বলিলেন—

বাছা চিরজীবী হও তোরা দুইজন।
করিলে আমারে বড় আনন্দিত মন॥
রাধার কৃষ্ণেতে হয় প্রেমের প্রকাশ।
নিরবধি এই মোর মনে অভিলাষ॥
আনুকূল্য করিতেছ তোরা দোঁহে তায়।
এই লাগি করিতেছি আশিষ্ দোঁহায়॥
এবিষয়ে যেই যেই সাহায্য করিবে।
সেই সেই মোর প্রিয় অধিক হইবে॥
যেহেতুক রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিবারে।
আমি আছি চিরদিন গোকুল মাঝারে॥
এতদিনে বুঝি মোর সেই ত বসতি।
সফল হইতে পারে এই হয় মতি॥

এই পৌর্ণমাসীটি বাঙ্গালী কবিকুলের সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ইহার নাম বড়াই; আমাদের কবি ইহার নাম দিয়াছেন পৌর্ণমাসী। এই পৌর্ণমাসী মাসীর সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু দু'জনেরই ব্যবসা এক। তবে বিদ্যা-সুন্দরের ধর্ম্মটা নাই। এখানে ধর্ম্মটা ফোটাবার বেশ চেষ্টা আছে। পৌর্ণমাসী বলিতেছেন—আমি রাধাকৃষ্ণ-লীলা দেখিব বলিয়া বহুকাল ধরিয়া গোকুলে বাস করিতেছি, তোমরা দু'জনে আজ আমার কাছে আসিয়া ও এই সকল খবর দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলে, আমার জন্ম সফল করিলে। মালিনী মাসীর যেমন পাওনা-গণ্ডার উপর দৃষ্টি ছিল, এখানে তাহার একেবারেই নাই। এক শ্রেণীর

পাঠক নাক সিঁটকাইয়া বলিবেন, রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়, আর তার মধ্যবর্ত্তিনী পৌর্ণমাসী সামান্য কুট্টনীমাত্র। আবার আর একদল বলিবেন যে, এই পৌর্ণমাসী যেন St. John। St. John যেমন যীশু খৃষ্টের অবতারের পথ পরিষ্কারের জন্য আগেই আসিয়াছিলেন, সেইরূপ পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য বহুকাল হইতে আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

যাহা হোক পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের মিলন করিয়া দিবেন ভার লইলেন। বন্দোবস্ত হইল, রাধিকাকে সূর্য্য-পূজার ছলে বনে পাঠাইয়া দিবেন। সেইখানেই কৃষ্ণরাধার মিলন হইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নব বর্ষ

কাল সনাতন-পুরাতন,—একরকমের একঘেয়ে ব্যাপার! এই অখণ্ডদণ্ডায়মান কালকে মুখরোচক করিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই তাহাতে কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, ঋতু মাস, রাত্রি দিন প্রভৃতি নানা রকমের ছেদ দিয়া লইতে হয়। এই এক-একটা ছেদ বা বিরামের পরে একটানা কালের প্রবাহ যেন কিছুদিনের জন্য একটু নূতন বলিয়া মনে হয়। নবীনতার সৃষ্টির জন্যই কালের পরিমাণ; কারণ নবীনতাই জীবন। যতদিন পুরাতন জগৎকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নূতন ভাবে গড়িয়া লইতে পারি ততদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন বাঁচিবার জন্য সাধ হয়,—চেষ্টা হয়; ততদিন জীবনের মোহ থাকে, মরণে ভয় থাকে।

নব-বর্ষ পুরাতন জীবনকে নূতন করিবার একটা উপায় মাত্র,—একঘেয়ে, একটানা অস্তিত্বটাকে একটা খেয়ালের ছেদ দিয়া নূতন করিয়া লইবার একটা ভঙ্গী মাত্র। সে খেয়াল আর কিছু নহে, একটু অতীতের আলোড়ন, স্মৃতির চিতাচুল্লীতে ফুৎকার দিয়া একটা অগ্নিজিহ্বা বিকাশের চেষ্টা মাত্র। সেটা স্পর্দ্ধাসুখের অগ্নিজিহ্বা, তুষ্টি-তৃপ্তির আলোক বিকাশ, আমার আমিত্বের একটা স্ফুরণ মাত্র। এ স্পর্দ্ধাসুখ জাতিগত হইতে পারে, ব্যক্তিগতও হইতে পারে;—এ তুষ্টি তৃপ্তি আমার নিজের হইতে পারে, আমার যাহারা, আমি যাহাদের তাহাদেরও হইতে পারে; এই আমিত্বের স্ফুরণ আমার দেহগত আমিত্বের হইতে পারে, বংশগত আমিত্বের হইতে পারে, জাতিগত আমিত্বের হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, যেমনই হউক না কেন, কালের পরিমাণ অতীত স্মৃতির আলোড়ন মাত্র; সে আলোড়নে ভাবী সুখের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানকে নবীনতার সোনার তবকে মুড়িয়া একটু উজ্জ্বল করিয়া তোলা যায়।

তাই নব-বর্ষ, পর্ব্বাহ, উৎসব, উল্লাস, ব্রত নিয়মাদির প্রবর্ত্তনা হই-য়াছে।

চাই নূতন—নিতুই নূতন; পুরাতনকে চাহি না। যখন নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন যাহা দেখি তাহাই নূতন বলিয়া মনে হয়। যতদিন সংসারের সকল অনুভূতি নূতন বলিয়া মনে হয় ততদিন জীবনটা মোহময়-মধুময় বোধ হয়। কিন্তু যেদিন হইতে পুরাতনের বাতাস দেহে আসিয়া লাগে, সেইদিন হইতে পুরাতনকে নূতন করিয়া লইবার চেষ্টা হয়। নিজের অনু-ভূতি সকল যখন আর কিছু নবীন খুঁজিয়া পায় না; তখন পুত্রের জীবনে, পৌত্রের ধূলা-খেলায় নিজেকে নূতন করিবার চেষ্টা হয়; তখন তাহাদের জীবনের নবীন-প্রবাহের সহিত নিজের পুরাতন জীবনের পুরাতন প্রবাহটা মিশাইয়া দিবার বাসনা হয়। তখন আর নিজের আহার-আচ্ছাদনে সুখবোধ হয় না; তাহারা খাইলে সুখ, পরিলে সুখ; উল্লাসের আবেগে তাহারা হাসির লহর তুলিলে সে লহরে লহরে নিজের হাসি মিলাইয়া সুখবোধ হয়। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র—সংস্করণের পর সংস্করণ করিয়াও যখন কালের চিরপুরাতন প্রবাহকে আর নবীনতার তবক মুড়িয়া রাখা যায় না, তখনই পুরাতন দেহ, পুরাতন জীবন সনাতন-পুরাতন কালের অঙ্গে মিশা-ইয়া যায়; অক্ষয়, অনন্ত, অব্যাহত কালের বক্ষে জীবন বুদ্‌বুদ্‌টি ফাটিয়া গলিয়া মিশাইয়া যায়।

জাতির হিসাবেও চাই নূতন—নিতুই নূতন। পুরাতন একঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না। ভাল না লাগিলেই, অরুচি বোধ হইলেই অবসাদ আসিলেই বুঝিতে হইবে মৃত্যুর প্রশ্বাস জাতির অঙ্গে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। যখন নূতন সৃষ্টির পুরুষকারের অভাব ঘটে, নিসর্গ-সুন্দরীকে মথন করিয়া নূতন কিছু যখন আর বাহির করা যায় না, যাহা কিছু দেখি সে সকলই পুরাতন বলিয়া মনে হয়, তখন পুরাতনকে ডাকিয়া আনিয়া নূতনের প্রবর্ত্তনা করিবার প্রয়াস

হয়। তখনই মনে হয়, আজ শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ করিয়াছিলেন, অতএব কর উৎসব; আজ নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, অতএব নাচ গাও, আনন্দ কর। তাই আমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ, দিনে দিনে উৎসব, ব্রত, যাগ, যজ্ঞ, উপবাস। অতি পুরাতন জাতি আমরা বৎসরের এমন একটা দিন নাই, যেদিন একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে নাই। এইভাবে কেবল পুরাতনের রোমন্থন করিতে করিতে যখন তাহাও ভাল লাগে না, তাহাও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়, তখন একটা নূতনের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে। একটা নূতন ধর্ম্ম, নূতন সংস্কার, নূতন পদ্ধতি চালাইয়া কিছুকাল নবীনতার উপভোগ করিয়া মুগ্ধ থাকিতে চেষ্টা করি। দেবতার কৃপা থাকিলে এমনই অরুচির সময়ে, এমনই পুরাতনের বিকটতা বিকাশের সময়ে নূতন মানুষ আসিয়া একটা নূতন ভাবের, নূতন রসের প্রচলন করিয়া যান। তাই হিন্দুর কাল প্রবাহের ঘাটে ঘাটে এক এক অবতার বিদ্যমান, তীর্থে তীর্থে মহাপুরুষ বিরাজমান। এই ভাবে অতীত ইতিহাসের সাহায্যে, দশ অবতার, ঋষি মুনি, দিগ্বিজয়ী মহাবীরগণের সাহায্যে সনাতন পুরাতনকে নবীন করিয়া রাখিবার সার্থক চেষ্টা করিয়াছি বলিয়াই জাতির হিসাবে আমরা এখনও স্পন্দন রহিত হই নাই—বুঝিবা হইবও না।

এই হেতু ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন যে, সনাতন পুরুষ হইলেও, পুরাণ পুরুষ হইলেও, অজয়, অমর অক্ষর, অচ্যুত পুরুষ হইলেও, তিনি নিতুই নূতন। ইহাই তাঁহার মহিমা, ইহাই তাঁহার অপূর্ব্বত্ব। মানুষ এই সৃষ্টি-চাতুরীর মধ্যে, এই বিশ্ববিকাশের মধ্যে স্বীয় মেধা ও বুদ্ধির সাহায্যে যাহা কিছু দেখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা দেখিলে ও বুঝিলে পরে তাহাকে পুরাতন ও পরিচিত বলিয়াই মনে হয়। সৃষ্টি অনন্ত বটে, পরন্তু মানব-পরম্পরাও অনন্ত, কেন না মানুষও সৃষ্টির ভিতরের সামগ্রী। এই অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত বিকাশকে মানুষ তাহার বুদ্ধি ও মেধার সাহায্যে দেখিতে দেখিতে, বুঝিতে

বুঝিতে তাহার পক্ষে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হয় যখন সৃষ্টির সর্ব্বস্ব অতি পুরাতন এবং একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। এই এক-ঘেয়ের ভাব মনে গাঁথিয়া বসিলেই জড়জগৎকে হেয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাধ যায়। কিন্তু জগৎ হেয় বোধ হইলে, জগতের মানুষ হেয় হয়, আমিই আমার কাছে হেয় হইয়া উঠি। তাই ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছেন,—খবরদার, এই সৃষ্টিচাতুরীকে কেবল বুদ্ধির ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের মাপ কাটিতে মাপিয়া লইবার চেষ্টা করিও না, ভাবের দিক্ দিয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, জাতির হিসাবে তোমার মরণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। ইহাকে রসের দিক্ দিয়া দেখ;—দেখিবে গুপ্ত বৃন্দাবনে রসময় নিত্য রাসলীলায় মগ্ন হইয়া আছেন। সে লীলায় কোটি কোটি নবীনতার ফোয়ারা ছুটিতেছে, ক্ষণেক্ষণে, পলেপলে নূতন নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতেছে; নবীনতার মহাপ্লাবন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে এক একবার আসিয়া গগন পবনকে প্লাবিত করিতেছে, এক অনুপলের জন্যও কাহাকেও, কোন কিছুকেই পুরাতন থাকিতে দিতেছে না। এই নবীনতার আরাধনাই ধর্ম্ম, এই নবীনতায় সিদ্ধ হইতে পারিলে অমর হওয়া যায়; অমর হইয়া অক্ষয় নবীনতার সাগরে অনন্তকাল ভাসিতে পারা যায়। সে নবীনতায় তুষ্টি আছে, কিন্তু তৃপ্তি নাই;—

> "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
> নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তৃপ্তি হইবার নহে; কেননা তৃপ্তি হইলেই অরুচি হইবে, অরুচি হইলেই পুরাতনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে; সনাতন-পুরাতনকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেই, সৃষ্টির নবীনতার অন্তরালে বিষ্ণু-পঞ্জরের খবর পাইলেই "জলবিম্ব জলে হবে লয়।" সে মরণ ঈপ্সিত নহে; সে মরণের হাত এড়াইবার জন্য যুগে যুগে পূর্ব্বজগণ কত সাধনা করিয়াছেন, কত দুশ্চর তপশ্চরণ করিয়াছেন; সে মরণের হাত এড়াইবার জন্য কাল সহোদরা কালিন্দীর কূলে, বংশীবট মূলে বসিয়া

বনমাঝে ও মনোমাঝে তোমার বংশীরব শুনিবার চেষ্টা ভক্ত-ভাবুক-গণ অহরহঃ করিতেছেন। বাঁশীর সে রব কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিলে পুরাতন সংসার আর পুরাতন থাকে না, সবই নূতন হয়; সুতরাং মরণের ভয় থাকে না।

এই মৃত্যু, এই বিলুপ্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের নব-বর্ষ, আমাদের "নারায়ণের" নববর্ষ। এক-এক করিয়া দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইয়াছে; দ্বাদশ খানি "নারায়ণ" পাঠকের হস্তগত হইয়াছে। সেই একঘেয়ে লিখন-মুদ্রণ পঠনের একটানা স্রোতে একটু বিরাম যোগাইবার উদ্দেশ্যে একবার নববর্ষের স্মরণ করিলাম। পাছে পুরাতনের রোমন্থনে অরুচি ঘটে, পাছে ভাবে ও রসে পুরাতনের গন্ধ ফুটিয়া উঠে, তাই বার মাসের পরে একটা নূতন পর্য্যায়ের অবতারণা করিতে হয়। একটানা এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত গণিয়া যাওয়া কঠিন, তাহাতে বিরক্তি হয়, শ্রান্তি বোধ হয়, বিষম অরুচিও বোধ হয়। পুরাতন জাতি, পুরাতন জীবন, পুরাতন রোগ, ইহার উপর অরুচি দেখা দিলে ত পীড়া সাংঘাতিক হইবে, মরণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাই অরুচির পথ রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই নববর্ষের পরিকল্পনা। আমাদের নবীনতা কি? পরের সামগ্রী-পরের আচার পদ্ধতি চালাইয়া তাহাকে নূতন বলিয়া পরিচিত করিবার ফন্দী আমাদের নবীনতার বেদী নহে। পুরাতন দেবতার বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া, সেই মাটিতে, সেই প্রস্তর চূর্ণে নিজের অনভ্যস্ত শিল্পবিদ্যার সাহায্যে বানর গড়িয়া তাহাকে নবীনতার রত্নবেদীতে বসাইয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা আমাদের নবীনতার পরিচায়ক নহে। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া গড়িলে নূতন হয় না। ছাঁচ এক থাকিলে যতই কেন গড় না, সেই একই বিগ্রহ তৈয়ার হইবে। ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন—মমত্বে নবীনতা। যাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসি তাহাকে নিমেষে নিমেষে নূতন দেখি। শৈশবে যখন পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া থাকিতাম, তখন প্রতি পলক্ পাণ্টাইতে না পাণ্টা-

ইতে—সে গলিত কেশে, গলিত অস্ত-দন্তহীন তুণ্ডে, জ্যোতিহীন নয়নে—সে জীর্ণ পুরাতন দেহে কত নূতনতারই বিকাশ দেখিতাম। নবীনতা নূতন গড়া সামগ্রীতে পাওয়া যায় না। নবীনতা আমার গড়া, আমার সাধের সামগ্রীতে নিতুই জড়ান আছে। এই নবীনতাই আমাদের আরাধ্য, ঈপ্সিত, প্রার্থিত।

সে নবীনতা আমার মমত্ব বোধ। আমার যাহা, তাহাতে অনন্ত, অপরিমেয়, অগাধ নবীনতা জড়ান-মাখান মিশান আছে। সে নবীনতার শেষ নাই, সমাপ্তি নাই; যতই দেখি ততই নবীন, প্রতি-পলকে পলকে নূতন, নয়ন পালটিতে না পালটিতে নূতন, নির্নিমেষ-নয়নে দেখিলেও প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন—নূতনের আধার, নবীনতার অক্ষয় প্রস্রবণ। এত নূতন বলিয়াই তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; এমন অসীম নবীন বলিয়াই তাহাকে পরের হাতে দিতে ইচ্ছা করে না। তাই যখন পুরাতন আসিয়া চাপিয়া ধরিতে চাহে, যখন মনে হয় আমার নবীনকে বুঝি-বা এইবার ছাড়িতে হইবে, তখন বিষাদভরে বলিতে হয়,

> "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
> কানু হেন গুণনিধি,
> কা'রে দিয়ে যাব?"

কাহারে দিয়া যাইব—এই ভাবনায় মরিতে পারি না। আমার মতন আর কেহ ত সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিবে না; আমার মতন আমার বলিয়া আর কেহ ত তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আমার ভালবাসা আমার দৃষ্টিতে অতুল্য, অনুপম, অসাধারণ! আমার মতন ত এমন করিয়া আর কেহ ভালবাসে না! সবাই তাহার গৌরবে সুখী হয়, আমি তাহার কলঙ্কে শ্লাঘা বোধ করি, অসীম সুখ অনুভব করি। আমি যে তাহার কলঙ্কের চন্দনলেপ সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত রাখিতে ভালবাসি! তাই মরণ সম্মুখীন হইলে, মরণ ভয়ে

ভীত হই না, লোকান্তরে যাইতেও সঙ্কোচ বোধ হয় না। কিন্তু আমি যাইলে, আমার যাহা তাহাকে আমার মতন করিয়া কে বুকে করিয়া রাখিবে? সংসারের সকলে শ্লাঘা, গৌরব, ঐশ্বর্য্য, স্পর্দ্ধা এই সবই ভালবাসে। আমার যাহা তাহার সবটাই যদি শ্লাঘার হইত; তাহা হইলে তাহাকে মাথায় করিয়া রাখিতে অনেকেই অগ্রসর হইত। কিন্তু আমার যাহা তাহাতে শ্লাঘাও আছে, গৌরবও আছে, ঐশ্বর্য্যও আছে; আবার লজ্জা, কলঙ্ক, গ্লানিও যথেষ্ট আছে। গৌরব-টুকু লইয়া কলঙ্কটুকু বাদ দিলে ত আমার মতন ভালবাসা হইবে না; শ্লাঘাটুকু লইয়া লজ্জাটুকু বাদ দিলে ত আমার মতন এত আদরে কেহ তাহাকে বুকে করিয়া রাখিতে পারিবে না। কাজেই শঙ্কিত চিত্তে, চকিত ভাবে, চারিদিক্ তাকাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

কানু হেন গুণনিধি
কারে দিয়ে যাব?

আমার মতন ত আর কেহ নাই। আমার কানু ছাড়া গীত নাই, কানু ছাড়া কর্ম্ম নাই, কানু ছাড়া ভাব নাই, রস নাই; কানু আমার দেশ, কানু আমার জাতি, কৃষ্ণ আমার বর্ণ, কানু আমার সাথী,—

"কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিসে নিমিসে হারা॥"

এমন করিয়া কালাকে আর ত কেহ ভালবাসে না, এমন করিয়া কালার শ্লাঘা ও কলঙ্ক চন্দনচুয়ার মতন আর ত কেহ সর্ব্বাঙ্গে মাখে না! আমার দেশের কবি, আমাদের সাধক ও প্রেমিক তাই স্পর্দ্ধা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"কানু পরিবাদ বড় ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।"

এতদিনে বিধাতা সে সাধপূর্ণ করিয়াছেন, কালাকলঙ্ক আমার সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। আমার কলঙ্কের নিত্য নূতন খেলা দেখাইবার জন্য আমি এখনও বাঁচিয়া আছি, আরও বহুকাল বাঁচিয়া থাকিব। সেই জীবনের এক এক পর্ব্বের পরিমাণ করিবার উদ্দেশ্যে আমার নববর্ষের আলোচনা। আমার দেবতা নবনটবর, আমরা নবভাববিভোর, আমাদের জন্মভূমি শারদজ্যোৎস্নাশোভিনী, নবানুরাগপ্রহ্লাদিনী, অনন্তনবীনতার প্রস্রবিনী। তাই মার্গশীর্ষে নববর্ষের পুষ্পাঞ্জলি লইয়া বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলমধ্যস্থ নবীন দেবতাকে অর্ঘ্য দিতেছি। মরিব না বলিয়াই, মরিতে পারিব না বলিয়াই, মরিতে নাই বলিয়াই এই পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি। এ রাজ্যে, এ দেশে, এ জাতির মধ্যে, এমন সাহিত্যে, এমন প্রেমরসপূর্ণ ধর্ম্মে ও কর্ম্মে মরণ নাই বলিয়াই এই পুষ্পাঞ্জলি।

আমাদের সবই কৃষ্ণময়-কৃষ্ণপূর্ণ; নববর্ষও কৃষ্ণতত্ত্বের সূচক তাই ভক্ত কবি গান করিয়াছেন,—

আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি,
বৃক্ষ গুল্ম শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা
কৃষ্ণরূপ মাখামাখি।
যে সময়ে আমি যে স্থানেতে যাই,
অধো ঊর্দ্ধ আদি দশদিকেতে চাই,
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি॥

নববর্ষে নবীনের কথাই মনে পড়ে। তাই কৃষ্ণ কথা মনে জাগিয়া উঠে। তিনি ত পুরাতন হইলেন না—হইবার নহেন। কারণ তিনি যে আমার, আমাদের দেশের, জাতির, ধর্ম্মের, সাহিত্যের, কাব্যের, অলঙ্কারের, প্রেমের এবং রসের। তাহারা—যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন

এবং চলিয়া গিয়াছেন,—তাহারা দেশকাল ও পাত্র অনুসারে, তাহা-দের সময়ের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমার কানুকে সাজাইয়া-ছেন, আমার কানুর কথা কহিয়া গিয়াছেন। সে পদ্ধতি যদি আমার পক্ষে এখন পুরাতন বোধ হয়, তাহা হইলে আমার রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, ভাব ও ভাষা অনুসারে নূতন পদ্ধতিতে আমার নটবরকে সাজাইতে হইবে। "নারায়ণ" পুরাতনকে—সনাতনকে নূতন করিয়া দেখিবার একটা রকম-ফের মাত্র। যে সাজে সাজাইলে আমার তৃপ্তি বোধ হয়, ক্ষণেকের তুষ্টি বোধ হয়, "নারায়ণ" সেই সাজ, সেই সরঞ্জম। সেই সাজের একটা পর্য্যায়, একটা পর্ব্ব শেষ হই-য়াছে। আবার নূতন চেষ্টায়, নবীন উদ্‌যোগে নূতন বর্ষ আরম্ভ করিতে হইবে। তাই এত কথা, তাই পুরাতনের এতটা আবৃত্তি, আমাদের যে মরণ নাই, মরিতে নাই তাহারই ব্যাখ্যান। গিয়াছিলে ত,—বিদেশের অজ্ঞাত ও অপরিচিতকে নবীন বলিয়া ধরিতে গিয়াছিলে ত! ধরিয়া রাখিতে পারিলে কি? তোমার যিনি নিত্য নূতন, নবীন নটবর, অপূর্ব্বসুন্দর, অনন্ত রসের সাগর তিনিই ত রাস-মণ্ডলে আসিয়া, রাসমঞ্চ জুড়িয়া আলো করিয়া বসিয়াছেন। এই শ্যাম-শ্যামার দেশে, কালোরূপের দেশে কানু ছাড়া, কালা ছাড়া আর যে নূতন কিছু নাই। সেই হেতু নববর্ষের কথা কহিতে যাইয়া তাহারই কথা মনে পড়িল, যিনি কুরুক্ষেত্রের মহারণ-প্রাঙ্গনে ভারতবাসীর জন্য নবীনতার বেদী রচিয়া দিয়া গিয়াছেন, যিনি বৃন্দা-বন লীলায় অমোঘ নব রসের অনন্ত প্রবাহ ছুটাইয়া গিয়াছেন। সেই ত আমি, আমি ত সেই তাহারই; কারণ আমাছাড়া আর ত কেহ জগৎটাকে কৃষ্ণময় দেখে না। যাহারা মরে না, মরিতে পারে না, কেবল দেহলীলায় খোলস ছাড়ে আর নূতনরূপ ধারণ করে, তাহারাই গুপ্ত বৃন্দাবনে অনন্তকাল মহারাসের মহাবিকাশ দেখিতে জানে, মীনের ন্যায় নয়নময় হইয়া কেবল দেখিতেই জানে, তাহারাই এই নবীনের নব বর্ষের মাধুরীটুকু ছানিয়া তুলিয়া লইতে পারিবে। যাহাদের এই

দেহ আদি ও অন্ত তাহারা এ রসে রসিক হইতে পারিবে না। তাহাদের পক্ষে নব বর্ষ, যতদিন আমি পুরাতন না হই ততদিনই মিষ্ট বোধ হয়; আমাদের পক্ষে নব বর্ষ যতদিন আমার তিনি পুরাতন না হইবেন ততদিন সুখের, সোহাগের এবং আনন্দের থাকিবেই।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মরীচিকা

কত মন্ত্র স্তুতিপূজা—যবনিকা নাহি নড়ে,
মানব গড়িছে স্বর্গ তবু মেঘ মেঘান্তরে!
অদৃষ্ট হাসিছে, তবু কি প্রেরণা কি পিয়াসা!
একি মিথ্যা আশা লয়ে কল্পনার পরিহাস!

কোথা পূর্ণ পরিতৃপ্তি চরম সে সার্থকতা?
জীবন যা চায় কভু জীবনে ত মিলে না তা'!
তাই কি কল্পনা নিত্য ভেদি' মৃত্যু-অন্ধকার
রচে দূর মায়াপুরী স্বপন-মাধুরী-ভার?

কোথা স্বর্গ, ভূমানন্দ, জীবনের পরপার!
জীবনে বাস্তব দুঃখ, মরণে কি শান্তি তার?
শুধু দূর কল্পিত সে ক্ষীণ আলেয়ার ভাতি
পথ নাই, আলো নাই, ভীষণ দুর্য্যোগ-রাতি!

হায় স্বর্গ! হে নির্ব্বাণ! তোমরা ত রবে দূরে
চিরদিন কোথা কোন্ কল্পনার মায়াপুরে!
এত অশ্রু এত ব্যথা বুকভাঙ্গা হাহাকার—
এ ধরার ধূলীপরে এস এস একবার!

শ্রীসুশীলকুমার দে।

কাণ্ডারী

তব আঁখি শুকতারা, জীবন প্রভাতে
ভবঘাটে সিন্ধুপথে করিনু প্রয়াণ ;
হে দুঃখ, কাণ্ডারী তুমি ; আর কেহ সাথে
আসিল না, শুনিল না তোমার আহ্বান !
সহসা আকাশে মেঘ—বিলুপ্ত তপন—
ক্ষুদ্র তরী ভাঙ্গে বুঝি একি জলোচ্ছ্বাস ;
হুহু করে বায়ু কত ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
চৌদিকে উথলে যেন বিশ্বের রোদন !
নাহি ক্ষেপণীর ক্ষেপে সোনা ঝলমল্
গান গেয়ে তরী বাওয়া—মন্দ সমীরণ !
সে দুর্দ্দিনে তুমি সাথী—হৃদয় বিকল
মহা-মানবের তীর্থে পৌঁছিনু যখন,
সহসা কোথায় তুমি চলে গেলে হেসে—
কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণময় চরণ-পরশে !

শ্রীসুশীলকুমার দে ।

কিশোরী

চতুর্দ্দশ বসন্তের কে গো তুমি মোহিনী কিশোরী ?
হাতে তব লীলা-পদ্ম, কেশজালে চম্পক কুসুম,
গোরি গোরি মুখে তব লালে লাল আবির-কুঙ্কুম !
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নিশি জাগি খেলিয়াছ হোরি ?
তোমার ও মুখ-চন্দ্র-সুধা পিয়ে নয়ন-চকোরী
আনন্দে নাচিছে আজি ! পড়িয়াছে উৎসবের ধুম
আমার এ কবি-চিত্তকুঞ্জভূমে ! অশোকের দ্রুম,
পরশ হরষে তব লীলায়িত শিহরি শিহরি !
হরিনাম-স্বর্ণবীণা অঙ্গে তব ! ললিত ঝঙ্কারে
তারে তারে কোকিলের কলরব ! শ্যামা দেয় শিস্‌
কে গো তুমি দেবালয়ে দেবনৃত্য, দেবের আশীষ ?
ধৌত হয়ে গেল হিয়া হরিনাম-সুধার জোয়ারে !
কে গো তুমি রূপময়ি ? অঙ্গে হাসে গোলাপ অতসী ;
চিনিয়াছি, চিরানন্দা তুমি মোর সনেট্‌-রূপসী !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

ডেরাডুন ।

বহু বিবাহ

[গল্প]

বরদাবাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে তাঁহার পুত্র হেমেন্দ্রকে কহিলেন, 'কাল সকালের গাড়ীতে তোমার পিসিমা তাঁর মেয়েকে নিয়ে আস্‌ছেন, ষ্টেশনে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এসো।'

বরদাবাবু বিশালদেহ, বিরাটশ্মশ্রু এবং অলৌকিক রকমের গম্ভীর। তিনি যখন বারান্দায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে তাম্রকূটসেবনে নিরত থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ মহাযোগী বলিয়া ভ্রম হইত। এক বন্ধু একবার তাঁহাকে এ কথা বলায়, তিনি গৈরিক আলখাল্লা তৈরী করাইবার কথা ক্ষণকালের জন্য মনে স্থান দিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্যের বশবর্ত্তী হওয়াতে, তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। তবে সেই দিনই আর্য্যমিশন সংস্করণের একখানি গীতা কিনিয়া ফেলিয়াছিলেন, একথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

পরদিন সকালে এক বন্ধুর বাড়ীতে হেমেন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল—এক এমেচার অভিনয়ে সুহৃদ্দর নলিনী চিত্রকর সীন আঁকিতে সুরু করিবে—তাহার উপস্থিতি বিশেষ দরকার। রমেন্দ্র এমন কুড়ে মানুষ যে সে না থাকিলে কিছুতেই কাজে হাত দিবে না ইহা সুনিশ্চিত।

তবু গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। পিসিমাকে সে ছেলেবেলায় একবার কি দুইবার দেখিয়াছিল—এখন সে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। আবার সে চোখে একটু কম দেখে। অথচ পিসিমার চেহারা কি রকম, এ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সে সাহস পাইল না। বাইশ বৎসর ধরিয়া নানা চেষ্টা করিয়াও

সে তাহার ভয় কাটাইতে পারে নাই। একথা ভাবিয়া সে প্রায়ই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িত।

পরদিন সকালে সে ষ্টেশনে গেল। ট্রেণ আসিলে মেয়েদের গাড়ীর কাছে দাঁড়াইতেই সে দেখিল, এক প্রৌঢ়া রমণী প্রসন্নভাবে তাহার দিকে চাহিতেছেন। সে তাঁহাকে বলিল, 'আপনারা আসুন—গাড়ী তৈরী আছে।' তাঁহার সহিত একটি মেয়ে ছিল—দেখিয়া বোধ হইল, সে জ্বরে ভুগিতেছে। হেমেন্দ্র বলিল—'এর যে অসুখ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।'

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নলিন কেমন আছে? সে আসে নাই?' হেমেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। নলিনী তাহার ছোট বোনের নাম। সে বলিল, 'সে ত ভালই আছে। আপনারা দেরী কর্‌বেন না। শীঘ্র আসুন।'

তাঁহাদিগকে ভাড়াটে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সে উপরে উঠিয়া বসিল। তাহাদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে, বরদাবাবু বাহিরে আসিলেন। গাড়ীর ভিতর হইতে রমণীটি নামিতেই বরদাবাবু বলিলেন, 'হেম, একি ক'রেছিস্? কাকে এনেছিস্?'

রমণী হেমেন্দ্রের দিকে সভয়ে চাহিলেন। হেমেন্দ্র বলিল, 'সে কি! পিসিমা!'

বরদাবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, 'ভুল ক'রেছিস্! ভুল ক'রেছিস্। কাকে এনেছিস্?' হেমেন্দ্র তাহার পিতাকে কখনও এত উত্তেজিত দেখে নাই। তাঁহার শ্মশ্রুমণ্ডল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। বালিকাটি কাঁদিয়া ফেলিল। রমণী গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন 'তুমি না হেমেন, নলিনের বন্ধু?'

হেমেন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িল। বরদাবাবুও দেখিলেন, তাঁহার অবস্থা গীতার বর্ণিত অর্জ্জুনের অবস্থার মত হইয়া পড়িতেছে। একবার মনে মনে বলিলেন, 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ।' তার পর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, 'জগা!'

হেমেন্দ্র রমণীকে বলিল, 'আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি আমার পিসিমা। তাঁহাকে আমি কোন দিন দেখি নাই। আপনি বোধ হয়, আমাকে কোন দিন দেখেছেন।'

রমণী বলিলেন, 'আমি নলিনের মা। আমায় আমাদের বাড়ী নিয়ে চল। আর তিনি কোথায় গেলেন?' মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'মা, এ কোথায় এসেছি? বাবা কোথায়?'

হেমেন্দ্র বলিল, 'ভয় নাই, আমি আপনাদের বাড়ী চিনি। আজ সেখানে আমার যাইবার কথা ছিল। পরেশবাবু নিশ্চয়ই পেছনে আস্‌ছেন।'

জগা আসিল। বরদাবাবু, হেমেন্দ্রকে বলিলেন, 'এঁরা কারা?' জগাকে বলিলেন, 'জগা, শীঘ্র যা. একটা গাড়ী নিয়ে আয়।' হেমেন্দ্রকে পুনশ্চ কহিলেন, 'তোমার দ্বারা যদি কোন কাজ হয়। বাঁদর, লক্ষ্মীছাড়া, হতচ্ছাড়া—'

হেমেন্দ্র আর কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল ও উপরে উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান বলিল, 'একি মোশাই! নিজের বাড়ী চেনেন না? আরও দু'টাকা বেশী লাগ্‌বে।'

হেমেন্দ্র, নলিনীর মা ও বোনকে লইয়া তাহাদের বাড়ী গিয়া উঠিল। নলিনী সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছিল; সে হেমেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, 'একি! তুমি এঁদের নিয়ে! একি মা! বাবা কোথায়? কি কাণ্ডকারখানা!'

হেমেন্দ্র, নলিনীর বোনকে দেখাইয়া বলিল, 'ইহার অসুখ। তুমি ডাক্তার ডাকিয়া আন। পরেশবাবু পশ্চাৎ আসিতেছেন। ভারি ভুল হইয়া গিয়াছে।'

নলিনীর মা বলিলেন, 'বাবা, হেমেন আমায় তার পিসি ভেবে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল।' নলিনীর বোন লাবণ্য কহিল, 'সেখানে একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো—'

হেমেন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, 'ভুল হ'য়ে গিয়েছে। আমি এখন যাই। তুমি একজন ডাক্তার—'

নলিনী বলিল, 'কিছু যে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। মা, তুমি ঘরে যাও। হেমেনের আজ এখানে নিমন্ত্রণ। এ ব্যাপারটার তদন্ত ও তদারক না ক'রে ছাড়্‌ছি না। এ যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মত ঠেক্‌ছে। কি কাণ্ডকারখানা!'

হেমেন্দ্রের কপাল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল। যাইবার সময় লাবণ্য তাহার দিকে একবার চাহিয়াছিল, তাহাতে তাহার কপোল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, 'ভুল হওয়া মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক।' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিনীর দিকে চাহিল। সে বলিল, 'ব্যাপারখানা কি, খুলে বল্‌তে পার? এ যে বিষম ধাঁধায় ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।'

হেমেন্দ্র তাহাকে বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল। গাড়িওয়ালাকে চার টাকা দিয়া বলিল, 'ফের আবার ষ্টেশনে চল।'

গাড়োয়ান বলিল, 'সব দিন কেবল ঘোরাচ্ছেন যে। চার টাকাতে কি হবে মোশাই? ঘোড়া যে ম'রে যাবে মোশাই। নিজের বাড়ী চেনেন না, এ যে তাজ্জব কথা মোশাই। আর চার টাকা না দিলে নিতে পার্‌ব না এখন।'

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া হেমেন্দ্র ও নলিনী দেখিল, পরেশবাবু কান্নাকাটি করিয়া এক কনেষ্টবলকে বুঝাইতেছেন, 'হামারা ইস্ত্রী ঔর লেড়কীকো একঠো আদমি চুরি কর্‌কে কোথায় পলায়া গিয়া হায়। তোম আভি তালাস করো ঔর থানা কাঁহাপর হায় হাম্‌কো কেমনে মাহি বোল্‌তা হায়? তোম কালা হায়? কানমে নাহি কুছুই শুন্‌তে পারতা হায়?' হঠাৎ নলিনীকে দেখিয়া তিনি হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! তাদের কে কোথায় নিয়ে গেছে! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!"

নলিনী বলিল, 'বাবা, আসুন। তাঁরা বাড়ী পৌঁছেচেন। ইনি আমার বন্ধু, ইনি তাঁদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন।'

পরেশবাবু হেমেন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, 'কে! এ কে! কে তুমি? কোথায় নিয়ে গিয়েছ তাদের তুমি?' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ তাঁহার মোটা যষ্টিখানি তুলিয়া হেমেন্দ্রের প্রতি সরোষে ধাবমান হইলেন। নলিনী বলিল. 'করেন কি, করেন কি! কি কাণ্ডকারখানা!'

হেমেন্দ্র দ্রুতপদে দৌড়িয়া ষ্টেশন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল—গাড়িওয়ালা হঠাৎ নামিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, 'মোশাই, ভাড়া না দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন মোশাই? আপনি যে সব খানেতেই ভুল ক'রে ফেল্‌ছেন মোশাই!' হেমেন্দ্র তাহার টাকার ব্যাগটি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, সবেগে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বরদাবাবু গাড়ী করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গীতায় বর্ণিত অর্জ্জুনের অবস্থার সহিত তাঁহার মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সাদৃশ্য এখন আরও পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। গাণ্ডীবের পরিবর্ত্তে তাঁহার লাঠিটি বার বার হাত হইতে ত্রস্ত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গম্ভীরকণ্ঠে 'হায় হায়!' বলিয়া উঠিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, একটি গাড়ী বিপরীত দিকে চলিয়াছে, মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ও একটি মেয়ে আসীনা। তিনি এমন সজোরে হাঁকিয়া উঠিলেন, 'বাঁধো বাঁধো' যে শুধু এ দুটি গাড়ী নয়, একটি ট্রাম ও তিনটা গোরুর গাড়ীও থামিয়া দাঁড়াইল। বরদাবাবু তখন দেখিলেন, অন্য গাড়ীতে সত্যই তাঁহার বগলাসুন্দরী, তাঁহার কন্যা সুকুমারী ও একটি চাকরাণী বসিয়া। উপরে গাড়োয়ানের সহিত একজন হিন্দুস্থানী চাকর। ফিরিবার পথে বরদাবাবু বগলাসুন্দরীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পুত্র হেমেন্দ্র একটি কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত অপদার্থ, আকাট হস্তীমূর্খ, গর্দ্দভ, শাখামৃগ এবং অকালকুষ্মাণ্ড।

বগলাসুন্দরীর স্বামী পশ্চিমে দেরাদুনে হেডমাষ্টার ছিলেন।

তিনি হঠাৎ মারা যাওয়ায়, বগলাসুন্দরী তাঁহার একমাত্র সন্তান সুকুমারীকে লইয়া ভাইযের কাছে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে একেবারে নিঃস্ব রাখিয়া যান নাই। তিনি বরদাবাবুর মতই সবল সুস্থ ও বলিষ্ঠ, তবে তাঁহার গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখন বরদাবাবুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখনও হেমেন্দ্র ফিরে নাই। তিনি তাহার প্রতি প্রয়োগ করিবার মত আরও কয়েকটি বিশেষণেব কথা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু ভগিনীর শোকের বেগ দেখিয়া সে বাসনা দমন করিলেন।

সুকুমারীর বয়স তের বৎসর। কিন্তু তাহাব মুখে আট বৎসরের বালিকার সারল্যেব ভাব। সে ঝাপসাভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল, এ লোকটি তাহার মায়ের ভাই, এবং ভাবিতেছিল, ইনি মাথায় পাগড়ী পরিলে ভাল হইত। যদি বেশী দিন ইঁহার কাছে থাকিতে হয়, তবে একথা ইঁহাকে বলিয়া দেখিবে, ইহাও ভাবিয়া রাখিল।

ইত্যবসরে হেমেন্দ্র প্রবেশ করিল। বরদাবাবু বলিলেন, 'দেখ, তোমার ধনুর্দ্ধর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দর্শন কর।' লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে হেমেন্দ্র বগলাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া মুখ ঢাকিল। তাহার মনে হইল ইতিমধ্যে বাবা যদি চলিয়া যান ত ভাল হয়। কিন্তু বরদাবাবু অটল হইয়া কেবলই তাহার প্রতি গুরুগম্ভীর অপবাদ-বাণ হানিতে লাগিলেন।

বগলাসুন্দরী বলিলেন, 'থাক্, অনেক হ'য়েছে, বাছা আমায় ত চেনে না' বলিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। সুকুমারী সংস্কারবশতঃ বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি তাহার দাদা হয়, এবং খুব লজ্জাজনক একটা কার্য্য করিয়াছে। সে ভাবিল, মামা যদি ইহাকে না মারেন, তবে ইহাদের বাড়ী থাকিব।

বরদাবাবুর গৃহিণী গিরিবালা আসিয়া সুকুমারী ও বগলাসুন্দরীকে অন্দরে লইয়া গেলেন। হেমেন্দ্র দরজার কাছে গিয়া মাকে জানাইল যে দুই চারটা টাকার তাহার বিশেষ প্রয়োজন—তাহাকে এখনি বাহির

হইতে হইবে। কথাগুলি বরদাবাবুর কাণে গেল। তিনি বলিলেন, 'আবার কোথায় বেরুবি এখুনি! সারা দুনিয়া ঘুরে এসেও তোমার বেড়াবার সখ মিট্‌ল না!'

হেমেন্দ্র মৃদুস্বরে কহিল, 'আমার নিমন্ত্রণ আছে।' ইহার পরে বরদা কি বলিলেন, তাহার সবটা না শুনিয়াই টাকার অপেক্ষা না করিয়া, অন্দর দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নলিনী ও পরেশবাবু বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পরেশবাবুর ক্ষোভ, নিরাশা, উদ্বেগ ও ক্রোধ এখন একেবারে প্রশমিত হইয়াছে। নলিনী লাবণ্যকে নানা প্রশ্ন করিতেছে। পরেশবাবু উহাদের লইয়া পশ্চিমে তাঁহার জামাতা নরেশের নিকট বেড়াইতে গিয়াছিলেন; ছয় বৎসর পূর্ব্বে, যখন ইহা স্পষ্ট বোঝা গেল যে নলিনীর লেখাপড়া চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে, উহার বুদ্ধির চেষ্টা দুশ্চেষ্টামাত্র, তখন তাহাকে দুই বৎসর নরেশের কাছে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেখা গেল, লাবণ্যের জ্বর মোটেই হয় নাই, পথের কষ্টে সে শুধু কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

নলিনী বলিল, 'লাবি, তোদের কে এখানে নিয়ে এসেছিল জানিস?'

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে জানে না; যদিও ইতিপূর্ব্বে সে নলিনীর ঘরে হেমেন্দ্রকে দেখিয়াছে। নলিনী বলিল, 'সে যে সম্পর্কে তোর বর হয়—আমার বন্ধু।' লাবণ্য বিরক্তির সহিত তাহার হাতে খাম্‌চাইয়া দিল। নলিনী বলিল, 'তার নাম হেমেন—আমার উঠ্‌তে দেরী হবে ব'লে তাকে পাঠিয়েছিলুম।' লাবণ্য তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, 'মার খাবে কিন্তু বল্‌ছি।' নলিনী বলিল, 'দাঁড়া, হেমেনকে বলে দিচ্ছি—সে এল ব'লে।' লাবণ্য বলিল, 'বল গে না—সে আমার কি ক'র্‌তে পারে।'

এমন সময়ে হেমেন্দ্রের আবির্ভাব। নলিনী বলিল, "এই যে—'টক্ অভ্ দি ডেভিল্—' ওরে লাবি, পালাস্ নে। সব ব'লে দিচ্ছি

এক্ষুণি হেমেনকে।” কিন্তু লাবণ্যকে আর দেখা গেল না। হেমেন্দ্রকে বলিল, ‘বল বৎস, বল মোরে কি বারতা তব। ক্ষণতরে সত্যকাম রহিল নীরব॥’ নলিনী কবিতা লিখিত, এবং নিজের কবিতা হইতে যখন তখন অনাবশ্যকভাবে পদ উদ্ধার করা তাহার অভ্যাস ছিল। সে এত কবিতা লিখিয়াছিল এবং এত ছবি আঁকিয়াছিল যে, তাহাতে অনায়াসে একটি সচিত্র মহাভারত বা সচিত্র বাঙ্গালা মাসিকপত্র (এ দুয়ের মধ্যে যেটা বেশী ভারি) তৈয়ারী হইতে পারিত।

হেমেন্দ্র বলিল, ‘বাবা ভারি রাগিয়াছেন। তোমার বাবাও রাগিয়াছেন। কোথায় যাই বলিয়া দিতে পার?’

নলিনী বলিল, ‘ভয় নাই, ভয় নাই। ভাই ভাই এক ঠাঁই।’

হেমেন্দ্র বলিল, ‘তোমার বাবা কোথায় থাকেন?’

নলিনী বলিল, ‘তিনি উপরেই থাকেন। নীচে প্রায় নামেন না। আমার এ ঘরে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। তাঁর লাঠিগাছটি নীচে রেখে গেছেন। বল ত লুকাইয়া রাখিতে পারি। সাবধানের মার নাই।’

হেমেন্দ্র কৃতজ্ঞভাবে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বলিল, ‘দেখ, স্নান ক’রে আস্‌তে পারিনি।’ হাতে একটি পয়সাও নাই—হেঁটে আস্‌তে হ’য়েছে। শীঘ্র স্নানের বন্দোবস্ত কর।’

নলিনী ডাকিল, ‘ওরে কিষণ্‌!—কি কাণ্ডকারখানা!’

ছয় মাস অতীত হইয়াছে। সুকুমারী ও নলিনী, গিরিবালা ও বগলাসুন্দরীর মধ্যে বন্ধুত্ব জমিয়া গিয়াছে। নলিনীর বয়স বার, সে ইস্কুলে যায়, লাবণ্যের সহিত এক ক্লাসে পড়ে। দুপুর বেলা একা একা সুকুমারীর ভারী খারাপ লাগে, তাহারও ইচ্ছা করে সে নলিনীর সহিত ইস্কুলে যায়; কিন্তু বগলাসুন্দরীর ইচ্ছা তাহার বিবাহ দিয়া ফেলেন, সে যে দেখিতে পনের বৎসরের মেয়ের মত হইয়াছে। সুকুমারী মামাকে গিয়া বলে, ‘মামা, আমি যে দেরাদূনে ইস্কুলে যেতাম। এখানে কেন আমায় পাঠাও না?’

বগলাসুন্দরী বলেন, 'তুমি ত সব শিখে ফেলেছ, এখানকার শিক্ষয়িত্রী তোমাকে কিছুই শেখাতে পারবে না। সুকুমারী এ কথা মানিত না। নলিনী স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়ে, খেজুরের রসের বৃত্তান্ত পড়ে, তিমিমৎস্যের কাহিনী পড়ে—সে যে এ সব কিছুই জানে না। নলিনী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাই, বল্ ত দম বন্ধ করলে আমরা কেন ম'রে যাই?' সুকুমারী বলিল, 'দম বন্ধ করলে ছট্‌ফট্ করতে হয়, ছট্‌ফটানির চোটে আমরা ম'রে যাই। নলিনী যখন 'দূ—র' বলিয়া তাহার গুরু-মা'র কথিত তথ্যটি বিবৃত করিতে থাকে, তখন সুকুমারীর দুটি চোখ ভরিয়া আসে। একদিন সে দুপুরবেলা বসিয়া বসিয়া মাসিকপত্রের একটি গল্প শেষ করিয়া ফেলিল। নলিনী স্কুল হইতে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা বল্‌দিকি ভাই, রমেশের সঙ্গে কার বিয়ে হ'য়েছিল?' নলিনী বলিল, 'হয়েছিল কি ব'ল্‌ছিস্! হবে—তোর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কাল মা পিসিমাকে ব'ল্‌ছিলেন, আমি শুনেছিলুম।' সুকুমারী এমন কথা মোটেই পড়ে নাই। সে বলিল, 'দূর, ভুল ক'রেছিস্। বইয়ে লেখা র'য়েছে, প্রিয়বালার সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়েছিল, আর তুই কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই।'

সত্যের অনুরোধে আমাদের বলিতে হয়, এ বিষয়ে নলিনীর সংবাদটিই অধিক বিশ্বাসজনক। কিছুদিন হইল, সুকুমারীর এক পাত্র পাওয়া গিয়াছে। রমেশ বিদ্বান্, সদ্বংশজাত এবং সুদর্শন। সে হেমেন্দ্রের সহপাঠী, এবং স্কুলে নলিনীর সহাধ্যায়ী ছিল। শীঘ্র তাহার স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসার কথা।

যথাদিনে রমেশ মেয়ে দেখিতে আসিল। সঙ্গে নলিনী—সে যে নলিনীকে কেন সঙ্গে অনিল, তাহা বলা কঠিন। তাহার অন্য অনেক বন্ধু ছিল—নলিনীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব বিশেষ ঘনিষ্ঠ রকমেরও নহে। বোধ হয়, নলিনীর আর্টিষ্টিক্ রুচি তাহার মনোনয়নকার্য্যে সহায়তা

করিবে, এই রকম ভাবিয়াছিল। রমেশ যাহা করিত, সবেরই একটা স্পষ্ট কারণ থাকিত। তাহার মোজায় তীর আঁকা—পঞ্চশর-সায়কের পরিচায়ক। ঈষৎ গোঁফের রেখা ধনুর আকারে বিন্যস্ত—পুষ্পধন্বার চিহ্নস্বরূপ। শালের এক অংশ হাওয়ায় ধ্বজার মত উড়িতেছিল—বোধ হয় মকরধ্বজকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। রমেশ একজন বিশেষরূপে সাহিত্য দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি।

বরদাবাবু তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। নলিনী নিজের পরিচয় দিল, 'আমি একজন সামান্য চিত্রকর মাত্র। 'স্বয়ম্ভু' ও 'জম্বুদ্বীপ' কাগজে হয় ত আমার আঁকা দুই একখানি চিত্র দেখিয়া থাকিবেন।'

বরদাবাবুর বাড়ীতে এ দুইখানি কাগজই আসিত। তিনি বলিলেন, 'ওঃ, আপনিই হচ্ছেন নলিনীকান্ত গাঙ্গুলী। কি আশ্চর্য্য! ভারি খুসী হলুম (করমর্দ্দন)। আপনার ছবিগুলি আমার খুব ভাল লাগে। লোকে আধুনিক আধুনিক করে—কিন্তু আমার মত বুড়ো মানুষও আপনার আর্ট্ এপ্রেসিয়েট্ করতে পারি।'

রমেশ দেখিল আলাপটা ইহাদের দুইজনের মধ্যেই জমিয়া উঠা ঠিক নহে। বিশেষতঃ ইনি যখন তাহার শ্বশুর হইবেন। তাই গলা সাফ করিয়া কহিল, 'লোকে আধুনিক যত না বলে, ছবিগুলির সরু আঙ্গুল ও রোগা চেহারা নিয়ে তার চেয়ে বেশী বলে। নলিনী হয় ত তার সব ছবি নিজের চেহারার মত আঁকিতে যায়।' বলিয়া কিঞ্চিৎ হাসিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বরদাবাবু হাসিলেন না। সে হেমেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, ইনি স্বভাবতঃ গম্ভীর; এত গম্ভীর তাহা ভাবে নাই।

নলিনী বলিল, 'সরু আঙ্গুল ও রোগা চেহারা সম্বন্ধে একটা কথা আমি বরাবর ব'লে আস্‌ছি—লোকে যদি আমার ছবির মত না হ'য়ে অন্য রকম হয়, তাহ'লে সে তাদেরই দুর্ভাগ্য। আগে যেমন এদেশের আর্টিষ্টরা দেবতা গড়্‌তেন বা আঁক্‌তেন—ব'ল্‌তেন লোকে যদি

দেবতা না হ'য়ে মানুষ হ'য়ে জন্মায় সে তাদেরই দুর্ভাগ্য। আমিও যে মানুষ বেশী আঁকি তা নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'বাঃ বেশ ব'লেছেন! লোকে যদি ছবির মত না হয় ত সে তাদের দুর্ভাগ্য। সুন্দর ব'লেছেন!' বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার অট্টহাস্যে তাঁহার বাড়ীটি নিনাদিত কম্পিত হইয়া উঠিল।

তাঁহার কন্যা নলিনী পাণ লইয়া আসিল। রমেশ বরদাবাবুর হাস্য দেখিয়া বিরক্ত হইবার যোগাড় করিতেছিল, কিন্তু নলিনীকে দেখিয়া থমকিয়া গেল। ভাবিল, এই কি— ? না, তাহা ত হইতে পারে না! নলিনী একটা পাণ লইয়া টেবিলস্থ সিগারেটের বাক্সের প্রতি চাহিতেই বরদাবাবু বলিলেন, 'লজ্জা কর্‌বেন না!'

নলিনী যখন চলিয়া গেল, রমেশ দেখিল বরদাবাবু তাহাকে সিগারেট লইতে অনুরোধ করিতেছেন। যদিও সে সিগারেট খায় না, তথাপি অপ্রতিভভাবে একটি উঠাইয়া লইল।

ইতিমধ্যে হেমেন্দ্র প্রবেশ করিয়াছিল। বরদাবাবু উঠিলেন; "দেখি একবার এদিকে দেখে আসি। হেম, এখানে এঁদের কাছে থেকো" বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

নলিনী প্রস্তাব করিল, হেমেনকে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হউক্। সে থাকিলে তাহাদের মতামত প্রেজুডিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সেই মুহূর্ত্তে রমেশ সিগারেটে টান দিয়া, কাশিতে কাশিতে ঘর্ম্মোচ্ছ্বাসে এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনও রূপ মতপ্রকাশে সমর্থ হইল না। হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে রমেশ! এমন নীতি-ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়্‌লে চল্‌বে কেন? ধূম্রপান-নিবারিণী সভাকে একটু আধটু মনে রেখ হে!'

নলিনী বলিল, 'না রমেশ, বেশ করেছ। এখন কি আর ওসব নীরস ব্যাপার মনে রাখ্‌বার বয়েস? এজন্যই কি বিধাতা তোমায় মগজটি দিয়েছিলেন? হেমেন ত ওরকম ব'ল্‌বেই, ওদের সিগারেট

যে! সে যা হোক্, বাজে কথা যাক্, এখন ত অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়েছ?'

রমেশ জানাইল, সে সুস্থ হইয়াছে।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'বল পাচ্ছ? তবে এখন বলি, হেমেনকে এই জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে কেমন হয়? ও আমাদের মত প্রেজুডিস ক'র্তে এসেছে।'

রমেশ বলিল, 'সে কি? সত্যিই ওকে তাড়াবে না কি?

নলিনী বলিল, 'নির্দ্দোষ আমোদ, বিমল আনন্দ।' ইহা বলিয়া হেমেন্দ্রকে অর্দ্ধচন্দ্রসহযোগে দরজা পর্য্যন্ত লইয়া চলিল।

এমন সময় একটা শব্দে ফিরিয়া দেখিল, মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

নলিনী দেখিল, এ কি! এ যে সুকুমারী—ছয় বৎসর আগে দেরাদূনে তার পরম বন্ধু ছিল। তাহার ভগিনীপতি নরেশ তখন দেরাদূনে চাকরি করিতেন। তখন সুকুমারী এতটুকু ছিল—আজ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে! তবু এ ত ভুল নয়, এ যে সেই সুকুমারী। হেমেন্দ্রের পিসামহাশয় নিশ্চয় উমেশ হেড্‌মাস্টার ছিলেন—এ বিষয়ে হেমেন্দ্রকে সে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই। সেই সুকুমারীর সহিত রমেশের বিবাহ হইবে!

নলিনী, সুকুমারীর খাতাপত্র বই সব লইয়া আসিল। রমেশ বন্ধু নলিনীকে বলিল, 'ওহে, তুমি যাহোক কিছু জিজ্ঞাসা করো।' কিন্তু নলিনী চুপ করিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'তুমি কর না, তোমারই ত কাজ।' অগত্যা রমেশ গলা সাফ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নাম কি?'

সুকুমারী বলিল,—শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

তবে ত আর সন্দেহ রহিল না! নলিনীর ইচ্ছা হইল, সে উঠিয়া বাহিরে যায়। ঘন ঘন ধূম্রপান দ্বারা সে প্রবৃত্তি সংযত করিতে সমর্থ হইল।

রমেশ একটা বই খুলিয়া বলিল, 'এটা পড়ুন দেখি।' সুকুমারী পড়িল,—'১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না পাইলে পর-মাসে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞাপনদাতা প্রতি দুই মাস অন্তর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।'

রমেশ বলিল, 'না না, ওটা নয়।' সে টেবিলের উপর যে বই পাইয়াছিল, তাহাই তুলিয়া সুকুমারীকে পড়িতে দিয়াছিল। এবার একটি পাঠ্যপুস্তক পড়িতে দিল। সুকুমারী পড়িল,—

"দক্ষিণ আমেরিকায় লামা নামে এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু আছে। লামা সেই দেশবাসীদিগের অশেষ উপকারে আসিয়া থাকে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সে ভারবাহী জন্তুরূপে ব্যবহৃত হয়। মাদী লামার দুগ্ধ আবাল-বৃদ্ধ বনিতা পান করিয়া জীবন পোষণ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর তাহার লোমে উৎকৃষ্ট পশম প্রস্তুত হয়। তাহার চর্ম্মে পাদুকা, চর্ম্মপেটিকা, অশ্বের বল্গা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অর্থ কি?'

সুকুমারী ভাবিয়া দেখিল, বাল শব্দের মানে চুল। বলিল 'যে বুড়ো লোকের অনেক চুল ও দাড়ি আছে, আর সে বনে জঙ্গলে থাকে।'

রমেশ। অশ্বের বল্গার মানে কি?

সুকুমারী। যে ঘোড়ার গায়ে খুব জোর আছে।

অতঃপর ইতিহাসের পরীক্ষা হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বিক্রম সাল সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?'

সুকুমারী উত্তর করিল, 'হাঁ'।

প্রশ্ন। কি জানেন তাহা বলুন।

উত্তর। কাশ্মীরে তৈরী হয়। কখন কখন লামার লোমেও তৈরী হয়।

প্রশ্ন। আজকাল যুদ্ধ হইতেছে জানেন ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। কাদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে ?

উত্তর। ইংরাজ আর সিরাজুদ্দৌলার মধ্যে।

বরদাবাবুর মেয়ে নলিনী সুকুমারীর পশ্চাতে বসিয়া তাহাকে অনর্গল চিম্‌টি কাটিয়া যাইতেছিল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি বলিতে পারেন ?'

নলিনী বলিল, 'ইংরাজ আর জর্ম্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ হইতেছে। ইংরাজের দিকে ফরাসী, রাশিয়া, তুর্কী আর ইতালীয়েরা আছে।'

এইরূপ নানা প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। হেমেন্দ্র বলিল, 'এসব কোয়েশ্চন ও পার্‌বে কেন ? আমরাই কতটা পারি তার ঠিক নাই। ওহে নলিন, তুমি কথা বল না যে !' নলিন বলিল, 'কি গণ্ডগোল ক'র্‌ছ !'

ইতিমধ্যে বরদাবাবু আসিয়া বলিলেন, 'আপনাদের হইয়া থাকিলে একবার ভিতরে আসিবেন।'

রমেশের মেয়ে পছন্দ হইল কি না কিছুই জানিতে পারা গেল না। বরদাবাবু রমেশের বাপকে পত্র লিখিলেন। বগলাসুন্দরী ধরিয়া বসিলেন, সুকুমারীর ত সম্বন্ধ ঠিক হইল, হেমেনের বন্ধু নলিনীকে দিয়া মেয়ের এক ছবি আঁকিয়া লইতে হইবে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে তিনি কি লইয়া থাকিবেন ?

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাইল, দরকার হইলে এক মাসের মধ্যেই ছবি তৈয়ারী করিয়া দিতে পারিবে। পারিশ্রমিকের কথা উঠিলে সে বলিল সে কিছুই চায় না, তবে যদি একান্ত পীড়াপীড়ি করেন ত তাঁহারা যাহা দিবেন তাহাই লইবে।

পরদিন হইতে সে সুকুমারীর ছবি আঁকিতে সুরু করিল। প্রথম দুই দিন বরদাবাবু উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেবলই নলিনীর আঁচড়কাটা দেখিয়া দেখিয়া, তিনি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে

লাগিলেন। পরদিন হইতে তিনি পূর্ব্বমত রীতিমত শয্যায় ঘুমের ব্যবস্থা করিলেন।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সুকু, আমায় চিন্‌তে পার না বুঝি।'

সুকুমারী বলিল, 'চিন্‌ব না কেন? তুমি সেদিন একটিও কথা কইলে না ব'লে, যুদ্ধের কথা কিছুই ব'ল্‌তে পারি নি। নলিনী, তুমি নও, মামার মেয়ে, সে আমায় যুদ্ধের কথা অনেক বলেছিল। আমি ভেবেছিলুম ও-সব গল্প। আচ্ছা, তুমি চুরুট খাও কেন নলিন দা?'

নলিনী বলিল, 'চুপ! এবার মুখটা আঁক্‌ছি; নড়্‌লে ছবি খারাপ হ'য়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পরে সুকুমারী বলিল, 'নলিন দা, তুমি এতদিন কোথায় গেছিলে?'

নলিনী বলিল, 'সব মাটি ক'রে দিলে! চুপ—মাথাটা একটুও নাড়িও না।' পাঁচ মিনিট পরে সুকুমারী বলিল, 'কতক্ষণ এম্‌নি ক'রে ব'সে থাক্‌ব! আমার ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। আমায় বিস্কুট এনে দাও।'

নলিনী বলিল, 'ফের কথা শোনে না! বিস্কুট কাল পাবে। এখন স্থির হ'য়ে ব'সে থাক।' পরদিন সে বিস্কুট লইয়া আসিল। ক্রমে সন্দেশ, গজা, মতিচুর প্রভৃতি লইয়া আসিতে লাগিল। শেষে রস-গোল্লা, পান্তুয়া, চম্‌চম্ প্রভৃতিও আসিতে লাগিল। এখন সুকুমারী মোটেই নড়ে না, কথাটিও কয় না। কেবল উপযুক্ত সময়ে বলে, 'কই আমার খাবার এনেছ?'

এ কথাটিও চাপা থাকিল না। বরদাবাবু আসিয়া বলিলেন, 'এ কি মশায়! মেয়েকে খাবার টাবার এসব কি এনে দিচ্ছেন? এ সব বন্ধ করুন। আপনার যা কাজ তাই ক'র্‌বেন।'

নলিনী বলিল, 'কাজ করি কি ক'রে বলুন ত! আপনাদের এ মেয়ে এক দণ্ড স্থির হ'য়ে ব'স্‌তে পারে না—এর ছবি আঁকি কি ক'রে

বলুন ত। অনেক লোকের ছবি এঁকেছি, কিন্তু কখন এত বেগ পেতে হয় নি। আপনাদের কেউ না হয় ব'সে থাকবেন, দেখবেন এ যেন না নড়ে চড়ে।'

সুকুমারী বলিল, 'মামা, কাল থেকে আমি আর চাইব না।'—বরদাবাবু আর এ প্রসঙ্গ তুলিলেন না।

এক মাসে ছবি শেষ হইল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিল। বগলাসুন্দরী বলিলেন, 'আহা! ঠিক যেন মা আমার দাঁড়িয়ে আছে!' গিরিবালা বলিলেন, 'সত্যই ত, ঠিক সুকুর মত হ'য়েছে।' পাড়ার বিন্দি পিসি বলিলেন, 'ওগো ছেলেটিকে বোলো, আমার ক্ষেমীর ছবি তুলে দেবে? আমি পাঁচ টাকা দোব, বোলো'খন তাকে।' হেমেন্দ্র দেখিয়া বলিল, 'মুখটা ঠিক হয় নাই, আর সব ভালই হইয়াছে।' সুকুমারী বলিল, 'পাড়টা সোণালি রঙে ক'রেছে কেন? আমার পাড়টাতে যে বন্দেমাতরং লেখা ছিল।'

সন্ধ্যাবেলা বরদাবাবু একাকী বসিয়া ধূম্রপান করিতে করিতে গীতার সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। নলিনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাবাবু বলিলেন, 'বসো বাবা, আমি আস্‌ছি।' কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তাহাকে দুই শত টাকার নোট দিয়া বলিলেন, 'এটা তোমার পারিশ্রমিক। কম হ'য়ে থাক্‌লে আমায় বলো।'

নলিনী নোটগুলি তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, 'আমাকে কিছু দিবেন না—শুধু আমার এক প্রার্থনা আছে।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'কি বলিতে চাও বল?'

নলিনী বলিল, 'আমি সুকুমারীকে বিবাহ করিতে চাহি।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'সে কি! তাহার বিবাহ ত এক রকম ঠিক। তারিখটা স্থির হ'লেই হয়। আর তুমি কিসের জোরে তাকে বিবাহ ক'র্‌তে চাইছ তাই আগে শুনি! না হয় ভাল ছবিই আঁক্‌তে পার কিন্তু কিছু পাশটাশ ক'রেছ? কোনও চাকরির আশা আছে? আশ্চর্য্য! তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয় দেখ্‌ছি।'

নলিনী বলিল, 'হাঁ, আমার স্পর্দ্ধা খুব বেশী, আমায় ক্ষমা করুন।' বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নলিনী কবিতা লিখিতেছিল,—

আষাঢ় গগন ঘিরে হৃদয়ের তীরে তীরে
বরষা নেমেছে আজ নিবিড় সুন্দর।
গাঢ় স্নিগ্ধ মেঘথর অশ্রুসিক্ত মনোহর
বাষ্পাকুল সারা হিয়া, কানন প্রান্তর।
ঢেকেছে হৃদয়সীমা ঘন শান্ত শ্যামলিমা
স্মিরিতি-জড়িত দূর দিগন্তের রেখা।
এ নির্জ্জনে, এ আঁধারে, অশ্রুরুদ্ধ হাহাকারে,
আমি বড় একা আজ আমি বড় একা।

হেমেন্দ্র আসিয়া তাহার কবিতা-উৎসে বাধা দিল। নলিনী বলিল, 'হেমেন, বেরিয়ে যাও।' হেমেন্দ্র কহিল 'সে কি!'

নলিনী বলিল,'কবিতা লিখ্‌ছি, নাম হ'চ্ছে "একা"। তুমি থাকলে মিথ্যা হ'য়ে যাবে।'

হেমেন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিল,'কবিতা আর কবে সত্যি হয়ে থাকে!'

নলিনী বলিল, 'দেখ হেম, তুমি ত দিন দিন আমার ভগিনীপতি হ'তে চ'লেছ।'—

হেমেন্দ্র বলিল, 'সে কি—তোমার ভগিনীপতি!'

নলিনী অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে নিজের কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া জানাইল, 'এ যে সত্য নহে মায়া, বিরাট দুঃখের ছায়া, এ নহে গো প্রেমিকের প্রলাপ-বচন।'

হেমেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল, 'নলিন!'

নলিনী চক্ষু খুলিল। কহিল, 'কি আদেশ তব রাণি!' হেমেন্দ্র বলিল, 'একটু খোলসা ক'রে বল।'

নলিনী কহিল 'সব ঠিকঠাক। আগামী অমুক তারিখে অমুক দিবসে আমার কনিষ্ঠ সহোদরা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সহিত

১৬ নম্বর মদন বোসের লেনের অধিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইবেক। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে এবাটীতে আগমনপূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পাদন করাইবেন।'

হেমেন্দ্রের কপোল ঈষৎ রক্তিমভাব ধারণ করিল। বলিল, 'কি বাঁদরামি কর্‌ছ!'

নলিনী। 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ জানাইলাম।'

হেমেন্দ্র। ফের! বন্ধ কর ব'লছি।

নলিনী। 'ত্রুটী মার্জ্জনা—'। হেমেন্দ্র সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। নলিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—'আহা কর কি! ছাড় সব ব'ল্‌ছি এখন।' হেমেন্দ্র তাহার গলা ছাড়িয়া দিল।

নলিনী বলিল, 'ভায়া, বন্ধুর কথা একটু বিশ্বাস কোরো। শুধু খবরটা তোমায় দিতে বাকী। আমার ভাই, বরাবর এই রকম ইচ্ছাটা। মা'র অনুমোদন আছে। লাবিকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনীয় মনে করি নাই। এখন শুধু কর্ত্তাকে বাগান' দরকার, কিন্তু তার আগে তোমার যদি অমত থাকে—।

হেমেন্দ্র পুলক-গদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিল, 'ভাই তোমার ঋণ এজন্মে'—

নলিনী বলিল 'ও সব বাদ দাও। তবে এদিকটা ঠিক?' হেমেন্দ্র বলিল, 'ভাই আমি কি তার যোগ্য!' নলিনী কহিল, 'কার যোগ্য হে! লবির? পাগল হ'লে দেখ্‌ছি। কিন্তু ভায়া, আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।'

উভয়ের কিছুক্ষণ ধরিয়া কি এক ঘোর ষড়যন্ত্র চলিল। লেখকেরও তাহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

'হর হর বোম্! জয় ভোলানাথজীকা জয়! জয় শম্ভো মহাদেও!'

হেমেন্দ্র হাঁকিল, 'নরসিং, দেখো তো কোন হ্যায়?' নরসিং বলিল, 'বাবু, এক সাধু হ্যায়, অন্দর আনেকো মাঙ্‌তা।' সাধু ভিতরে আসিল।

হেমেন্দ্র বিরক্তির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল 'কৌঁও দরওয়াজেকো সাম্‌নে খড়া রহ্‌কর্‌ চিল্লাতে হো ?'

সন্ন্যাসী জটাজুট-বিমণ্ডিত, হাতে ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চিমটা, সবই আছে। কপালে প্রকাণ্ড এক তিলক, সর্ব্বগাত্র ভস্মাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বলিল, 'বাবুজী, তুম্মা কিনো রাগ করছে ? হামি আপনা ঘুম ভাঙ্গায়েছি, বলিয়ে রাগ করছে ? লেকেন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্‌ নিবোধত। হামি ত আপনা উপকার করেছি বাবুজী।'

সন্ন্যাসীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া হেমেন্দ্রের ভগিনী নলিনী আসিয়া দেখিল তাহার দাদা এক সাধুর সহিত কথা কহিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা, একে জিজ্ঞেস কর না, হাত গুণ্‌তে জানে কি না। সে দিন একটা সন্ন্যেসী মালতীদের বাড়ী এসে সকলের হাত দেখে দিয়েছিল।'

সন্ন্যাসী নিজেই বলিল, 'তুম্মার হাত দেখ্‌ব মা ? হামার কাছে আস্‌বে।'

নলিনী ভয় পাইল। হেমেন্দ্র বলিল, 'আমার হাত দেখে বল দেখি কি বল্‌তে পার।'

সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া বলিল, 'তুম্মার মা বাপ জীতা আছে। তুম্মার সাদি নাহি হ'ল। পাঁচ বরষ আগে তুম্মার তবিয়ৎ ভারি বিঘড়ে গেল, খুব বিমার হ'ল।' এইরূপ অনেক অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল। হেমেন্দ্রের মুখে এক বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে বলিল, 'আচ্ছা আমার নাম বল্‌তে পার, সাধুজী ?'

সাধু কিছুক্ষণ তাহার হাত নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'হোম-ইন্দর—হমেন্দ্র—হেমেন্দ্র।'

হেমেন্দ্র কহিল—'আশ্চর্য্য !'

ইতিমধ্যে নলিনী বাড়ীর ভিতর গিয়া খবর দিয়াছে যে এক গণৎকার আসিয়াছে। সে দাদার জীবন-কথা সব যথাযথ ভাবে

বলিয়া দিতেছে। গিরিবালা দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'হেম, ওঁকে ভিতরে আস্‌তে বল।'

সন্ন্যাসী ভিতরে গেল। সে কাহারও হাত স্পর্শ করিল না। একবার মাত্র দেখিয়াই তাহার গণনাফল বলিয়া যাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য! একটা কথাও মিথ্যা নহে! সকলে চমৎকৃত হইলেন। নলিনীর একটা পোষা বিড়াল পরশু দিন মারা গিয়াছিল সে কথাও যখন সন্ন্যাসী অবলীলাক্রমে বলিতে পারিল, তখন আর তাঁহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ইয়ত্তা রহিল না। কেবল একটা কথা বুঝিতে পারা গেল না। সন্ন্যাসী বলিল, সুকুমারীর সহিত যাহার বিবাহ হইবে তাহার নাম নলিনী। নলিনী ত সেই চিত্রকর ছোকরার নাম। তবে কি রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে না? বগলাসুন্দরী বলিলেন, অবিশ্বাস করিবার ত কোনো কারণ নাই ইনি সিদ্ধপুরুষ। নলিনীর ইচ্ছা হইল কেহ জিজ্ঞাসা করে তাহার সহিত কাহার বিবাহ হইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেহই এ প্রশ্ন করিল না।

প্রচুর সিধা এবং সিকি ও পয়সা লইয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইল।

সেই দিন বগলাসুন্দরী বরদাবাবুকে ধরিয়া বসিলেন—সুকুমারীর কপালে যখন নলিনীর সঙ্গে বিবাহ আছে তখন তাহার সহিতই বিবাহ হউক। বরদাবাবু শুধু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'পাগল হয়েছ! কোন্ জুয়াচোর বুজরুক এসে ঠকিয়ে গেছে তার জন্যে এমন সম্বন্ধটা ভেঙ্গে ফেলি আর কি।'

বগলাসুন্দরী বিস্তর সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু বরদাবাবু অটল। শেষে বগলাসুন্দরী বলিলেন, মেয়ে ত তাঁহারই, তাঁহার ইচ্ছামত মেয়ের বিবাহ হওয়া উচিত।

বরদাবাবু এবার বিচলিত হইয়া কহিলেন, 'একটু সবুর কর, রমেশের বাপের আগে চিঠিটা পাই, পরে দেখা যাবে।'

রমেশের বাপের চিঠি শীঘ্রই আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি শুনিয়া দুঃখিত হইলেন রমেশ যে কন্যাকে দেখিতে গিয়াছিল সে

তাহার সম্পূর্ণ মনঃপূত হয় নাই। তাহার বিদ্যাশিক্ষা নাকি সমুচিত মত হয় নাই। রমেশের হঠাৎ অসুখ হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে তিনি বরদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই—তিনি যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তিনি অবগত আছেন বরদাবাবুর নিজের একটি কন্যা আছে, এবং সে বিবাহযোগ্যা। তাহার সহিত রমেশের বিবাহ দিতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই।

কিছুক্ষণ নিভৃতে বরদাবাবু ও গিরিবালার বিশ্রম্ভালাপ হইল। বরদাবাবুর মুখ প্রশান্ত হইল এবং গিরিবালা সহাস্যাননা হইয়া উঠিলেন। বরদাবাবু বলিলেন, 'বগলাকে ডেকে আন।'

দ্রুত পারম্পর্য্যের সহিত তিনটি বিবাহ হইয়া গেল। নলিনী ও সুকুমারীর আগে হইল। হেমেন্দ্র ও রমেশকে নলিনী গতানুগতিক বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

নলিনী সুকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রমেশের সঙ্গে বিয়ে হ'ল না বলে কষ্ট হচ্ছে?'

সুকুমারী বলিল, 'ছেৎ! সে সালের কথা জিজ্ঞেস করে, যুদ্ধুর কথা জিজ্ঞেস করে, তাকে কে বিয়ে করবে?'

রমেশ নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহ করিয়া কিরূপ বোধ হইতেছে?

নলিনী জানাইল, এখন আর স্কুলে যাইতে হয় না, ইহাতে বেশ স্ফূর্ত্তিই অনুভব করিতেছে। বলিল, 'তুমিও স্কুলে যেয়ো না।'

রমেশের কঠোর নীতিবুদ্ধি দেখিল স্ত্রীবুদ্ধি কিরূপ প্রলয়ঙ্করী। সে স্থির করিল, শীঘ্রই নলিনীকে কোনও বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

হেমেন্দ্র লাবণ্যকে বলিল, 'তোমায় প্রথম যে দিন দেখলুম, সেই দিন থেকেই তোমাকে ভাল বেসেছি।'

লাবণ্য বলিল, সেদিন ত আমায় পিসিমার মেয়ে ভেবেছিলে।'

হেমেন্দ্র। না, যখন থেকে জানলুম তুমি আমার কেউ হও না।

লাবণ্য। সে কি, আমাকে বিয়ে করে কোন্ মুখে বল্‌ছ তোমার কেউ হই না!

হেমেন্দ্র। আহা তা নয়, এখন ত তোমায় বিয়ে করেছি—।

লাবণ্য। ভারি কীর্ত্তি করেছ।

হেমেন্দ্র। কি তোমায় বিয়ে করি নি?

লাবণ্য। করেছ ত বয়ে গেছে!

———

শ্রী— ————

নাটুকে রামনারায়ণ

ভাদ্র ও আশ্বিনের 'নারায়ণে' আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, নাটুকে রামনারায়ণের জীবনী ও বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— 'মফঃস্বলে বসিয়া এ কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠা কঠিন।' এ কথা অতি সত্য। শুধু দৃশ্যকাব্যের সমালোচনা বলিয়া নহে—মফঃস্বলে বসিয়া কোন কিছুই ভাল ভাবে লেখা সাধ্যায়ত্ত নহে। তার প্রধান কারণ—ভাল পুস্তকালয়ের অভাব। তাই তিনি কলিকাতার সাহিত্য-সেবিগণকে রামনারায়ণের নাট্য-জীবনের কাহিনী উদ্ধার করিয়া, মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা পণ্ডিত রামনারায়ণের বিস্তৃত জীবনী ও বাঙ্গলা দৃশ্য-কাব্যের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য বাস্তবিকই বড় উৎসুক হইয়াছি। আশা করি, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, কলিকাতার কোন উদ্যমশীল সাহিত্যসেবী নলিনীবাবুর আহ্বানে কর্ণপাত করিয়া, আমাদের সে ঔৎসুক্য নিবারণ করিবেন। কলিকাতার সাহিত্য-সেবিগণ এ বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকুন ; তবে সে সময়টা মফঃস্বলবাসী আমরা একেবারে চুপ করিয়া না থাকিয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের কথা যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, এ স্থলে সেটুকুই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব।

রঙ্গপুর কুণ্ডীর সাহিত্যানুরাগী জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও উৎসাহেই যে রামনারায়ণকে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' লিখিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল, তাহা ঠিক ; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন বহু পূর্ব্বে। প্রথম আমরা সেই কথাই বলিব।

রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কৈশোরাবস্থায় যশোহরের এক মাননীয় অধ্যাপকের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে সেই স্থানে রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ কুপ্রথা বিশেষ বদ্ধমূল ছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের এক রূপগুণবতী কন্যা ছিল। পিতা কুলপ্রথানুসারে সেই কন্যাকে এক বহুবিবাহকারী কুলীনের হস্তে সম্প্রদান করেন। কন্যার নাম কামিনীদেবী। বিবাহের পর অন্যান্য কুলীন-কন্যাগণের যে দুর্দ্দশা ঘটে, কামিনীদেবীর তাহাই ঘটিল। বিবাহের পর চার পাঁচ বৎসর বালিকা, স্বামীর মুখ দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি করিবেন, তিনি বালিকামাত্র, কিছুই সাধ্য ছিল না; তাই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া, সংসারের কাজে অন্যমনস্ক থাকিবার চেষ্টা করিলেন।

একদিন সত্য সত্যই কামিনীদেবীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল—তাঁহার স্বামী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে কত আশা, কত ভরসা। নানা সুখকরী চিন্তায় ও কল্পনায় দিন কাটাইয়া, রাত্রিতে শয়ন-গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শয়ন-গৃহে স্বামী উপস্থিত হইয়া দেখে, পত্নী শয্যায় শয়ানা। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিবামাত্র, স্বামী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং এক পদাঘাতে তাঁহাকে শয্যাচ্যুত করিয়া, নিম্নে ফেলিয়া দিয়া কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিলি—'কি? আমাকে অর্থদ্বারা পূজা না করিয়া শয়ন করিয়া আছিস্? আমি কত বড় কুলীনের ছেলে তাহা বুঝি মনে নাই? আমার মান্যের টাকা কই? আগে টাকা বাহির কর্, পরে নিদ্রা যাস্।'

স্বামীর এই অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে কামিনীদেবীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া, করযোড়ে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—'স্বামিন্! তুমি আমাকে টাকা না দিলে আমি কোথায় টাকা পাইব?' এই কথা বলিতে বলিতে শোকে কামিনীদেবীর ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইতে লাগিল,

চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। স্বামীর উপর তাঁহার এত যে আশা ভরসা, সমুদয় অস্তমিত হইল।

স্বামী পত্নীর মুখে এই শেষ বাক্য শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং—'আমার যেখানে পূজা নাই সেখানে একবিন্দু সময় থাকিতে নাই'—বলিয়া সক্রোধে বহির্গত হইয়া যে চতুষ্পাঠীগৃহে রামনারায়ণ শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় শয়নার্থ গমন করিল।

কুলীন বিবাহ-ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহার জানিতে তর্করত্ন মহাশয়ের কিছুই বাকী ছিল না। তিনি তাহাকে আশ্রয় না দিয়া হাঁকাইয়া দিলেন।

কামিনী দেবী স্বামীর এই নির্ম্মম ব্যবহারে জীবনে হতাশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। তর্করত্ন মহাশয় কামিনীদেবীকে কনিষ্ঠা ভগিনীর স্থায় বড়ই স্নেহ করিতেন, তাঁহার পাঠে সাহায্য করিতেন, তাঁহার নিকট দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রীর পতি-পরায়ণতা সম্বন্ধে ইতিহাস বর্ণন করিতেন; সুতরাং কামিনীদেবীর এই আত্মবিসর্জ্জনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কুলীনদিগের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন ও এই কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের তেমন অর্থ ছিল না, তাই মনের আশা মনে চাপিয়া রাখিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথাতে সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দেখাইয়া যিনি একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

তর্করত্ন মহাশয় এ সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে এ ক্রোধানল ধূমায়িত হইতেছিল। এখন সময় পাইয়া হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া, প্রাণের সমস্ত জ্বালা ঢালিয়া তিনি কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক রচনা করিয়া মনের খেদ কতকটা

মিটাইলেন। তাই কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব পাঠ করিলে কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফলগুলি যেন চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে।

এখন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিব। বাল্যকালে একদিন তিনি আত্মীয়ভবনে যাইতে যাইতে পথে ক্ষুধায় কাতর হন, কিন্তু তাঁহার নিকটে মাত্র একটী পয়সা ছিল। তবে তখন দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হয় নাই, তিনি এক পয়সা দিয়া এক বৃদ্ধার নিকট হইতে পঁচিশটি আম্র ক্রয় করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী এক জলাশয়ের বাঁধান ঘাটে গিয়া উহার কয়েকটী আম্র খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তিনি বয়সে বালক ছিলেন সুতরাং চার পাঁচটি আম্রেই তাঁহার উদর পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অবশিষ্ট আম্র লইয়া বালকসুলভ চপলতায় পুষ্করিণীর জলে ছিনি মিনি খেলিতে একটী আম্র সজোরে জলে ফেলিলেন। কিন্তু তখনই যেন কে তাঁহার ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল, 'দ্রব্য বৃথা নষ্ট করিও না।' এই কথা শুনিয়া তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি আম্রগুলি যত্ন করিয়া পরিধেয় বসনে বাঁধিয়া রাখিলেন। তাঁহার গন্তব্য পথ বহুদূরে ছিল, এতগুলি আম্র কি করিয়া লইয়া যাইবেন এই ভাবিয়াই যেন একটু বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এমন সময় কয়েকটী কৃষক সেই জলাশয়ে জলপান করিতে আসিল। তর্করত্ন মহাশয় ঐ আম্রগুলি তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কৃষকেরা বালকের অনুরোধ উপেক্ষা না করিতে পারিয়া সেগুলি গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তর্করত্ন মহাশয়ও নিরুদ্বিগ্ন মনে গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু তিনি কিছুদূর যাইতে না যাইতে পথে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বালক পথে আশ্রয় স্থান না পাইয়া একেবারে মৃতকল্প হইলেন। তাহার পশ্চাতে কিছুদূরেই কৃষকগণ আসিতেছিল। তাহারা এই দৈবদুর্যোগ দেখিয়া বালকের জন্য অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'যে বালক আমা-

দিগকে আম্র দিয়া পরিতোষ করিয়াছে চল আমরা সকলে মিলিয়া এই বিপদ সময়ে তাহাকে রক্ষা করি।' এই বলিয়া তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া মৃতকল্প বালকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া উঠাইয়া লইয়া কৃষকদের একজনের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং সকলে প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া দিল। তর্করত্ন মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি আমগুলি ফেলিয়া না দিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া সেই আম হইতেই কৃষকেরা আমার জীবন রক্ষা করিল। আমি যাহাকে রাখিয়াছিলাম সেই আমাকে রাখিল। জীবনে আমি কোনদিনই কোন সামান্য জিনিষও বৃথা নষ্ট করিব না।' তর্করত্ন মহাশয় চিরজীবন ধরিয়া 'যা'কে রাখ সেই রাখে' এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

তর্করত্ন মহাশয় সম্বন্ধে আর একটী কথা—তাঁহার বাক্‌পটুতা। তিনি একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় ছাতুবাবুর বাটীতে বিদায় লইতে যান। ছাতুবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিতেছিলেন। এক ব্রাহ্মণকে ছাতুবাবু ৩৲ টাকা ও একখানি পিতলের থালা বিদায় দিলেন। ইহার পর তর্করত্ন মহাশয়ের পালা পড়িল। ছাতুবাবু তাঁহাকে দুইটী টাকা একখানি থালা বিদায় দিলেন। তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—'বাবু, আপনি পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতিপক্ষপাত করিলেন।' ছাতু-বাবু বড়ই গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের বাক্‌চাতুর্য্য বুঝিয়া বলিলেন, 'আপনি কি চান্?' তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, 'আমার প্রতি পক্ষপাত না করিয়া পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের ন্যায় আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন।'

ছাতুবাবু বলিলেন 'নেত্র ত মানুষের নাই। তিন নেত্র ত মহা-দেবের'। তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, 'আপনাকে আশুতোষ বলিয়াই ত জানি। তবে নেত্রের অভাব কেন হইবে? বরং তিন নেত্র স্থানে পঞ্চদশ নেত্রের সম্ভাবনা।' ছাতুবাবুর রাশ নাম 'আশুতোষ' ছিল।

আশুতোষ মহাদেবের নাম, মহাদেবের পঞ্চ মুখ, প্রতি মুখে ত্রিনেত্র হেতু পঞ্চদশ নেত্র।

তর্করত্ন মহাশয়ের এই বাক্‌কৌশলে ছাতুবাবু আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চদশ নেত্র স্থানে পঞ্চদশ মুদ্রা ও এক ঘড়া বিদায় দিয়া মহা আনন্দে তাঁহার পদধূলি লইলেন ও চিরদিনের জন্য তাঁহার সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের এ বাক্‌কৌশল, এ রসধারা তাঁহার কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। তর্করত্ন মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যতদিন বাঙ্গলা ভাষা থাকিবে ততদিন বাঙ্গালী তাঁহার এই রসের উৎস 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' হইতে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।
সেনহাটি (খুলনা)

মায়াবতী পথে

পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্ব হইতে মনের মধ্যে, খুব প্রবল ভাবে না হইলেও, দেশভ্রমণের একটা বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কথা ছিল, ছুটি হইলে কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কোন একটা স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া উভয়ে ভ্রমণে নির্গত হওয়া যাইবে। যথা সময়ে, অর্থাৎ ছুটির দিন পনের পূর্ব্বে, বন্ধুবরের নিকট হইতে যথারীতি নোটিসও পাইলাম। কিন্তু ছুটি যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল ততই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কোথায় যাই! কোথায় যাই! শিমলা শৈল হইতে শ্রীযুক্ত মেজ-দাদা মহাশয়ের আহ্বান পাইলাম, কয়েকজন বন্ধু দার্জ্জিলিঙ্ যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত যাইবার কথাও হইতেছিল এবং সর্ব্বোপরি কলিকাতা যাইবার কথা ত ছিলই।

সিমলা আমার খুব ভাল লাগে। সিমলার কথা মনে হইলেই আমার মনের মধ্যে চিরদিনই এক অপূর্ব্ব বিরাট ও মধুর দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, যাহার আকর্ষণ আমার মনে হয় কোনদিনহ মন্দীভূত হইবে না। কিন্তু তথাপি সিমলা বহুবার গিয়াছি। দার্জ্জিলিঙ্ দেখিবার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে আছে। বাঙ্গলাদেশ হইতে সহস্রাধিক মাইল দূরে হিমালয়ের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে স্থিত সিমলা বহুবার আমাকে আকর্ষণ করিল, অথচ বাঙ্গলার শীর্ষদেশে স্থিত একরাত্রির পথ দার্জ্জিলিঙ্ এ পর্য্যন্ত দেখা হইল না, ইহা শুধু বিস্ময়ের নহে, লজ্জারও কথা বটে। শুনিয়াছি দার্জ্জিলিঙ্ হিমাচ্ছন্ন, কুয়াসাময়, কুজ্ঝটিকার প্রহেলিকায় রহস্যপূর্ণ। না দেখিয়া, এবং দেখিবার একটা তীব্র বাসনা মনের মধ্যে সজাগ রাখিয়া, আমার মানস-দার্জ্জিলিঙ্‌কে বাস্তব দার্জ্জিলিঙ্ অপেক্ষা বোধ হয় দশগুণ রহস্যময় করিয়া

ভুলিয়াছি। মনে করিতেছিলাম, কলিকাতা গিয়া বন্ধুবরকে সম্মত করিয়া লইয়া এবার পূজার অবকাশে চির-রহস্যময় দার্জ্জিলিঙ্গের রহস্য-ভেদ করা যাইবে, এবং তদনুযায়ী মনে মনে প্রস্তুত হইয়া লইতেছিলাম, এমন সময়ে আর একবার সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার কারণ ঘটিল যাহা জীবনের মধ্যে বহুবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি এবং বহুবার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। অর্থাৎ "Man proposes and God disposes", ভারতের ভাষায় 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' দার্জ্জিলিঙ্গ্ যাইবার সঙ্কল্প যখন মনের মধ্যে প্রায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তখন সহসা অন্য একদিক হইতে এবং অন্য একদিকের জন্য প্রবল ভাবে আমন্ত্রণ লাভ করিলাম। একটি বড় মকর্দ্দমায় একপক্ষের অধিনায়করূপে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার মহাশয় তখন সপরিবারে ভাগলপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহাদের সহিত মায়াবতী ভ্রমণে যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করিলেন।

প্রথমটা কি যে করিব তাহা স্থির করিতে বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বহু দ্বিধাদ্বন্দ্ব তর্ক এবং আলোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহাকে একেবারে বর্জ্জন করিতে হয়, বন্ধুবরের নিকট ব্রীচ্ অভ্ প্রমিসের অপরাধে অপরাধী হইতে হয় এবং পুনরায় নূতন ভাবে, নূতন করিয়া নিজের দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। মনের মধ্যে খুব একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল। কিন্তু দুইটা প্রবল এবং অনতিক্রমণীয় শক্তির অধীনতায় অবশেষে মায়াবতী যাত্রাই স্থির করিয়া ফেলিলাম। প্রথমতঃ, মায়াবতীর নাম শুনিয়াই মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল! অজ্ঞাত, অপরিচিত, হিমালয়ের নিভৃত অন্তরে স্থিত, দুর্গম মায়াবতী এক অপূর্ব্ব মায়ার মোহজালে আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই যেন অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গ্ তাহার

দুর্ভেদ্য কুজ্‌ঝটিকার আবরণ লইয়া ধীরে ধীরে মন হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল এবং চুক্তি-ভঙ্গ অপরাধের কুণ্ঠা ক্রমশই কমিয়া আসিতে লাগিল। দ্বিতীয় কারণটিকে শুধু শক্তি বলিলে ঠিক বলা হয় না, শক্তির নৈকট্য বলিলেই ঠিক বলা হয়। যাঁহারা গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন দুইটি একই মাত্রার শক্তি যখন দুই বিভিন্ন দিক হইতে কোন বস্তুকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা তাহাদের দূরত্বের বিপরীত হিসাবে আকর্ষণ করে। মানস-জগতেও শক্তির আকর্ষণ কতকটা এই হিসাবে চলে, এই মহাসত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া আশা করি আমার কলিকাতার বন্ধু আমাকে ক্ষমা করিবেন। একটি শক্তি ভাগলপুরে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত, এবং অপর একটি শক্তি কলিকাতার দুই শত পঁয়শট্টি মাইল দূরে স্থিত, তাহারা যে একই মাত্রায় একটি বস্তুকে আকর্ষণ করিবে এমন আশা করা নিশ্চয় সমীচিন নহে। অতএব স্বাভাবিক শক্তির টানে নিজেকে নির্ব্বিকারচিত্তে অর্পণ করিয়া মায়াবতী যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম।

মায়াবতী-যাত্রীর দলে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দজন প্রাণী ছিলাম। তন্মধ্যে একজন মহিলা, দুইটি বালিকা, একজন পরিচারিকা ও পাঁচজন পরিচারক। ব্যবস্থা হইতেছিল একটি টুরিষ্টকার ভাড়া করিয়া ভাগলপুর হইতে বেরেলী পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য। ব্যবস্থা করিবার জন্য যাত্রীদলেরই মধ্যে একজন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, এবং তৎসংক্রান্তে ভাগলপুর হইতে কলিকাতা, এবং কলিকাতা হইতে ভাগলপুর প্রত্যহ আট দশখানি করিয়া টেলিগ্রাম আসিতে যাইতেছিল। কিন্তু এত যত্নেও টুরিষ্টকার পাওয়া যাইবে কি না, সে বিষয়ে কোন স্থিরতা পাওয়া গেল না। ৭ই অক্টোবর আমাদের রওয়ানা হইবার কথা ছিল। একদিন যাত্রার দিন পিছাইয়া দিতে হইল, কিন্তু তথাপি সুবিধার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অগত্যা টুরিষ্টকারের আশা পরিত্যাগ করিয়া একখানি ফার্ষ্ট্‌ক্লাস ক্যারেজ রিজার্ভ করিবার জন্য

তার করা হইল। কিন্তু গ্রহ যখন বিরূপ হয় তখন কোন চেষ্টাই সফল হয় না। ৭ই অক্টোবর সমস্ত দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রায় বার তেরখানি তার আসিল। রাত্রি দশটার সময় সকলে মিলিয়া সেই দুর্ব্বোধ্য টেলিগ্রামগুলির অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বসা গেল। দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা ও গবেষণার পর এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করা গেল যে ফার্ষ্টক্লাশ ক্যারেজ রিজার্ভ পাওয়া যাইবে না, টুরিষ্টকার পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কবে, কোথায় এবং কোন ট্রেনের সহিত, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পাঁচ ছয়দিন ধরিয়া টুরিষ্টকারের নিস্ফল ব্যবস্থা করিতে করিতে সকলের মন বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—আবার তিন চারি দিন অপেক্ষা করিয়া টুরিষ্টকারের জন্য ব্যবস্থা করিবার ধৈর্য্য কাহারও ছিল বলিয়া দেখা গেল না। মন তখন বাহির হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে—তা' সে যত বড় অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়াই হউক না কেন। "মাত্রা যখন পুরিয়া উঠে তখন মিষ্টই বা কি আর তিক্তই বা কি!" যাইবার ইচ্ছা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন ফার্ষ্টক্লাশই বা কি আর থার্ডক্লাশই বা কি! রিজার্ভ হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি! কথা হইল পরদিন প্রাতে একবার ষ্টেশনে টুরিষ্টকারের সংবাদ লওয়া যাইবে। যদি কোনও সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অপরাহ্ন ৩টার ট্রেনে রওয়ানা হইয়া কিউল পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে। কিউল হইতে বেরেলী পর্য্যন্ত একখানি ফার্ষ্টক্লাস ক্যারেজ রিজার্ভ করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইবে। পাওয়া যায় ভালই, না পাওয়া গেলে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে মোগলসরাই পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে বেরেলী পর্য্যন্ত যাইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। বেরেলী হইতে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিবার জন্য পথ হইতে টেলিগ্রাম করা হইবে—এবং কাঠগুদাম হইতে মায়াবতী যাইবার জন্য কি ব্যবস্থা

করিতে হইবে তাহার ধারণা আমাদের কাহারও ছিল না, অতএব সে জন্য ভাবনাও ছিল না। আমরা মায়াবতী যাইতেছি শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত অদ্বৈতাশ্রমবাসীগণের অতিথি হইয়া। কাঠ-গুদাম হইতে মায়াবতী যাইবার ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহারাই লইয়াছিলেন। কিন্তু কাঠগুদাম পর্য্যন্ত যাইবার যে ব্যবস্থা আমরা স্থির করিলাম তাহা অদৃষ্টেরই মত অনিশ্চিত হইল।

ভাগলপুর হইতে কাঠগুদাম এই দীর্ঘ পথ, যাহার মধ্যে তিন জায়গায় গাড়ী বদল করিতে হইবে, এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে শুনিয়া মহিলাগণ প্রথমে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখা গেল যে তিন চারিদিন ধরিয়া টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করিয়াও কূল পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, তখন্ পুনরায় ভাগলপুরে বসিয়া টেলিগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদেরও হইল না। তাঁহারাও আমাদের সহিত একমত হইলেন।

৮ই প্রাতে শ্রীমান চিত্তরঞ্জন টুরিষ্টকারের সংবাদ লইবার জন্য ভাগলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিলেন। কিন্তু ষ্টেশনের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ টুরিষ্টকারের গতিবিধি বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংবাদই যখন দিতে পারিলেন না, তখন ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়া ভিন্ন আর উপায়ান্তর বা মতান্তর রহিল না। সেদিন আমাদের উপর কোন্ গ্রহ নক্ষত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা আমরা জানি না—কিন্তু তিথিটি আসিয়া জুটিয়াছিল সর্ব্বতোভাবে আমাদের উপযোগী হইয়া। সেদিন অমাবস্যা ছিল। বাহির হইয়া পড়িবার জন্য আমাদের মনে এমনই একটা অনতিক্রমণীয় ঝোঁক্ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সহস্র নিষেধবচনও কোন প্রকারে ফলপ্রদ হইল না। ৩টার গাড়ীতে যাত্রা করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কিন্তু অমাবস্যায় যাত্রা সুরু করি-বার ফল যে হাতে হাতেই পাওয়া যায় তাহা আমরা সেদিন মর্ম্মে

মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। হায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিষেধবচন আমরা যদি সে দিন লঙ্ঘন না করিতাম! কিন্তু বৃথা সে দুঃখ করা। নিয়তি কে কবে খণ্ডন করিয়াছে!

গৃহ হইতে যখন নিষ্ক্রান্ত হইলাম তখন ট্রেণ আসিবার মাত্র পঁচিশ মিনিট বিলম্ব ছিল। ট্রেন মিস্ করিবার আশঙ্কা যখন মনের মধ্যে সহসা প্রবল হইয়া উঠিল তখন ক্ষণে ক্ষণে আমার রথ-চালককে পর্য্যায়ক্রমে ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলাম। এই যুগল প্রক্রিয়ার ফলে আমার রথ যে গতিভরে চলিল তাহাতে আমার নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, "চাকা আগে ছাড়ে কিম্বা ঘোড়া আগে পড়ে!" ইহা নিঃসন্দেহ, সেদিন ভাগলপুরের ষ্টেশন-পথে "Society for the Prevention of Cruelty to Animals-এর কোন সভ্য যদি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে আমাকে ট্রেন মিস্ করিতেই হইত। কোন প্রকারে ট্রেন আসিবার দুই মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপনীত হইয়া দেখিলাম সকলেই প্রস্তুত আছেন, শুধু আমিই বাকি ছিলাম। আমার বিলম্ব দেখিয়া সকলেই আমার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং আমাকে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়াও কেহ কেহ এমন সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে আমি না আসিবার ফন্দীই খাটাইয়াছিলাম; কিন্তু সময়ের ঠিক হিসাব করিতে না পারায় ট্রেন ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

প্ল্যাট্‌ফরমে স্তূপীকৃত আমাদের সঙ্গে যাইবার আসবাবপত্রের সংখ্যা ও আয়তন দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইল। এই বিরাট লটবহর বহন করিয়া এরূপ দুর্গমপথ অতিক্রম করিবার ভাবনাই আমার নিকট একটা দুঃসাহস বলিয়া মনে হয়। প্ল্যাট্‌ফরমের একটি অংশ আমাদের জিনিসে ভরিয়া গিয়াছিল। দেখিলাম এই বিপুল দ্রব্য-সম্ভার উঠাইয়া দিবার জন্ত ফৌজের মত দুই তিন সারি কুলী দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেমন অবস্থা তেমনই ব্যবস্থাও বটে! এই মহা-সমারোহের দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল না যে নির্জ্জন মায়াবতীর

ক্রোড়ে আমরা শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে চলিয়াছি—মনে হইল যেন আমরা কোন এক বিরাট অভিযানের জন্য যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি।

গাড়ী আসিলে সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল দুইখানি ফাষ্ট'ক্লাস কামরা খালি আছে। দেখিতে দেখিতে কামরা দুইখানি জিনিসপত্র ও লোকজনে ভরিয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে আমাদের যাত্রার প্রথম পর্ব্বের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আশঙ্কার কারণ ছিল কিউল জংশন লইয়া। সেখানে শুধু যে গাড়ী বদল করিতে হইবে তাহা নহে—টাইম্ টেবল্ হইতে হিসাব করিয়া জানা গিয়াছিল যে আমাদের ট্রেন কিউলে পৌঁছান এবং হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার কিউল ষ্টেশন ছাড়ার মধ্যে সময় মাত্র ২৪ মিনিট! এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি জিনিসপত্র প্ল্যাটফরমের একদিক হইতে অপর দিকে বহন করিয়া গাড়ীতে উঠানই ত একটি গুরুতর ব্যাপার। তাহার উপর আমাদের মন্থর-গতি ট্রেনখানি দয়া করিয়া যদি দশ পনের মিনিট বা ততোধিক লেট্ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত বিপদের আর পরিসীমা থাকিবে না! আমাদের দলের মধ্যে কাহারও কাহারও এমন অভিজ্ঞতা ছিল যে কখন কখন লুপ্ লাইনের এই ট্রেণখানি হইতে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার ধরিবার জন্য উর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়াইবার প্রয়োজন হয়। এরূপ কথাও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে এমন ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, প্রাণপণে দৌড়াইয়াও হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার ধরিবার উপায় থাকে না। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি কিউলের কথা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়া থাকি, তাহাতে আমাদিগের প্রতি কেহও কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারে যদি আমাদের জন্য রিজার্ভ গাড়ী না আসে এবং খালি কামরা না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি দুর্দ্দশা হইবে, সে সকল গুরুতর আশঙ্কার কথা ত' ছিলই।

ভাগলপুর ষ্টেশন ছাড়ার পর প্রতি ষ্টেশনেই আমরা ঘড়ি ও টাইম্ টেবল্ মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম ট্রেণ ঠিক যাইতেছিল কি লেট্ যাইতেছিল। দুইটি ঘড়ির সময়ে দুই মিনিটের পার্থক্য ছিল। কোন্ ঘড়িটি ঠিক চলিতেছিল সে বিষয়ে আমাদের বিশদভাবে আলোচনা চলিল। তখন আমরা অর্দ্ধমিনিট সময়ও ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত ছিলাম না। বাল্যকালে শিশু-শিক্ষার উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত উপদেশবচন সত্বেও কত সময় নষ্ট করিয়া আসিয়াছি। প্রহর ঘণ্টা ত দূরের কথা, মাসকে মাস জ্ঞান করি নাই, বৎসরকে বৎসর জ্ঞান করি নাই। আর আজ ট্রেনের উপর উঠিয়াই সময়ের অমূল্যতা সম্বন্ধে সহসা জ্ঞান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! আজ স্পষ্ট বোঝা গেল উপদেশ কিছু নহে, অধ্যয়ন কিছু নহে; অভিজ্ঞতাই মানুষকে যথার্থভাবে বড় করিয়া তোলে। বুঝিলাম অভিজ্ঞ না হইলে প্রাজ্ঞ হইবার উপায় নাই।

জামালপুরে ষ্টেশনের ঘড়ির সহিত আমরা আমাদের ঘড়ি দুইটি ঠিক করিয়া মিলাইয়া লইলাম। জামালপুরের তিন চারিটি ষ্টেশন পরেই আমাদের সকল সংশয়-উদ্বেগ-আশঙ্কার স্থল কিউল। জামালপুর হইতে ঠিক সময়েই ট্রেণ ছাড়িল। তাহার পর প্রতি ষ্টেশনেই আমরা ঘড়ি ও টাইম্ টেবল্ মিলাইতে লাগিলাম। কোন ষ্টেশন হইতে এক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়ে, কোন ষ্টেশন হইতে বা এক মিনিট আগে ছাড়ে। এইরূপে যুগপৎ আশা ও আশঙ্কার হস্তে নিপীড়িত হইতে হইতে আমরা যখন কিউল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন হিসাব করিয়া দেখা গেল নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই তিন মিনিট পূর্ব্বেই আমরা কিউল পৌঁছিব। সে দিক হইতে আমাদের হিসাবে কোন ভুল হয় নাই। তিন মিনিট পূর্ব্বেই আমাদের ট্রেণ প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া স্থির হইল। মনে করিলাম পরম করুণাময় পরমেশ্বর এতগুলি প্রাণীর ঐকান্তিক কামনার প্রতি উদাসীন হন নাই। কিন্তু হায়, তখন কি জানিতাম আমরা যখন ভাগলপুর

হইতে কিউলের পথে সূক্ষ্ম হিসাব লইয়া গভীরভাবে নিবিষ্ট ছিলাম তখন আমাদের অদৃষ্ট-পুরুষ অন্তরাল হইতে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া সকৌতুকে মধুর হাস্য করিতেছিলেন!

আমার একথা শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার ছাড়িয়া গিয়াছিল। প্যাসেঞ্জার পৌঁছিবার তখনও এগার মিনিট বিলম্ব ছিল। গাড়ী থামিবা মাত্র একমিনিটও সময় নষ্ট না করিয়া আমরা সত্বর জিনিস-পত্রসহ প্লাটফরমের অপর দিকে উপস্থিত হইলাম। আমাদের রিজার্ভ আসিতেছে কি না সে সংবাদ লইবার জন্য শ্রীমান চিত্তরঞ্জন ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি যে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন তাহা শুনিয়া আমাদের সকলের মন এক অপূর্ব্ব মিশ্র বিস্ময়, বিরক্তি, কৌতুক ও আনন্দের রসে ভরিয়া গেল! সেই বহুঈপ্সিত বহু-কষ্টের বহু-প্রমাদের টুরিষ্টকার আসিতেছে! কিন্তু মনে করিবেন না হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জারের সহিত। বেলা ১ টার সময় হাওড়া হইতে একখানি লুপ্ প্যাসেঞ্জার ছাড়ে তাহারই সহিত! রাত্রি ১২ টার সময়ে ভাগলপুর পৌঁছিবে এবং কিউল পৌঁছিবে রাত্রি ৩টার সময়ে।

ইহাকেই বলে "খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার!" অমাবস্যায় যাত্রা আরম্ভ করিবার যথা সময়ে আহারাদি সমাপন করিয়া শান্ত-চিত্তে সুস্থ দেহে রাত্রি বারটার সময়ে টুরিষ্টকারের উঠিয়া আমরা বেরেলী পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। তৎপরিবর্ত্তে অসময়ে উদ্বিগ্নচিত্তে দ্বিগুণ ব্যয় বহন করিয়া আসিয়া পড়া গেল ৬০ মাইল দূরে কিউল জংশনে! ২৪ মিনিটের মধ্যে কি করিয়া সময় সঙ্কুলান হইবে ভাবিয়া আমরা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, আর দীর্ঘ নয় ঘণ্টাকাল এখানে কষ্টে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে! ট্রেনে বসিয়া আমরা এক মিনিট আধ মিনিট সময় লইয়া কাড়া-কাড়ি করিতেছিলাম—আর এখন মুঠা মুঠা সময় নষ্ট করিবার কোন

উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! কিউলের পথে যে অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম তাহার অব্যবহিত পিছনে যে এমন নিষ্ঠুর বিদ্রুপ ছুটিয়া আসিতেছিল তাহা কে জানিত? হে অনাদি অনন্ত মহাকাল, তোমার সীমাহীন অবয়বের মূল্য-অমূল্যতার রহস্য একা তুমিই অবগত আছ! কার্য্যের রজ্জু দিয়া, সফলতার বন্ধন দিয়া আমরা তোমাকে বাঁধিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার পিচ্ছিল দেহকে বাঁধিতে পারে এমন কৌশলী অতি অল্পই আছে।

যথা সময়ে আমাদের বহু-উদ্বেগের বস্তু আগ্রা প্যাসেঞ্জার আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন আর তাহার মধ্যে আমাদের কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ ছিল না। অদৃষ্ট তাহার বিচিত্র মায়াদণ্ডের প্রভাবে হাওড়া-আগ্রা প্যাসেঞ্জার সম্বন্ধে আমাদিগকে এমনই নির্ব্বিকার করিয়া দিয়াছিল যে, সে গাড়ীতে যাইতে হইলে আমাদের স্থান সঙ্কুলান কিপ্রকার হইত তাহা পর্য্যন্ত আমরা একবার চাহিয়া দেখিলাম না। প্ল্যাট্‌ফরমে প্যাসেঞ্জারের পাশ দিয়া পদচালনা করিতে করিতে মনে হইল কবে সেই প্রকৃত মায়াবতী যাইবার দিন উপনীত হইবে যে দিন এমনই ভাবে মন্থর প্যাসেঞ্জারের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন থাকিয়া দ্রুতগামী টুরিষ্টকারের জন্য উদ্‌গ্রীব ভাবে অপেক্ষা করিব! হায় টুরিষ্টকারের দুরাকাঙ্ক্ষা! একখানা হরিদ্রা বর্ণের টিকিট সংগ্রহ করিতে পারি কি না তাই সন্দেহ!

আহারাদি সমাপন করিয়া স্টেশনের দুইখানি ওয়েটিংরুম অধিকার করিয়া আমরা রাত্রি যাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই অন্তবিহীন গোলযোগের মধ্যে বিছানা খুলিয়া আরাম করিবার দুঃসাহস কাহারও হইল না। ইজিচেয়ার, সোফা, বেঞ্চ, যেখানে যে পাইল, কেহ লম্বমান হইয়া কেহ কুঞ্চিত হইয়া কেহ ত্রিভঙ্গ হইয়া, যেমন করিয়া যে সুবিধা পাইল একটু নিদ্রা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া লইল। আমার ভাগ্যে একখানি একটু বিচিত্র গঠনের

ইজিচেয়ার পড়িয়াছিল। সেই ইজিচেয়ারের গঠনের অনুরূপ নিজের ক্লিষ্ট দেহকে স্থাপিত করিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ঠিক জানি না—রাত্রি দুইটার সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিলাম বেদনায় সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যথিত দেহকে কোন প্রকারে চেয়ারের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া যখন দণ্ডায়মান হইলাম তখন দেখিলাম —শরীরের ঋজুভঙ্গী প্রায় লুপ্ত হইয়াছে—চেয়ারে যেরূপভাবে শয়ন করিয়াছিলাম চেয়ার হইতে উঠিয়া প্রায় সেইরূপ ত্রিভঙ্গিম ঠামেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছি! কক্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলাম শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ কখন দীর্ঘ বেতের বেঞ্চ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একখানি বড় গোলাকৃতি টেবিলের উপর ওভার্ কোট পাতিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। সতীন্দ্রনাথের গভীর নাসিকা গর্জ্জন শুনিয়া মনে বাস্তবিকই একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইল। কতকটা দুঃখিত অন্তঃকরণে কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্ল্যাট্‌ফরমের স্নিগ্ধ শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে পদচারনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সতীন্দ্রনাথ ও চিররঞ্জন আসিয়া আমার সহিত যোগ দিলেন। সতীন্দ্র বলিলেন কাঠের উপর শয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। শুনিয়া আমার নূতন শিক্ষালাভ হইল। সুগভীর নাসিকাগর্জ্জন যে শারীরিক যন্ত্রণার পরিচায়ক এ ধারণা আমার এতদিন ছিল না!

রাত্রি তিনটার কিছু পরে হাওড়া-গয়া প্যাসেঞ্জার অপরদিকের প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমরা সকলে উন্মুখ হইয়া ব্যগ্রভাবে চাহিয়াছিলাম। আসিয়াছে! আসিয়াছে! দেখিয়াই বুঝিলাম আমাদের সেই বহুদুঃখের বহুসুখের বহু আশা-আনন্দের নিকেতন টুরিষ্টকার আসিয়াছে! সুদীর্ঘ সুগঠিত শুভ্র সুন্দর কার দেখিয়াই বুঝিলাম আর কিছু নহে, তাই বটে! সেই দুগ্ধ-শুভ্রবর্ণ দেখিয়া আমাদের মনও শান্তি ও আনন্দের শুভ্ররাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

আমাদের সহিত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ছিল না—কিন্তু আমরা সকলেই বুঝিলাম এতক্ষণে অমাবস্যা কাটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করিতে করিতে উন্মত্ত গতিভরে পাঞ্জাবমেল আসিয়া আমাদের পার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এবং পরক্ষণেই আমাদের টুরিষ্টকার মেলের পশ্চাতদিকে যোগ করিয়া দিল। উজ্জ্বল তড়িতালোক-আলোকিত সর্ব্বপ্রকারে আরাম ও আনন্দপ্রদ সেই গতিশীল গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঞ্চিত দুঃখ ও বিরক্তি অপসৃত হইয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর মত আমাদের দ্রব্যাদি যথাসম্ভব গুছাইয়া লইয়া দুইটি শয়নকক্ষে আমরা নিজ নিজ শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়া আমাদের গাড়ীখানি মৃদু মধুর দোল দিতে দিতে আমাদিগকে আমাদের গন্তব্যের দিকে লইয়া ধাবিত হইল। ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে শুনিতে কখন আমরা নিদ্রার শান্ত ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম ঠিক মনে নাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

[গল্প]

তাহার নাম ছিল আশালতা—তাহাকে কেহ লতা, কেহ লতি বলিয়া ডাকিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার পিতা অতি শৈশবেই তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন; ছয় মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়। আমাদের পাড়াতেই তার বাপের বাড়ী—সে সেখানেই থাকিত। দুই বৎসর বয়স হইতেই সে মাতৃ-হারা—মা কেমন সে কখনও জানে নাই। তাহার এক বৃদ্ধা বিধবা পিসীমা সেই বাড়ীতেই থাকিতেন, তাঁর কাছ থেকে সে যথেষ্ট আদর যত্ন পাইত; কিন্তু ঘোলে কি মেটে দুধের তৃষ্ণা?

বড় অভিমানী মেয়ে। আদর পাইলে গলিয়া যাইত; কিন্তু কেহ 'অলুক্ষণে' বলিয়া গালি দিলে, সে এক দৌড়ে পিসীমার কাছে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিত। কখনও কখনও বিনা কারণে হাসিত ও বিনা কারণে কাঁদিত।

তাকে কেউ বুঝিতে পারে নাই। পাড়ার সকলেই তাকে শুধু দস্যি মেয়ে বলিয়াই জানিত। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। সকল রকম দুষ্টুমিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত—ছেলে-দের চেয়েও ঢের বেশী ওস্তাদ। তাহার দৌরাত্ম্যতে সকলেই কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। ভোর হইলেই একদৌড়ে তাহাদের বাড়ীর কাছে পেয়ারা বাগান, সেই বাগানে গিয়া সেই পেয়ারা গাছের ডালের উপর উঠিয়া আর একটা ডালে ঠেসান দিয়া পেয়ারা খাইত, আর গুন্ গুন্ করিয়া গান করিত। কোথা হইতে গান শিখিল কেহ জানে না, কিন্তু গলা বড় মিঠে বড় প্রাণভরা। সমস্ত সকালটা এমনি করিয়া গাছে গাছে বাড়ীতে বাড়াতে ঘুরিয়া বেড়া-

ইত। যেখানেই যাউক, একটা না একটা গণ্ডগোল হইতই হইত; কাহাকেও ভেঙ্‌চাইত, কাহাকেও কান মলিয়া কাঁদাইয়া আসিত, কাহারও সঙ্গে খুব গলা ছাড়িয়া ঝগড়া করিত; কখনও হাত কাটিয়া, কখনও কাপড় পোড়াইয়া বাড়ী ফিরিত।

আসিয়াই পুকুরে স্নান—ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিত। চিৎ, উপড়, কাঁথা সেলাই—এইরূপ নানা রকমের সাঁতার কাটিত সাঁতার কাটিতে কাটিতে গলা ছাড়িয়া গান—মাঝে মাঝে আমরা অবাক্ হইয়া শুনিতাম।

তারপর দুপুরে চোখে ঘুম নাই, কেবল দুর্দ্দান্তপনা—বাগানে বাগানে একদল ছেলে লইয়া কেবল দস্যুবৃত্তি—কাঁচা আমের দিনে টোপরে একরাশ আম আর হাতে লুণ লইয়া ঘুরিত, সকল দুষ্টু-মির মধ্যে চাট্‌নির মত কাঁচা আম দাঁতে ছিলিয়া লুণ লাগাইয়া কচ্ কচ্ করিয়া চিবাইয়া খাইত। ভাত খাবার সময় খুব কমই খাইত, কিন্তু কাঁচা আমের বেলায় একেবারে রাক্ষসী! তার পিসীমা বলি-তেন, "ভাত রোচেনা রোচে মোয়া"। তিনি বড় একটা রাগ করি-তেন না—মা-হারা বিধবা মেয়ে, বড় মায়া হইত। মাঝে মাঝে যখন আর সহ্য করিতে পারিতেন না, তখন বলিয়া উঠিতেন, "ওরে তুই ছেলে হলি না কেন?" চাটুয্যে মহাশয়দের বাড়ীতে একবার গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়, তার পর থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের পাড়ার বাগানে বাগানে রোজ যাত্রা হইত। কান ঝালা পালা হইয়া গেল, সকলেই জানিত দস্যি মেয়ের দল, কেহ বড় একটা ঘাঁটাইত না।

কিন্তু এমন দুর্দ্দান্ত মেয়ে সন্ধ্যা হলেই একেবারে কাবু, কখনও পিসীমার বুকে লুকাইত, কখনও ছাদের উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কি একটা অভাবনীয় করুণ রসে যেন তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। কখনও আপন মনে প্রাণ-কাঁদান গান গাহিত, কখনও চুপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

২

তখন আমার প্রায় বিশ বৎসর বয়স, শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ-হীন, আমার সংসারে আর কেহই ছিল না। একেবারে একা থাকিতাম। বাবা যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাতেই আমার চলিয়া যাইত। ছেলে বেলা হইতেই ছবি আঁকিতাম, গান বাজনাও খুব ভাল বাসিতাম, কিন্তু ছবি আঁকার মধ্যেই আমার মনটা পড়িয়া থাকিত। কেহ আমাকে শেখায় নাই, আমি আপনা-আপনিই শিখিয়াছিলাম, সমস্ত দিনই ছবি আঁকিতাম। আমার ছবি জ্ঞান ছবি ধ্যান ছিল। পাড়ার প্রবীণেরা বলিতেন, "ছেলেটা একেবারে ব'য়ে গেল, এত লেখাপড়া শিখে একটা পাশও দিলে না, অমূল্য বাড়ুঁয্যের ছেলে শেষকালে নাকি পটুয়া? ছিঃ!" আমার তাহাতে কোনও কষ্ট হইত না, প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা একটা গর্ব্ব, একটা আনন্দ অনুভব করিতাম। সর্ব্বদাই মনে হইত যেন কোন দেবতার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি, এক রকম সন্ন্যাসীর মতনই থাকিতাম, কোন ভোগেই আমার বড় একটা আসক্তি ছিল না। সংসারে একমাত্র বন্ধন লতার পিসীমা ও লতা। লতার পিসীমাকে মা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে ছেলের মতই স্নেহ করিতেন, দিনান্তে একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, গোবিন্দ দাসের করচা ও বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম, আর তিনি চোখ বুজিয়া যেন ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেন। লতা তখন ছেলে মানুষ, মাঝে মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—আর আস্তে আস্তে প্রদীপের শলিতা বাড়াইয়া দিত। লতা বড় দুষ্টু মেয়ে কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিত। তাহার সকল দুর্দ্দান্তপনার মধ্যে যেন রসের খেলা দেখিতে পাইতাম, ভাল করিয়া বুঝিতাম না, তবুও ভাল লাগিত।

কত ছবি আঁকিতাম, নরনারী জীবজন্তু তরুলতা পাহাড়পর্ব্বত সকলই আঁকিতাম। যাহারা ছবি ভালবাসিত তাহারা বলিত—এ

অনেক জন্মের তপস্যার ফল। আমার প্রাণ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইত, এই রূপ-রস-গন্ধভরা বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক বিরাট অচল, অটল, অনন্ত সুন্দরের প্রাণ-তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যে ভাব, মনে হইত যেন ইহা আমারি আর কাহারও নহে, একমাত্র আমিই এই সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী। মনে করিতাম, এই প্রাণতরঙ্গকে বর্ণ-বদ্ধ করিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া রাখিয়া দিব। তখন যে সেই প্রাণসুন্দর প্রাণারাম আমার মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেন, আমি কি ছাই দেখিতে পাইতাম?

৩

লতা দিনে দিনে বাড়িতেছিল। একদিন তাহার সকল দুর্দ্দান্তপনার অবসান হইল, সে আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে না, বাহিরের কাহারও সঙ্গে বড়একটা কথা কয় না। তাহার চরণের চঞ্চলতা শুধু নয়নে নহে তরঙ্গের মত সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু কি গভীর নিশ্চল চঞ্চলতা, কি স্থির তরঙ্গের মূর্ত্তি! কি-জানি কেমন ঢল ঢল দোল দোল ভাব। তাহাকে দেখিলে সে সুন্দর কিনা, কি কতখানি কি, কি রকম সুন্দর, এরকম কোন প্রশ্নই মনে উদয় হইত না। গৌরবর্ণ, ডুটি টানা টানা ডাগর চোখ সুগোল সুললিত বাহুযুগল, মাথায় এক রাশ চুল কোমর ছাড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। একবার দেখিলে চোখ ফিরান অসম্ভব, আবার দেখিতেই হইবে।

সে এখন আস্তে আস্তে কথা বলিত, কিন্তু কথায় যেন সুধা বর্ষণ করিত। এখন আর সে গলা ছাড়িয়া দিয়া গান করিত না, সর্ব্বদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিত; কিন্তু কি মন-গলান স্বর! কি প্রাণ গলান সুর! কি মধুর ভাব-স্রোত! এখন যে তাহার "যৌবন নিকুঞ্জ বনে গাহে পাখী"!

তার শরীরের শিরায় শিরায় যেন শত শত রাগ রাগিণী বাজিয়া উঠিত, সে যেন সচকিত হইয়া তাহাই শুনিত! তাহার আশে পাশে যেন শত সহস্র ফুল ফুটিয়া থাকিত, সে যেন তাহারি গন্ধে বিভোর হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত জীবন যাপন করিত! তাহার প্রাণের মধ্যে কে যেন দোলনা বাঁধিয়া দুলিত, সে যেন তন্ময় হইয়া সেই ঝুলন দেখিত! একটা অভাবনীয় ভাবে সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, সে যেন শুধু সে ভাবেরই মধ্যে অন্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

একটা দুর্দ্দমনীয় স্রোত যেন সর্ব্বদাই তাহার বুকের ভিতর বহিয়া যাইত—সে যেন সে স্রোতেরি মধ্যে গা ভাসাইয়া দিয়া, কখনও ভাসিয়া যাইত, কখনও হাবুডুবু খাইত! আমি অবাক হইয়া দেখিতাম! মাঝে মাঝে চোখে জল আসিত, কিন্তু তাহার চোখে সে সময় জল দেখি নাই। সে যে লাবণ্যের ফুল স্রোতের তরঙ্গ, সে যে আগুনের ঝলক, ঝড়ের ঝাপ্‌টা। নিখিল বিশ্বের প্রাণে সে যেন একটা পাগলা সুর—কিছুতেই যেন স্বর গ্রামে সুর তান লয় ব্যক্ত হইয়া গীত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে যেন একটা পাগলা পাখী, দিবারাত্র পাখা ঝাপ্‌টাইত, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার উড়িবার আকাশ খুঁজিয়া পাইত না।

৪

আমার যে ছবি জ্ঞান, ছবি ধ্যান, আমি যে সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী। তোমরা হাসিও না, আমি যে তখন সত্য সত্যই তাই মনে করিয়া অপার আনন্দ পাইতাম। যেখানে ফুলটি ফুটিত, ফলটি দুলিত, গিরিশৃঙ্গ আপন মহিমায় হাসিয়া হাসিয়া উঠিত, গগনে জলদপুঞ্জ, আপনার গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আপনাকে আবৃত করিয়া ফেলিত, যেখানে সাগর আপনারি তরঙ্গের মালা আপনারি বুকে দোলাইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বহিয়া যাইত, আমি যে সেইখানে তখনই তাহাদের ছবি

আঁকিয়া লইতাম। কত শিশু, বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, কত তরলিত রত্নহারা পীবর-যৌবন-ভারাবনত-দেহা, কত তন্বি-শ্যামা শিখর-দশনা-পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠি, কত জীবন মধ্যাহ্নের প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, জীবন অপরাহ্নের বৃদ্ধ বৃদ্ধা আমার চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া বিরাজ করিত। কত সন্ন্যাসী, কত সন্ন্যাসিনী, কত দেব দেবী, কত বর্ণে বর্ণে আমার চিত্র-ফলকে ফুটিয়া উঠিত। আমি যেন স্থাবর জঙ্গম, জীব জন্তু সকলেরই প্রাণ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম! আমি মনে করিতাম আমার হৃদয় অনন্ত সুন্দরের পূজার মন্দির, আর জগৎ সংসারের রূপরাশি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ মাত্র! আমি ছবি আঁকিয়া সেই পূজার মন্দিরে অনন্ত সুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতাম!

উন্মাদের মত সমস্ত দিন ধরিয়া ছবি আঁকিতাম। ক্রমে ক্রমে মনের ভাব আরো গাঢ় হইয়া পড়িল, কি আঁকিতাম নিজেই জানি না, তন্ময় হইয়া ছবি আঁকিতে আঁকিতে দিনগুলি কাটিয়া যাইত। মাঝে মাঝে কখনও দিনমানে একবার কখনও দুইবার কখনও বারে বারে লতাদের বাড়ী যাইতাম, আবার ফিরিয়া আসিয়া ছবি আঁকিতাম। কি জানি কেমন একটা নেশার মধ্যে থাকিতাম, আমার যৌবনের সকল আগ্রহ অকাতরে বিনা চেষ্টায় ছবি আঁকার মধ্যেই ঢালিয়া দিতাম।

একদিন নিশাশেষে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম—আমি যেন একটা শ্যামল বৃক্ষ আর লতা যেন সোনালি রঙ্গের লতার মত আমাকে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতেছে! তখনই প্রভাত হইল, চমকাইয়া উঠিলাম, দেখিলাম আমার বুক কাঁপিতেছে, কপাল ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘরের চারিদিকে দেখি শুধু লতারি ছবি! অনেক দিন ধরিয়া শুধু লতারি ছবি আঁকিতেছিলাম! আমি ত জানিতাম না যে আমি শুধু লতারি ছবি আঁকিতেছিলাম, যত কল্পিত মূর্ত্তি আঁকিতেছিলাম সব লতারি মূর্ত্তি, লতা শো'য়া লতা বসা লতা দাঁড়ান,

প্রভাত সূর্য্য-করে বিভাসিত লতারি মুখমণ্ডল! সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে বাগানে বেড়া ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে লতা! মৃদু মধু স্বপ্নের মত চন্দ্রালোকে চুল এলাইয়া দিয়া, পুকুরের সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে লতা! অপরাহ্নে স্নান করিয়া জলদেবীর মত পুকুরের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে—সেও লতা! আবার দিবা দ্বিপ্রহরে সুশীতল ছায়া ঘেরা পল্লবকুঞ্জে ফুলের পাতার উপর অর্দ্ধশায়িতা—সেও লতা! লতা যে আমাকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ছিল, আমিতো বুঝিতে পারি নাই! এ যে দেখি লতা ধ্যান, লতা জ্ঞান,—চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হে অনন্ত-সুন্দর একি করিলে? আমি যে তোমার সন্ন্যাসী!" তখনি মনে হইল, লতাই যে সেই প্রাণ-সুন্দরের পূর্ণ বিগ্রহ! একি প্রেম ভালবাসা? ছিঃ! আমার মনে তো লতার জন্য কোন বাসনা ছিল না। একি স্নেহ? তাহাও নহে। লতা আমার অপূর্ব্ব শ্বেত-শতদল, মধুর নিষ্কলঙ্ক কাম-গন্ধ-বিহীন! আমি এই অপূর্ব্ব ফুলে অনন্ত সুন্দরের চরণযুগল সাজাইতেছিলাম, আমি যে আর সকল বিগ্রহ ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই নব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। তাই লতা ধ্যান, লতা জ্ঞান, আমি সেই প্রাণসুন্দরেরই সন্ন্যাসী। তোমরা হাসিও না, আমি যথার্থই তাই ভাবিতাম।

৫

লতাদের বাড়ীতে আসাযাওয়া আমার সেইরকমই চলিতে লাগিল। লতার আরও অনেক ছবি আঁকিলাম। মনে করিলাম এ দুরকমের বিগ্রহ! লতা যেন একেবারে জাগ্রত বিগ্রহ, আর ছবিগুলি যেন একই বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কখনও মনে হইত জাগ্রত, চিত্রিত—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই যেন প্রাণসুন্দরের ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ। আবার কখন মনে হইত এই সব মূর্ত্তিগুলি মিলিয়া মিশিয়া একটি মূর্ত্তি হইয়াছে, আর তাহারই মধ্যে আমার

হৃদয়-মন্দিরে যেন অনন্তসুন্দর প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপে আমার প্রাণের মধ্যে আমার প্রাণ-সুন্দরের পূজা চলিল। সেই ছবিগুলি কাহাকেও দেখাইতাম না, লতাকেও দেখাই নাই। সে-গুলি যেন আমার গোপন মন্ত্র। আমি যে সাধক, মন্ত্র-গুপ্তী না শিখিলে কি সাধনা সফল হয়? এক একবার খুব ইচ্ছা হইত যে শুধু লতাকেই এই ছবিগুলি দেখাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বাসনা দমন করিতাম।

লতা এতদিন একটু একটু করিয়া নিজেনিজেই লেখাপড়া শিখিত। কখন কখন আমার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইত। আমি তাহাকে পড়া বুঝাইয়া দিয়া ও তাহার ছবি আঁকিয়া পরম আনন্দ পাইতাম। জীবনটা বড় মিঠে লাগিত! এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

লতার পিতা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বাড়ীতে থাকিতেন, কিন্তু কাহারও সহিত বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। আমি তে: রোজই সেই বাড়ীতে যাইতাম, কিন্তু দুই একবার ছাড়া কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একদিন লতা বলিল, "বাবার খুব জ্বর, বোধহয় আর বাঁচ্‌বেন না।" আমি তাঁর ঘরে গিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ জ্বরে অচৈতন্য—একেবারে হুঁস্ নাই। লতার গহনা বিক্রয় করিয়া তাহার পিতার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। লতা আর কাহা-কেও কিছু করিতে দিত না, সে নিজেই সেবার সব ভার লইল। স্নান আহার ঘুম সব ছাড়িয়া প্রাণ দিয়া পিতার সেবা করিতে লাগিল। এরূপ অদ্ভুত সেবা আমি আর কোথাও কখন দেখি নাই। এ যে লতার এক নূতন মূর্ত্তি! ধীর, শান্ত, হাসি-হাসি মুখে সকল কষ্ট সহ্য করিত। আমি দেখিলাম যেন এক নবীন সন্ন্যাসিনী কোন এক কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপে প্রায় একমাসকাল কঠিন পীড়ায় ভুগিলেন। একদিন ভোর বেলা তখন তাঁর জ্ঞান ছিল, কথা কহি-

বার শক্তি ছিল না, লতা ওষুধের গেলাস মুখের কাছে ধরিলে তিনি মাথা নাড়িলেন, খাইলেন না। লতাকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন। তাহার মাথার উপর কোন রকমে যেন মনের জোরে আপনার শীর্ণ হাতখানি রাখিলেন। পরমুহূর্ত্তেই প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

লতার পিসীমা মাটিতে পড়িয়া "আমার লতির কি হবে গো" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লতা দেখিলাম বেশ শান্ত ধীর গম্ভীর। চোখে জল আসিলেই আঁচল দিয়া চোখ পুঁছিয়া ফেলে। তাহার মুখে চোখে একটা নূতন ভাব দেখিতে পাইলাম। তাহার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল।

লতা পিতার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেল, ধীর শান্তভাবে মুখাগ্নি করিল। তারপর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সে কয়েকদিন লতার বড় একটা খোঁজ পাই নাই। সে যেন একটু তফাত তফাত থাকিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত তাহাকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু কাছে গেলে কোন ছুতায় সে সরিয়া যাইত। মনে হইত সে ধরা দিতে চাহে না—যেন সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন নিজের মনের ভিতর জীবনের সমস্ত আগ্রহভরে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এ'ও এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

শ্রাদ্ধের পরে একদিন দুপুর বেলা লতাকে যেন একটু অস্থির দেখিলাম। তাহার পিসীমা ও আমি একখানে বসিয়াছিলাম, সে সেই-খানে আসিয়া বসিয়া পড়িল। সে আমাকে ছেলেবেলা হইতেই 'তুলিদাদা' বলিয়া ডাকিত। বলিল, "তুলিদাদা, আমি কি করব? আমি ত কিছুতেই মন বাঁধ্‌তে পারছি নে—সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।" মা বলিলেন, "মা গো, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া আর কি আছে?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম; লতা মৃদুহাস্য করিল। বলিল, "আমিও কোন দিন সধবা ছিলাম না, বিধবা হইলাম কি করিয়া? আমি সধবাও নয় বিধবাও নয়, আমি যে অধবা।" সেই হাসির মধ্যে একটা অসীম বেদনার আভাস পাইলাম। তাহার কথা-

গুলির মধ্যে যেন একটা প্রাণস্পর্শী বিদ্রূপ, একটা মর্ম্মান্তিক বেদনার ভাব জাগিয়াছিল। আমি অবাক হইয়া নীরব রহিলাম। লতাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, "তুলিদাদা, আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শেখাও।" আমি বলিলাম, "তুমি ত লেখাপড়া জান। তুমি ত বাঙ্গলা বই সবই পড়িতে পার।" সে বলিল, "আমি ইংরাজী সংস্কৃত সব শিখিতে চাই—আমি ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌ব।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আমি যতটা পারি তোমাকে শেখাব।"

তারপর তাহাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিখাইতে লাগিলাম। সে খুব সহজেই শিখিয়া লইতে লাগিল। এই রকম করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন দেখিলাম আমার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি এখনও সেই সুন্দরেরই পূজা করি, শুধু আমার চিত্রিত বিগ্রহগুলি সহজে অনায়াসে মন্দিরচ্যুত হইয়া পড়িল। এখন প্রাণসুন্দরের জীবন্ত বিগ্রহ—লতা ও তাহার নব নব মূর্ত্তি।

৬

আমি তখন দিবানিশি মুরতি-স্রোতে ভাসিতেছি। লতার শৈশবের, প্রথম যৌবনের শত শত মূর্ত্তি আমাকে বিভোর করিয়া রাখিত। আমি নব নব ভাবে, নব নব মন্ত্রে, নব নব বিগ্রহে আমার সেই প্রাণসুন্দরেরই পূজা করিতাম। এখন আমার অধিকাংশ সময় লতাদের বাড়ীতেই কাটিত।

একদিন বিল্বমঙ্গল নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। লতা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পড়া শেষ হইলেই বলিল, "তুলিদাদা আমাকে থিয়েটারে লইয়া যাও—আমি অভিনয় দেখিব।" সেই সঙ্গে সঙ্গেই মা বলিয়া উঠিলেন, "আমিও যাইব।" আমি দুইজনকে লইয়া বিল্ব-মঙ্গল দেখিতে গেলাম। লতা অতি সহজেই অনেক কথা ও গান আদায় করিয়া লইল। বলিল, "কি চমৎকার! আমি আবার যাব।" তারপর অনেকবার তাহাদের লইয়া থিয়েটারে গিয়াছিলাম। লতা

যাহা দেখিত তাহাই অভিনয় করিত। সব চরিত্রগুলিই একেবারে জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিত। মনে হইত লতা যেন লতা নয়, যাহা অভিনয় করিতেছে তাই। সে একেবারে তন্ময় হইয়া তাহাদেরই মধ্যে ডুবিয়া যাইত। কি অদ্ভুত স্থষ্টি! কি অপূর্ব্ব রসের স্ফূর্ত্তি! কি জাগ্রত জীবন্ত অভিনয়! আমি সেই নব নব রসমূর্ত্তির মধ্যেই যেন জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "হে প্রাণসুন্দর, তোমার কি মূর্ত্তির অন্ত নাই!" পরক্ষণেই মনে মনে ভাবিলাম, আমার প্রাণসুন্দর যে অনন্ত সুন্দর, তাঁহার যে অনন্ত মূর্ত্তি!

একদিন সূর্য্য ডুবু ডুবু। লতা ও আমি একখানি নূতন প্রকাশিত পুস্তক পড়িতেছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম, লতা দেখিতেছিল আর শুনিতেছিল। তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালান হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বাভাস কোমল ছায়ার মত ভাসিতেছিল। কেমন করিয়া জানি না আমাদের হাতে হাত ঠেকিল। মৃদুমন্দ মধুর বাতাসে লতার চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া আমার মুখে চোখে পড়িতে লাগিল। আমার শরীরের রক্তস্রোত যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। লতার মাথা আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল—আমি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই চৈতন্য হইল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "এ কি করিলে প্রাণসুন্দর—বাসনা কি এমন অন্তঃসলিলা হইয়া লুকাইয়া থাকে? আমার যে পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল!" লতার চক্ষু দেখিলাম—একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। শরীর অসাড়, নিশ্বাস পড়ে না। কে আমার কানে কানে বলিল "পালা, পালা।" আমি আপনাকে ছিঁড়িয়া লইয়া একদৌড়ে বাহির হইয়া পড়িলাম। চক্ষে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না, কোনরকমে একেবারে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঘরে দেখিলাম প্রদীপ জ্বালা, সন্ধ্যা হইয়াছে। আমার প্রাণে অনন্ত অন্ধকার। আমি না সাধক? আমি না সন্ন্যাসী? লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এ প্রাণ

আর রাখিব না। কতক্ষণ কাটিয়া গেল জানি না কোথা হইতে প্রাণে একটা বল আসিল। উঠিলাম—সব ছবিগুলি আগুনে পুড়াই-লাম। কত যত্নে আঁকা কত সাধের ছবি! প্রাণসুন্দরের কত কত বিগ্রহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমি পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। তারপর প্রাণে প্রাণে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; সূর্য্য ওঠে নাই—কিন্তু তাহার রঙ্গীন আভাস বুকে করিয়া আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কোথায় গেলাম কেমন করিয়া বলিব? যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকেই চলিলাম। কত দেশ পর্য্যটন করিলাম, কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিলাম। কত পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইলাম, কত তীর্থস্থানে সন্ন্যাসী সাজিয়া বাসা বাঁধিলাম! কই যাহাকে ছাড়াইতে চাই সে ছাড়ে কই? সে যে আমার শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে নাচিয়া উঠে, সে যে আমার প্রাণে প্রাণে প্রত্যেক ভাবের মধ্যে হাসিয়া উঠে! এত বাসনা, এত চুম্বন পিপাসা, এত আলিঙ্গন লালসা, কেমন করিয়া আমার প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া ছিল আমি ত জানিতাম না! চোখ মেলিলেই সব অন্ধকার দেখিতাম, চক্ষু বুজিলেই সে যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিত! আমি যতই নিবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া নিবৃত্ত হইতে চাহিতাম, ততই যেন সাপের মত জড়াইয়া জড়াইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিত! মুখে মুখ লাগাইয়া আমার হৃদয়-শোণিত পান করিত, আমি বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতাম। আমি মুখে যতই দেবতা দেবতা বলিয়া ডাকিতাম, প্রাণের মধ্যে ততই কে যেন লতা লতা বলিয়া ডাকিয়া উঠিত, আর তাহার প্রতিধ্বনি লতা লতা বলিয়া আমাকে উপহাস করিত! সে যে রাক্ষসীর মত আমার দেহ মন প্রাণ সব গিলিয়া ফেলিয়াছিল! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন করিয়া একটি বৎসর চলিয়া গেল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে

পারিলাম না। মাঝে মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রাণসুন্দরকে ডাকিতাম। বলিতাম "হে প্রাণসুন্দর! আমার কি কোন উপায় নাই?" কোন সাড়া পাইতাম না! আকাশে বাতাসে শুধু 'নাই নাই' ধ্বনি শুনিতাম! কষ্টে, দুঃখে, নিরাশায়, অনশনে, অনিদ্রায় আমার দেহ মন একেবারে শুখাইয়া উঠিল। আমার হৃদয় তখন শ্মশান, মহাশ্মশান! লতা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত আমার হৃদয়-শ্মশানে দিবানিশি বিকট হাস্য করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে মনে ভাবিতাম, কেন্ আসিলাম, আমার যে সব শ্মশান হইয়া গেল, আমি ফিরিয়া যাই! পারিলাম না, মনে মনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম প্রাণসুন্দর ত আমাকে লইলেন না, আমি এ নিরর্থক প্রাণ আর রাখিব না—তাঁহারই চরণে বিসর্জ্জন দিব। তখন বৃন্দাবনের কাছে একটা জায়গায় কুটীর বাঁধিয়া থাকিতাম। অদূরে যমুনা। সব আশা শেষ হইয়া গিয়াছে, কেন আর বৃথা ভার বহন করি? গভীর রাত্রে উঠিয়া যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। কে যেন পিছন থেকে বলিল, "পাগল!" আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "পাগল!" চমকিয়া উঠিলাম! পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কে তুমি?" আবার শুনিলাম, "পাগল!" আমি কি পাগল? এ-তো স্বপ্ন নয়! কল্পনা নয়! আবার শুনিলাম, "পাগল! পাইয়া ছাড়িতেছিস? লতা যে সত্য সত্যই প্রাণ-সুন্দরের বিগ্রহ। লতাই তোর ইষ্ট মন্ত্র। ফের, ফের, জপ কর, ধ্যান কর।" আমি নতজানু হইয়া ডাকিলাম। বলিলাম, "তুমি যেই হও, আমার সঙ্গে প্রতারণা করিওনা। এস এস আমার চোখের কাছে এস, আমি তোমাকে একবার দেখিব!" কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার সর্ব্ব শরীর তখন কাঁপিতেছিল। দূর হইতে একটা হাসির রব ভাসিয়া আসিতেছিল! সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন আগুনের মত জ্বলিতেছিল।

কোথা হইতে প্রাণে বল আসিল জানি না—কে যেন আমাকে হাতে ধরিয়া ফিরাইয়া লইল। কুটীরে ফিরিলাম। লতা-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম—লতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। পাঁচ বৎসর যেন এক রাত্রির মত কাটিয়া গেল। কোথা হইতে আহার আসিত জানি না, কে খাওয়াইত জানি না, কে দেখিত জানি না। কি দেখিলাম? কি পাইলাম? কেমন করিয়া বলিব? আমি যে সব দেখিলাম, সব পাইলাম।

মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল। শেষে দেখিলাম মন্ত্র দিবারাত্র আপনি চলিতেছে। একটা বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম। দেখিলাম দিনে দিনে আমার বাসনাগুলি শুষ্ক পত্রের মত আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। তারপর ধ্যান আরম্ভ করিলাম। লতার শত শত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলাম। দিবা-রাত্র মূর্ত্তি-ধ্যান। চোখে আর কিছুই ভাসে না, মনে আর কিছুই আসে না, শুধু লতার শত শত মূর্ত্তি! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ছায়াময় হইয়া যাইতে লাগিল। একটা অগাধ অনন্ত ছায়া—আর তার মধ্যে যেন আমি আর শত শত লতা! ক্রমে ক্রমে সেই শত শত মূর্ত্তি মুছিয়া গেল। শুধু একটি অপূর্ব্ব আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখা দিল! সে কি লতা? সে কি দেবতা? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড টলমল করিয়া উঠিল—মন-সাগরে স্বপ্নবৎ ভাসিতে লাগিল! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ সব লুপ্ত হইয়া গেল! শরীর খসিয়া পড়িল! আমি আর আমার দেবতা, আর কেহ নাই, আর কিছু নাই! কত ভাব, কত অনুরাগ কত রসের খেলা! শুধু ভাব, শুধু রসলীলা! শুধু আনন্দে জড়া-ইয়া আমি আর তুমি! তুমি-কৃষ্ণ, আমি-রাধা, আমি-কৃষ্ণ, তুমি-রাধা! কি মধুর সম্ভোগ, কি অনন্ত বিরহ, কি আনন্দের লীলা! তখন বলিলাম—হে প্রাণ-সুন্দর! কেন আমি তুমি? কেন আমি, কেন তুমি? কেন তুমি, কেন আমি? কেন এক হইয়া ব্যবধান! আমি ডুবিব ডুবিব! আমাকে তোমার মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দাও!

তার পর কোথায় গেল আমি, আর কোথায় গেল তুমি! আমি ত ডুবিলাম, প্রাণসুন্দরও ডুবিয়া গেল! শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ! আমি নাই তুমি নাই, কেহ নাই, শুধু আনন্দ! শুধু প্রেম, প্রেম, প্রেম!

সেটা কি? কেমন করিয়া বলিব? সে যে মহাভাব? দেখিতেছ না, আমার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া আছে? চোখ স্থির হইয়া আসিয়াছে? আমি যে এখনি ডুবিয়া যাইব! এই মহানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলাম। কখন একেবারে ডুবিয়া যাইতাম, কখন আমি তুমি হইয়া ভাসিয়া উঠিতাম! আমিই এক হইয়া প্রেম হইয়া যাইতাম, আবার লীলানন্দে মাতিয়া দুই হইতাম! আবার ধীরে ধীরে আপনাকে নামাইয়া আনিতাম, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় এই নিখিল বিশ্বের লীলাতরঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ পাইতাম! স্থাবর জঙ্গম জীব জন্তু সবই যে আমার মধ্যে! সকল লীলা যে আমারই লীলা! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

একদিন প্রভাতে শুনিতে পাইলাম লতা আমাকে ডাকিতেছে। দেখিলাম লতা অভিমান করিয়া আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে! মনে মনে বলিলাম, "মানময়ি, আর আত্মহারা হইয়ো না—জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়ো না, আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি!

লতা যে আমার প্রাণ-সুন্দরের জাগ্রত বিগ্রহ!

৮

কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম "লতা দেবী" সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়ের নামজাদা অভিনেত্রী। তাহার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইল না—বরানগরের কাছে গঙ্গার ধারে। সন্ধ্যার আগেই তাহার বাড়ীতে গেলাম। লতার গলা শুনিতে পাইলাম, সে বারাণ্ডায় বসিয়া গান গাহিতেছিল। দ্বারোয়ান আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া আটকাইল না। বলিল, "খবর দেগা?" আমি বলিলাম, "নেহি।"

সিঁড়ী দিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলাম। গঙ্গার কুলু-কুলু ধ্বনির সঙ্গে লতার সুর মিশিয়া যাইতেছিল। আমি আস্তে আস্তে গিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলাম। লতা একমনে গাহিতে-ছিল, অনেকক্ষণ আমাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়া গান বন্ধ করিয়া দিল। বলিল, "আপনি কে? বসুন।" আমি বলিলাম, "আমি সন্ন্যাসী"। আমার পা দুখানি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলাভরা দেখিয়া লতা একজন দাসীকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "ইনি মুখ হাত ধোবেন। এঁকে নিয়ে যা।" আমি তার সঙ্গে চলিলাম। দু'তিন খানি ঘর পার হইয়া হাত পা ধোবার ঘর—সেই ঘরে গেলাম। দেখিলাম লতার বাড়ী বাস্তবিকই বিলাস-ভবন। বাড়ীর নামও "বিলাস-ভবন"—যেমনি নাম তেমনি বাড়ী। মুখ হাত পা ধুইয়া আবার সেই বারাণ্ডায় আসিলাম। লতা গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল, আমি তাহার কাছে একখানা চেয়ারে বসিলাম। খানিকক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করিয়া ছিলাম। আমি হঠাৎ বলি-লাম, "লতা আমাকে ডাকিয়াছ কেন?" সে অবাক হইয়া খানিক-ক্ষণ আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর "তুলিদাদা, তুলিদাদা" বলিয়া চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জল লইয়া তাহার মুখে চোখে ছিটাইলাম। তার কপালে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে সে চোখ মেলিল। আবার চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমাকে ছুঁয়োনা, আমি অপবিত্র। আমি আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছি। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে? কেন তুমি আমাকে মধুর আস্বাদ দিয়া, আমার প্রাণ-পাখীকে মধুর পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলে? আমাকে যে আধার দেবার কেহ ছিল না! তুমি কি জান না আমি শৈশব হইতে লতারই মত তোমাকে জড়াইয়া জড়াইয়া বাড়িতে-ছিলাম।" দেখিলাম, বলিতে বলিতে সে রাগে অভিমানে একেবারে

ফুলিয়া উঠিয়াছে—যেন সহস্র সর্পিণী একাধারে সহস্র ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলাম, "স্থির হও।" লতা মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গের মত মস্তক নত করিল। শয্যা হইতে নামিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "লতা আমি যে তোমার প্রেমেই সব হারাইতে বসিয়াছিলাম—আবার তোমার প্রেমেই প্রাণ-সুন্দরের দেখা পাইয়াছি। আমি যে তোমার ডাক শুনিয়া প্রেমের আনন্দ ঠেলিয়া ফেলিয়া তোমাকে আনন্দ দিবার জন্য আনন্দ বারতা লইয়া আসিয়াছি।" লতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "অভিমানিনি! আগে তোমার সব কথা বল। তারপর তোমাকে আনন্দধামে লইয়া যাইব।"

লতা বলিতে লাগিল, "তুমি চলিয়া গেলে প্রথম ভাবিলাম আবার আসিবে। দিনের পর দিন গেল, একেবারে একা অসহায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। জীবনটা একেবারে শূন্য হইয়া গেল। খুব যত্নে পিসী-মার সেবা করিতে লাগিলাম। ভূতের মত সংসারে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই সে শূন্য পূরণ করিতে পারিলাম না। আমার কপালগুণে পিসীমাও টেঁকিলেন না—একদিনের জ্বরে চলিয়া গেলেন। তখন তোমাকে কত ডাকিলাম, তুমি আসিলে না। তারপরে একদিন ভোর হইবার আগেই বাহির হইয়া পড়িলাম। যে থিয়েটারে এখন কাজ করি, সেই থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি চাও?" আমি বলিলাম, "আমি থিয়েটারে অভিনয় করিব।" "পারিবে?" আমি বলিলাম, "পারিব।" তাঁহাকে গান ও দুই একটা অভিনয় করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ! খুব সুন্দর!" তারপর খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মা, এ পথে যে বড় কাঁটা!" আমি বলিলাম, "আমি কাঁটার ঘা খাইতেই আসিয়াছি।" তিনি একটু হাসিলেন।

"তারপর থেকে আমি থিয়েটারের অভিনেত্রী। আমার সমস্ত

জীবনযাপন যেন স্বপ্নের মত মনে হইত। শুধু যখন অভিনয় করিতাম তখন জাগিতাম—মনে হইত তোমার কাছে অভিনয় করিতেছি। আবার থিয়েটারের বাতি নিভিলেই সব স্বপ্নের মত মনে হইত! সে স্বপ্নের মধ্যে শুধু একটা ভাব, আগুনের মত জ্বলিত—তোমার উপর রাগ ও অভিমান। আমি প্রমোদে গা ঢালিয়া দিয়াছি। কেন জান? শুধু তোমার উপর রাগ করিয়া। কেন তুমি আমায় ফেলিয়া গেলে?"

আবার দেখিলাম সে অভিমানে ফুলিতেছে, তাহার চোখ জ্বলিতেছে। সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আরও শুনিতে চাও? আমি যে তোমার পরশেই ফুটিতেছিলাম। কেন আমার সব ফোটা বন্ধ করিয়া দিলে? কে যেন আগুনের অক্ষর দিয়া আমার প্রাণের মধ্যে লিখিয়া দিল, 'যার জন্য সব রাখিয়াছিলি সে যে তোকে পরিত্যাগ করিয়াছে।' আমি রাগে অপমানে অভিমানে পাগল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিলাম। শুধু তোমারই জন্য যাহা ফুটিতেছিল, তুমি তুচ্ছ করিলে আমি কুকুর বিড়ালকে বাঁটিয়া দিলাম। আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া হাসিতে হাসিতে পুড়িতে লাগিলাম। আমার হৃদয় যে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছিল, কেউ দেখিতে পায় নাই! আমার কথা বিশ্বাস করিও। আমি প্রলোভনে পড়িয়া আত্মহারা হই নাই—আমি অভিমানে আত্মঘাতিনী—কলঙ্কিনা, পাপিষ্ঠা, আত্মঘাতিনী। কিন্তু কে আমার এ দশা করিল? তুমি! আমি ত তোমার কাছে কিছু চাই নাই!—আমি যে তোমাকে শুধু দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে জীবন কাটাইতে পারিতাম! এখন—একেবারে অসহ্য হইয়াছে, তাই তোমাকে পাগলের মত ভাবিতেছিলাম।"

লতা নীরব, আর কথা বলিতে পারিতেছিল না। আবার সেই ভাব, অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "না, না, তুমি ত কলঙ্কিনী নও! আমি তোমার হৃদয় দেখিতেছি, দুই একটা আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র। তোমার সমস্ত পাপ সমস্ত কলঙ্ক

আমি লইলাম। আমি তোমাকে আনন্দের পথে লইয়া যাইব।” লতা যেন অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তাহার জীবনের সমস্ত নৈরাশ, সমস্ত তীব্রতা যেন সেই হাসির মধ্যে লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিল! আমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলাম। লতা চমকিয়া উঠিল বলিল, “তুমি কি?” আমি বলিলাম, “আমি সাধক, তোমারই সাধক। তুমি ত আপনাকে পাও নাই, আমি পাইয়াছি। কাল প্রাতে তোমার ছবি আঁকিয়া দেখাইব।”

৯

আমি সে রাত্রে ঘুমাই নাই। লতার প্রকৃত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-ছিলাম। যে মূর্ত্তি আমার ধ্যানের মধ্যে অনেকবার দেখিয়াছি, সে মূর্ত্তি আবার ধ্যান করিলাম। ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল—উজ্জ্বল প্রাণসুন্দর মূর্ত্তি! এই ত প্রাণসুন্দরের বিগ্রহ, কোথায় কলঙ্ক, কোথায় কালিমা?

প্রভাত হইতে না হইতে গঙ্গায় স্নান করিলাম। ছবি আঁকি-বার জিনিসপত্র আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম—সেগুলি লইয়া উপরে গেলাম। তখন সেই প্রাণসুন্দর মূর্ত্তি আমার বুকের মধ্যে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল।

লতা স্নান করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি জিনিসপত্রগুলি সাজাইয়া রং ঠিক করিলাম। তুলি হাতে করিয়া বলিলাম, “লতা, আমার দিকে চাও।” সে চাহিল—খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, “আমি যে আর চাহিয়া থাকিতে পারি না” আমি বলিলাম, “আবার চাও, আবার চাও!” আমার সমস্ত শক্তি দিয়া সেই আনন্দ মূর্ত্তি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চার করিতে লাগিলাম।

তারপর ছবি আঁকা আরম্ভ হইল। রেখায় রেখায় তাহার শরীরের কাঠাম গড়িয়া উঠিল। বর্ণে বর্ণে তাহার রং ফুটিয়া উঠিতে

লাগিল। এইবার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলাম। স্নেহ করুণা, মায়া মমতা, ঝলকে ঝলকে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক একবার লতা চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল, "এ-তো আমি নই, এ-তো আমি নই! সন্ন্যাসি, মিথ্যা আঁকিও না! এ যে করুণাময়ী! আমি ত জন্মে কাঁদি নাই!" আমি বলিলাম, "কাঁদ নাই? শৈশবের কথা ভুলিয়া গিয়াছ। কাঁদিয়াছ, আবার কাঁদিবে। তারপর হাসিবে। আমার দিকে চাও। আবার স্থির হইয়া চাও।" তাহার পর পবিত্রতা রেখা ও বর্ণে মিলিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কলঙ্কের ছায়া শুদ্ধ পবিত্র উজ্জ্বল আলোকে মিলিয়া গেল। হৃদয়ের দাগগুলি, যাহা মুখে ছায়া-রেখার মত পড়িয়াছিল, কোথায় ভাসিয়া গেল।

আবার লতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও কি? ও কি? এ যে শুভ্র শুদ্ধ পবিত্র কুসুম! আমি যে কলঙ্কিনী! এই ছবি যে বৃশ্চিকের মত আমাকে দংশন করিতেছে!" আমি বলিলাম, "তোমার যে সব কলঙ্ক আমি নিয়াছি। তুমি ত আর কলঙ্কিনী নও। আমার দিকে চাও, আবার চাও। তুমি এই ছবিরই মত শুভ্র সুন্দর পবিত্র।"

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "আজ থাক। আবার কাল আসিব।"

তখনও ছবিতে আনন্দমূর্ত্তি ফোটে নাই। সে রাত্রে আবার একনিষ্ঠ হইয়া তাহার আনন্দমূর্ত্তি ধ্যান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিয়া আবার আঁকিতে লাগিলাম। এবার রেখার আঁকে আঁকে, রংএর আভায় আভায় আনন্দ ফুটিতে লাগিল। সেই সুন্দর শুদ্ধচিত্ত পবিত্র মুখের উপরে আনন্দের আভা ভাসিতে লাগিল। সখী-ভাব, দাসী-ভাব, ভক্তের আকিঞ্চন সকলই যেন মূর্ত্ত হইতে লাগিল। সেই করুণার রেখা আজি করুণারূপিণী দেবী হইয়া ফুটিয়া উঠিল! যেন সে করুণার প্রস্রবণে জগৎ ভাসাইয়া দিতে পারে। সেই স্নেহ-মমতা জননীরূপে অনন্ত মহিমায় জাগিয়া উঠিল।

যেন তার রক্তের ক্ষীরধারায় জগতের ক্ষুধা মিটাইতে পারে। সেই অভিমান যাহার রেখা পুঁছিয়া দিয়াছিলাম, সেই অভিমানকে নিত্য-ধামে উঠাইয়া আঁকিলাম; এখন যে লতা বৃন্দাবনের মানময়ী রাধিকা। কোথায় রাগের আগুন, কোথায় বিষের জ্বালা! এ যে প্রেমভরা মান, স্বার্থহীন বাসনাবিহীন উজ্জ্বল প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিল। তারপর রাধিকারই গদগদ ভাব ফুটাইয়া তুলিলাম। প্রেম-ময়ী রাধিকা অনন্ত-বিরহ-কাতরা—যেন কৃষ্ণ-অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াও কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলিয়া কাঁদিতেছে!

লতা এক একবার 'ও কে? ও কে?' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। আমি কিছু না বলিযা আঁকিতেছিলাম। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তন্ময় হইয়া আমারই ধ্যানের মুর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিলাম। লতার প্রাণের ছবি শেষ হইল। আমি অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলাম। আমার চোখ জলে ভরিয়া গেল! তারপর প্রণাম করিয়া বলিলাম, "লতা ছবি শেষ হইয়াছে, কাছে আসিয়া দেখ, স্থির হইয়া দেখ। আপনাকে দেখিয়া লও।" লতা দেখিল। তাহার চোখে দেখিলাম নূতন ভাব ছল ছল করিয়া উঠিয়াছে! লতা অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "এই আমি আমি? আজি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! এই কি আমি!" তাহার কথাগুলি যেন চোখের জলে ভেজা ভেজা। আমি বলিলাম, "এই ত' তোমার প্রাণের ছবি। ওই যে বাঁশীর ডাক। তুমি ত আমাকে চাও নাই! তুমি যে জীবন ভরিয়া চাহিয়াছিলে মদনমোহনকে! ওই যে মদনমোহন! ওই যে বৃন্দাবন! ওই শুন বাঁশীর ডাক! তোমার যে শেষ অভিনয় ওইখানে!" লতা আবার ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তার-পর সেই বারাণ্ডার মেজেতে উপুড় হইয়া শুইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অস্তপ্রায় সূর্য্যের আলো কোমল হইয়া জ্বলিতেছিল। সেই রাঙ্গা কোমল

আলো, তাহার চুলের উপর পিঠের উপর পায়ের উপর গৌরবের মত ছড়াইয়া পড়িল।

আমার নয়ন স্থির; তুলি হাতে সেই ছবির কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বোধ হয় আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলাম।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

[৯]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৪

[প্রথম বর্ষের, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩২২ সালের ভাদ্র সংখ্যার "নারায়ণের" ১১১৬ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত মোটের উপরে আমরা প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মসাধনেরই আলোচনা ও উপদেশ প্রাপ্ত হই। ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম-তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মযোগে ও পরমাত্মার উপাসনাতে যে পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আমার ভজনাতে তাহা পাওয়া যায়, এইভাবে শ্রদ্ধাশীল হইয়া আমার ভজনা যে করে, সেই যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—"স মে যুক্ততমো মতঃ"—ইহাই আমার মত, এখানেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে এই দাবী করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ কে?

এই প্রশ্নের উত্তরেই যেন ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন—

ময্যাসক্তমনঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥

"হে পার্থ! আমাতে একৈকচিত্ত হইয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগাভ্যাস করিলে, যেরূপে সর্ব্বসংশয়াতীত হইয়া, আমাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শোন।"

জ্ঞানের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়েও বলা হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে সকল সংশয় দূর হয়, সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, এবং সমগ্ররূপে পরম তত্ত্বকে জানিতে পারা যায়, এখনও সে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয় নাই। ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ কিরূপে লাভ করিতে পারা যায়, তার কথা বলা হইয়াছে। পরমাত্মার কথাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মেতে বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় হয়। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-আদি হয়, এই ভাবেই উপনিষদ মুখ্যভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পরমাত্মাকে পাইতে হইলে আত্মতত্ত্বেতে নিমগ্ন হইতে হয়। বাহির হইতে ভিতরে আসিতে হয়। যাবতীয় অনাত্মবিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া, আপনার শুদ্ধ দ্রষ্টৃস্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। ব্রহ্মাণ্ড যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ; এই অস্মদ-প্রত্যয়বাচক আত্মবস্তু,—যাহাকে আমরা সতত আমি, আমি বলি, যাহা দ্রষ্টা-শ্রোতা-ভোক্তা-অনুমন্তারূপে আমাদের মধ্যে থাকিয়া, আমাদের জীবনের সকল জ্ঞান ও ভোগ সম্ভব করিতেছে, যাহার মধ্যে আমাদের চঞ্চল অনুভব-প্রবাহের স্থায়ীত্ব, জীবনের একত্ব প্রতিষ্ঠিত,—সেই আত্মাই পরমাত্ম-জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যদিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-আদির হেতুরূপে যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই, তিনি আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার একদেশ মাত্র অধিকার করিয়া আছেন। নিজের আত্মার মধ্যে, পরমাত্মারূপে যাহাকে প্রাপ্ত হই, তিনিও এই অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার আর একদেশ মাত্র পূর্ণ করিয়া আছেন। ঐ ব্রহ্মকে যদি সমগ্র-তত্ত্ব-রূপে ধরিতে যাই, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদে যাইয়া পড়ি। কারণ,

ঐ ব্রহ্মকে কেবল তটস্থ লক্ষণার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ জগতের জন্ম-স্থিতি-লয়ের অপ্রত্যক্ষ কারণরূপেই কেবল এই ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানগোচর হন। তিনি আছেন, এইমাত্র বলিতে পারি। ফলতঃ "তিনি" এই সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত সত্যভাবে তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায় না। তাঁহাকে উপনিষদ এইজন্য "তৎ"-তাহা বলিয়াছেন। সর্ব্বদা "তিনি" বলিতে পারেন নাই। ইংরাজিতে এই ব্রহ্মতত্ত্বকে আমরা He বলিতে পারি না, That বলিয়া থাকি। ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) যাহাকে Unknown এবং Unknowable, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়াছেন, কোনও কোনও দিক্ দিয়া বিচার করিলে, আমাদের প্রাচীনতম ব্রহ্মতত্ত্বও তাহাই। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে কেনোপিনিষৎ ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—

ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।

আমরা তাঁহাকে জানি না। কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে ন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

তিনি জ্ঞাত হইতে ভিন্ন, অজ্ঞাত হইতে শ্রেষ্ঠ—যেসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে আমরা এইরূপই শুনিয়াছি।

অস্তীতি ব্রুবিতি কথং তদুপলভ্যতে।

ব্রহ্ম আছেন—এই মাত্রই বলিতে পারা যায়। তাঁহার উপলব্ধি হইবে কিরূপে?

এসকলই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল ও প্রাচীনতম কথা। ক্রমে এই ব্রহ্মশব্দ আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছে, সত্য। বাহিরে, বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডে, পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া, তাঁহাকে সেখানে ধরিতে না পারিয়া, প্রাচীন ব্রহ্মসাধকেরা নিজের আত্মার মধ্যে সকল সত্তার ও জ্ঞানের মূলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, এই ব্রহ্মকেই

আত্মারূপে ভজনা করিয়াছেন, সত্য। কিন্তু এই আত্মাকেও তাঁহারা কেবল সাক্ষীরূপেই দেখিয়াছেন,—

সাক্ষীশ্চেতা নির্গুণশ্চ

তিনি সাক্ষীচৈতন্য ও নির্গুণ,—এইভাবেই পরম-তত্ত্বকে আত্ম-তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইজন্য পরমাত্মার উপাসকেরা পর্য্যন্ত নির্গুণ-তত্ত্বের উপরে উঠিতে পারেন নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি অজ্ঞেয় বা কেবল সত্তা-মাত্র-জ্ঞেয়। জগতের অজ্ঞাত, অপ্রত্যক্ষ, অনুমানপ্রতিষ্ঠ, অজ্ঞাত-কারণরূপেই এই ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মার মধ্যে, সাক্ষীচৈতন্যরূপে যাহার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়; তিনি অজ্ঞেয় নহেন, সত্য; কিন্তু নির্গুণ। সকল সম্বন্ধের অতীত। তিনি নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বপ্রকারের বিকার ও পরিণাম রহিত। সকল বহির্বিষয়কে মন হইতে একান্তভাবে বহিষ্কৃত করিয়া, সকল ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করিয়া, সমাধিতে এই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

ব্রহ্ম যেমন আংশিক তত্ত্ব, এই পরমাত্মাও সেইরূপ আংশিক। এই আত্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে জগতের কোনও সম্বন্ধ বা সমন্বয় সাধন করা যায় না। এই নির্গুণ-তত্ত্বের দ্বারা বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইয়া, প্রাচীনেরা এইজন্যই জগৎকে মায়া, জগতের সম্বন্ধসকলকে মায়িক ও পরমার্থতঃ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতির, সংসারের প্রত্যক্ষ বস্তুত্বের, জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধসকলের, কোনও তৃপ্তিকর অর্থ এপথে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতার নিঃশেষ মীমাংসার জন্য ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা পরমাত্ম-তত্ত্ব, দু'এর কোনটিই পর্য্যাপ্ত হয় না। এইজন্যই ভগবান বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ও অধ্যাত্মযোগিগণ যে পথে গমন করেন, তাহাতে পরম-তত্ত্বকে নিঃসংশয়রূপে, সমগ্রভাবে, জানিতে পারা যায় না। কোন্ পথে পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছি,

শোন। এই শ্রেষ্ঠতম, পূর্ণতম, সমগ্র-তত্ত্বের উপদেশের জন্যই গীতার সপ্তম অধ্যায়ের অবতারণা।'

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥

অনুভূতি-সমন্বিত সম্পূর্ণ জ্ঞানের সমগ্র ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। এই জ্ঞানলাভ হইলে পরে, সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় বলিয়া, আর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।

এই জ্ঞান কি? না, পুরুষ-প্রকৃতির জ্ঞান। এই তত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। ইহা পরমাত্ম-তত্ত্বও নহে। ইহা প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান এই তত্ত্বের উপদেশই আরম্ভ করিয়াছেন। এখান হইতেই গীতা প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্বকে অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সপ্তম অধ্যায়ই, আমার মনে হয়, গীতার পরমতত্ত্বের বা ভগবত্তত্ত্বের চাবি-স্বরূপ। ক্রমে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা]   [পৌষ, ১৩২২ সাল

গান

পাহাড়ী—একতালা।

আজিকে বঁধু থেকো না দূরে
গেয়ো না অমন করুণ সুরে!
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠেছে পরাণ পূরে!
আজিকে তোমার সোহাগ ভরে
সকল দেহ উথলে পড়ে
আজিকে তোমার পরশ লাগি
ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে!
আজিকে ঘোর বিরহ বাহি
উঠেছে্ ঝড় পরাণ পূরে!

ঐ—স্বরলিপি

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক]

মাত্রা	•			১			+			৩		
	সা	রে	সা	নি^	নি^	নি^	সা	সা	রে	সা	রে	—
	আ	জি	কে	—	বঁ	ধু	থে	কো	না	দূ	রে	—
	মা	পা	মা	—	—	—	গা	রে	গা	রে	সা	—
	গে	য়ো	না	—	এ	মন্	ক	রু	ণ	সু	রে	—

মাত্রা	০			১			+			৩		
	পা	ধা	রে	সা	সা	সা	নি	সা	নিধা	ধা	নি	নিধাপা
	ঝ	ড়ে	র	মা	ঝে	—	বা	দ	লা	হা	ও	য়ায়
	পা	ধা	পা	মাগা	সা	রে	গা	রেগামা	গা	রে	সা	—
	ঝ	ড়	উ	ঠে-	ছে	—	প	রা--	ণ	পূ	রে	—
	মা	পা	ধা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	—
	আ	জি	কে	—	তো	মার	সো	হা	গ	ভ	রে	—
	নিসা	নি	নিধা	ধানি	ধা	পা	পা	ধা	রে	রে	রে	—
	স-	ক	ল-	দে-	হ	—	উ	থ	লে	প	ড়ে	—
	রে	গা	রে	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা
	আ	জি	কে	—	তো	মার	সো	হা	গ	ভ	রে	—
	নিসা	নি	নিধা	ধানি	ধা	পা	পা	ধা	রে	রে	রে	—
	স-	ক	ল-	দে-	হ	—	উ	থ	লে	প	ড়ে	—
	রে	গা	রে	সা	সা	সা	নিসা	নি	নিধা	ধানি	ধা	পা
	আ	জি	কে	—	তো	মার	প-	র	শ-	লা	গি	--
	পা	ধা	ধাপা	মা	মা	মা	মা	মা	গামাপা	পা	পা	রে
	ঝ	র	ঝ-	র	ঝ	র	ন	য়	ন--	ঝ	রে	—
	পা	গা	গা	রে	সা	—	নিসা	নি	ধা	ধানি	ধা	পা
	আ	জি	কে	--	ঘো	র	বি-	র	হ	বা	হি	—
	পা	ধা	পা	মাগা	সা	রে	গা	রেগামা	গা	রে	সা	—
	উ	ঠে	ছে	—	ঝ	ড়	প	রা--	ণ	পূ	রে	—

হিন্দু-শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার

আধুনিক শিক্ষায় শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ম্মের প্রাচীন মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রাচীনকালের যুক্তিবাদীরাও শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াকে কুসংস্কার বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। "মরা গোরু ঘাস খায় না"—এটি পুরাতন লোকায়ত বা চার্ব্বাকদিগেরই কথা। আমরা ঈশ্বর ও পরলোক একেবারে উড়াইয়া দেই নাই, কিন্তু এই শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন চার্ব্বাকদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য আছে কি না সন্দেহ। আমরা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার কিম্বা তাঁর প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই বস্তুতঃ এখন শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান, এমনকি কোম্‌তমতাবলম্বীগণও এ ভাবে শ্রাদ্ধাদি করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর শ্রাদ্ধের একটা বিশেষত্ব ছিল, এখনও আছে। এভাবে শ্রাদ্ধাদি করিলে সেটি রক্ষা পায় না। আর আমার মনে হয় যে হিন্দুর সাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রাদ্ধতত্ত্বও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রাচীন অর্থ যাহাই থাকুক না, কাল-ক্রমে, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সে অর্থটা বদলাইয়া, এখন ইহার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহাকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাও একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

এই সংসারকে মানুষ কি চক্ষে দেখে, তাহার উপরে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক অনুষ্ঠানের মর্ম্ম ও সার্থকতা নির্ভর করে। এই সংসারকে যাহারা একান্ত অনিত্য বলিয়া ভাবে, এই সংসারের বিবিধ সম্বন্ধ সকল যাহাদের চক্ষে কেবল মায়ার খেলা মাত্র, এসকলের পারমার্থিক সত্যে যাহারা বিশ্বাস করে না, এসকল পারলৌকিক অনুষ্ঠানকে তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেও পারে না। কেবলমাত্র আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলেও, শ্রাদ্ধাদি সত্য হয় না। মরণান্তে সংসারের

সম্বন্ধ সকল বজায় থাকে, না থাকে না? মৃত্যুর পরপারে যাইয়া জীব সংসারের স্নেহ-প্রেম-ভক্তির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, না এসকল বন্ধন সেথানেও থাকে? কিছুদিনের জন্য থাকে, না নিত্য-কাল থাকে? এই সকল প্রশ্নের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এ সংসারকে যাহারা মায়িক বলিয়া ভাবে, এসকল সম্বন্ধ অবিদ্যার সৃষ্টি, আর এই অবিদ্যা বহুদিন ধরিয়া জীবকে অধিকার করিয়া থাকিলেও পরিণামে এই অবিদ্যার বিনাশ করিয়াই জীব মোক্ষ-লাভ করে, এই যাহাদের বিশ্বাস; মৃত ব্যক্তির এই অবিদ্যা-বন্ধন-মোচন করিবার জন্য তাহারা তাহার শ্রাদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু সে শ্রাদ্ধ প্রাচীন বৈদিক যাগযজ্ঞের মতন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার হইয়া রহে। বাজীকর যেমন শূন্য হইতে বস্তু প্রস্তুত করিয়া দেখায়, আকাশে হাত পাতিয়া অঞ্জলি পূরিয়া টাকা বাহির করে, অথবা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রাচীনকালে লোকে যেমন রোগ আরোগ্য করিত বলিয়া শোনা যায়, কিম্বা মন্ত্রবলে মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্মসাধনের কথা যাহা আছে,—শ্রাদ্ধও এইরূপ একটা অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রজাল মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। কোনও মন্ত্রাদি উচ্চারণে কিম্বা কোনও ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানে, কোনও প্রত্যক্ষ বা বোধগম্য উপায়-উদ্দেশ্যের কিম্বা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত, কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ফল উৎপাদন করাকেই আমরা ইন্দ্রজাল বলি। আমাদের দেশের প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়াতে এরূপ বহুবিধ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে। পূরকপিণ্ডাদি দানে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক অভাব পূরণ হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রজাল। এখানে পিণ্ডদান করিয়া, 'ভো! পিণ্ড গয়ায়াং ব্রজ' বলিবামাত্রই এই পিণ্ড বা তাহার অদৃশ্য সারভাগ বা এই ক্রিয়ার ফল গয়াতে যাইয়া ফলিবে, ইন্দ্রজাল ব্যতীত আর কোনও প্রকারে ইহা সম্ভব হয় না। দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে তিলাঞ্জলি দান করিলে, সেই অঞ্জলি পিতৃলোকেরা প্রাপ্ত হইবেন

বা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অথবা এখানে বৃষোৎসর্গ করিলে সেই ক্রিয়ার ফলে প্রেতব্যক্তি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিবেন, ইহা সত্য বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারাও ইহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া মানিতে বাধ্য হইবেন। ইন্দ্রজাল সত্য হইতে পারে, কি পারে না; সে প্রশ্ন এখানে উঠে না। সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু ইন্দ্রজাল সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, প্রচলিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে যে বিস্তর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সকলই এরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ছিল। যথা-বিধি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি করিলে, সেই সকল মন্ত্রের ও ক্রিয়ার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ইহলোকে বা পরলোকে নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, যাজ্ঞিকেরা ইহা বিশ্বাস করিতেন। জৈমিনি মুনি ইন্দ্রাদি দেবতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ শুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রের ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপাদন করিবার শক্তি আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম্মমীমাংসায় বা পূর্ব্বমীমাংসায় এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার হইয়া, ক্রমে এসকল প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানীগণের চক্ষে হীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা স্বর্গাদিলোকে বিশ্বাস করিতেন, সত্য; কিন্তু এই ভূলোকের মতন ঐ সকল স্বর্গাদিলোকও অস্থায়ী; জীব পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, তাহাকে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। অতএব স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিতে জীবের নিশ্রেয়সলাভ হয় না। যাগযজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গাদি-লাভ সম্ভব হইলেও, মোক্ষলাভ হয় না। কেবল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই এই নিশ্রেয়স বা চরম মুক্তিলাভ হয়। এই মুক্তি যখন লোকের চরম সাধ্য হইল, আর ব্রহ্ম-জ্ঞান ভিন্ন কোনও প্রকারের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মুক্তিলাভ যখন অসাধ্য বলিয়া প্রচারিত হইল, তখন বৈদিক

যাগযজ্ঞাদির প্রভাব যেমন হ্রাস হইতে লাগিল, সেইরূপ, তারই সঙ্গে সঙ্গে, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার মূল্য এবং সার্থকতাও কমিয়া গেল। যে স্বর্গাদিলোক ইচ্ছা করে, সে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে পারে; কিন্তু মুক্তি যে চাহে, তাহার এসকলের কোনও অপেক্ষা নাই। ব্রহ্মজ্ঞান যে লাভ করিয়াছে, তাহার শ্রাদ্ধ নিষ্প্র-য়োজন। দেহটা আত্মা নয়; দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনাশী; দেহের জন্মমৃত্যু আছে, আত্মা অজ ও অমর; দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ, দেহের বিকারে আত্মার বিকার ঘটে না; এই জ্ঞান যাহার ফুটিয়াছে, তাহার আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি?

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের পারমার্থিক সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই এই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল সূত্র। এসকল ব্রহ্মজ্ঞানী এই মন্ত্রই সাধন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়াকেই তাঁহারা চরম মুক্তি বলিয়া মনে করেন। জগৎ মায়ার খেলা। সংসারের বিবিধ স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-সেবার সম্বন্ধ সকল মায়িক, মিথ্যা। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সখাসখী, পতিপত্নী প্রভৃতিতে সকল মমত্ববোধ নষ্ট করাই কর্ত্তব্য, এগুলির অনুশীলন করা ব্রহ্মসাধনের অন্তরায়, মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর এই উপদেশ।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন,
মহামায়া নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন,—কারে বল রে আপন!

জীবের কানে ইহারা এই গানই গাহিয়া থাকেন।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ—

মৃত্যু-চিন্তা এই বৈরাগ্যই জাগাইয়া দেয়। সংসারের মায়ার বন্ধন আল্‌গা করিবার জন্যই ইহারা "শেষের সে দিন ভয়ঙ্করকে" মনে করাইয়া দেন। এপথে যাঁহারা চলেন, তাঁহাদের নিকটেও, শ্রাদ্ধের কোনও গভীর মূল্য কিম্বা সত্য সার্থকতা থাকিতে পারে না।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেকএব তু দুষ্কৃতং ॥

জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয়প্রাপ্ত হয়, একাকী আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত উপভোগ করে—বলিয়া, ইহারা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল প্রকারের সম্বন্ধের একান্ত উচ্ছেদ সাধন করেন।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

মৃত্যুর পরপারে জীবের সাহায্যার্থে পিতা মাতা, পুত্র বা স্ত্রী, কিম্বা জ্ঞাতিবর্গ কেহই থাকে না, ধর্ম্মই কেবল তাহার সঙ্গে থাকে—এই বলিয়া ইহারা এপার ও ওপারের মধ্যে একটা ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ও ব্যবধান কল্পনা করেন। আর এই যাঁহাদের সিদ্ধান্ত, এই যাঁহাদের বিশ্বাস, এই যাঁহাদের মত, পরলোকে বিশ্বাস করিয়াও, যাঁহারা ঐ পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের কোনও সত্য, সজীব, প্রাণগত সম্বন্ধ বা যোগ আছে বা থাকিতে পারে, বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটে শ্রাদ্ধ একটা অল্পবিস্তর নিরর্থক লৌকিক ও সামাজিক ক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু পরলোকগত প্রিয়জনের শ্রাদ্ধ করিতে যে বসিবে, তার নিকটে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন কেবল মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে কি নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমার ইহলোকের স্নেহ-প্রেম-ভক্তির সম্বন্ধও আছে, না নাই? যে দেহকে আশ্রয় করিয়া এসকল সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্মশানে তাহাকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছি। সে পঞ্চভৌতিক শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দেহের নাশে তার সকলই কি নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তার আত্মা অজর, অমর,

এই আত্মার মৃত্যু নাই, দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না; আত্মা চিরদিন থাকে। কিন্তু এই থাকার অর্থ কি? আধুনিক জড়বিজ্ঞান যেভাবে শক্তির অনশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠা করে, আত্মার অমরত্বও কি তারই মতন? জড়বিজ্ঞান বলে—এই জগতে আমরা যে সকল শক্তির খেলা দেখি তাহা এক ও অনশ্বর। শক্তির আকার বা প্রকাশের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু মূল বস্তু সর্ব্বদা এক ও সমান থাকে। যে শক্তি রাসায়নিক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের যোগ ঘটায় ও বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের সংযোজনে ও বিয়োজনে বিবিধ মিশ্রপদার্থের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে তড়িৎশক্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই ভাবে এক জাতীয় শক্তি অন্য জাতীয় শক্তিতে পরিণত হয়; কিন্তু তার প্রকাশের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, মূল শক্তিটা সমানই থাকে। জড়বিজ্ঞান এই যে conservation of energy এবং transmutability of force'এর কথা বলে, আত্মার অমরত্বও কি ইহারই অনুরূপ? মানুষের শরীরটা মৃত্যুতে যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থে পরিণত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। দেহের ভৌতিক উপাদান ভূতগ্রামে মিশিয়া যায়, নিঃশ্বাস বায়ুতে, দৃষ্টি তেজে, শোণিতের জলভাগ জলেতে, অস্থিমাংসমেদ প্রভৃতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থেতে মিশিয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রাচীনেরা ইহা দেখিয়াই, মৃত্যুকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলিতেন। কিন্তু এই শরীরের ভৌতিক উপাদান যেরূপ ভূতগ্রামে মিশিয়া যায়,—তাদের আকারেরই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বস্তুর ধর্ম্ম ও পরিমাণ সমান থাকে; সেইরূপ আত্মাও কি আপনার সজাতীয় বা স্বজাতীয় বস্তুতে যাইয়া মিশিয়া যায়? নিঃশ্বাস যেমন এই নিখিল বায়ুসাগরে মিশিয়া যায়, চক্ষুর তেজ যেমন এই নিখিল তেজোমণ্ডলে মিশিয়া যায়, সেইরূপ যাহাকে আত্মা বলি, আমাদের অহংবস্তু যাহা, যাহাকে লইয়া আমাদের জীবত্ব, ব্যক্তিত্ব, তাহাও কি নিখিল আত্ম-সাগরে মিশিয়া যায়? মৃত্যুতে আমাদের আত্মা কি বিশ্বাত্মাতে মিশিয়া

যায় ? রাসায়নিক শক্তি বা chemical force যেমন তড়িৎ শক্তিতে বা electricity'তে পরিণত হয়, তখন তার রাসায়নত্ব যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, আর তাহা জ্ঞানগম্য হয় না ; আমাদের মৃত্যুতে আত্মা-বস্তু কি সেইরূপ বিশ্বাত্মাতে বা ব্রহ্মেতে বা অনন্তেতে মিশিয়া যায়, আমাদের এ সংসারের ব্যক্তিত্ব বা personality আর থাকে না ? যে রূপেতে আমরা ছিলাম, সে রূপেতে আর থাকি না, অন্য রূপেতে পরিণত হই ? তাহাই যদি হয়, তবে দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না, আমাকে একথা বলিয়া ও শুনাইয়া ফল কি ? কারণ ঐ রূপই ত আমার সর্ব্বস্ব। এই শরীরের রূপ নহে, কিন্তু আমার এই আত্মার, এই অহং'এর, এই আমির, রূপই ত আমার সর্ব্বস্ব। কারণ রূপের ধর্ম্মই এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক করা। বৈশিষ্ট্য যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহাই বস্তুর রূপ। আর আমার আত্মার কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, না নাই ? আত্মরূপে আমি অন্য সকল আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, কি না ? এই স্বাতন্ত্র্যই আমার বৈশিষ্ট্য। ইহাই আমার আমিত্ব! ইহাই আমার ব্যক্তিত্ব। ইহাই আমার personality—এই ব্যক্তিত্ব যদি মৃত্যুর পরেও না থাকে, তবে অমৃতের পুত্র বলিয়া আমাকে আশ্বাস দান করিবার চেষ্টা বৃথা। এ ত আশ্বাস নহে, মর্ম্মঘাতী বিদ্রূপ মাত্র !

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে বলে জীবের যেমন একটা ভৌতিক, স্থূল দেহ আছে ; সেইরূপ একটা সূক্ষ্ম দেহও আছে। মৃত্যুতে এই ভৌতিক দেহই নষ্ট হয়, এই ভৌতিক শরীরের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর আছে, তাহা বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরে ঐ লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়াই, জীবাত্মা আপনার বৈশিষ্ট্য, আপনার স্বাতন্ত্র্য, আপনার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। সাংখ্য-সূত্র বলেন—সংসৃতির্লিঙ্গানাং—এই সকল লিঙ্গদেহই মরিয়া আবার জন্মে, জন্মিয়া আবার মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। এই লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়াই জীব আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য বার-

ষার এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-সেবা প্রভৃতি সম্বন্ধের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা এই লিঙ্গশরীর। জীবের স্থূলশরীরের উপাদান যেমন এই ভূতগ্রাম, তার লিঙ্গশরীরের উপাদান সেইরূপ তার কর্ম্মজ সংস্কারাদি। কর্ম্মক্ষয়ে, সংস্কারের বিনাশে, বাসনার নিঃশেষ বিলোপে, এই লিঙ্গশরীরও নষ্ট হইয়া যায়। তখনই তার কৈবল্যলাভ হয়। তখনই জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়। জলে যেমন জল মিশিয়া যায়, বায়ুতে যেমন বায়ু মিশিয়া যায়, সেইরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া, নিঃশেষে মিশিয়া যায়। ইহাই জীবের চরমাবস্থা। তখন আর তাহার কোনও সংসার-সম্বন্ধ থাকে না। এ অবস্থালাভ যার হইয়াছে, তার কোনও শ্রাদ্ধও হয় না। লিঙ্গশরীরের জন্যই শ্রাদ্ধের প্রয়োজন। লিঙ্গশরীরই, মরিয়াও, সংসারের সম্বন্ধের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়া, শোকদুঃখাদি ভোগ করে। এইজন্যই জীব পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে ভৌতিক বন্ধনমুক্ত হইয়াও, সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। দেহ না থাকিলেও, স্বপ্নাবিষ্ট লোকের মত, দেহের ক্ষুৎপিপাসাদির দ্বারা পীড়িত হয়। এইজন্যই পিণ্ডাদি দান করিয়া, তাহার তৃপ্তি-সাধন করিতে হয়। আর এই তৃপ্তি সাধিত হয়, ইন্দ্রজাল প্রভাবে —শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে।

মধ্যযুগের বৈদান্তিক মায়াবাদ এই মীমাংসাতেই সন্তোষলাভ করিয়াছে। সংসারকে যাহারা মায়ার খেলা বলিয়া ভাবে, সর্ব্ব-প্রকারের ভেদবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-জ্ঞানকে যাহারা অবিদ্যা বা অজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া মনে করে, সকলপ্রকারের সম্বন্ধের বিলোপ-সাধনেই জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়, ইহা যাহারা মনে করে, অথচ জীবের এই ব্যক্তিত্ববোধকে একেবারে নষ্ট করা অসাধ্য না হউক অত্যন্ত দুঃসাধ্য ইহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি লাভ না করিয়াই কোটি কোটি জীব মৃত্যুমুখে পড়িতেছে ইহা দেখে, তাহাদের পক্ষে এরূপ একটা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা স্বাভাবিক। এই মীমাংসাতে তাহারা তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কেবল

জীবের ব্যক্তিত্ব নহে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এই পথে যে ঈশ্বর-তত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে বা পরমতত্ত্বে পৌঁছিতে হয়, তাহা নিগুর্ণতত্ত্ব। তাহার অস্তিত্ব মাত্র মানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যভাবে জ্ঞানপ্রেমাদি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কারণ জ্ঞান বলিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ বুঝায়। জ্ঞেয় নাই, জ্ঞাতা আছেন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নাই, অথচ জ্ঞান আছে, ইহা বুদ্ধির অগম্য। পরম-তত্ত্ব আপনি আপনার জ্ঞেয়, আপনি আপনার জ্ঞাতা, ইহা বলা যায় বটে। আর ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাহা হইলেই তাঁর নিজের স্বরূপের মধ্যেই একটা ভেদ, একটা দ্বৈত, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অভেদ, একটা অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ভেদ নিত্য। এই অভেদ নিত্য। এই অভেদের মধ্যেই এই নিত্য ভেদের সৃষ্টি হইতেছে। এই ভেদের মধ্যেই নিত্য অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের মধ্যে জ্ঞান-স্বরূপ আপনার নিত্য জ্ঞানলীলায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই পথে, এই ভাবেই, পরমতত্ত্বেতে "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞাতারূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই পুরুষ। জ্ঞেয়রূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই আবার প্রকৃতি। সেইরূপ, প্রেমলীলার জন্যও, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রেমিকরূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই পুরুষ; এই প্রেমের বিষয় বা প্রেমের পাত্ররূপে এই অদ্বৈততত্ত্বই প্রকৃতি। এইরূপে আপনি আপনার প্রেমের আশ্রয়, ও আপনি আপনার প্রেমের বিষয় হইয়া, তিনি আপনার মধ্যে নিত্য প্রেমলীলাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইভাবে যে পরমতত্ত্বের সাধন না করে, এই সিদ্ধান্তকে যে গ্রহণ না করে, কিম্বা না করিতে পারে, তাহার নিকটে ব্রহ্মের জ্ঞান ও আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মের আত্মত্ব কখনই বস্তুতন্ত্র (real) হয় না। সংসার তার নিকটে সত্য নয়। সংসারের ক্রিয়াকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রেমভক্তিসেবার সুমধুর সম্বন্ধসকল,

এসকল সম্বন্ধের উৎকর্ষসাধনের জন্য যাহা কিছু যমনিয়মাদি অবলম্বিত হউক না কেন, এমন কি ভগবানের ভজনপূজন পর্য্যন্ত অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি হইয়া যায়। অজ্ঞলোকের মনোরঞ্জনের বা প্রাকৃত জনের চিত্তশুদ্ধির জন্য এগুলির প্রয়োজন থাকিলেও এসকলের কোনও পারমার্থিক ও নিত্য অর্থ বা সাফল্য নাই ও থাকিতে পারে না। এই জন্যই সকলপ্রকারের দ্বৈতবুদ্ধি নষ্ট করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মাত্মৈকত্বসিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের জীবনে কোনও সাধনভজনের, মৃত্যুতে কোনও শ্রাদ্ধাদির আর প্রয়োজন থাকে না। এই কারণেই দণ্ডীসন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধ হয় না।

ফলতঃ মধ্যযুগের মায়াবাদ এদেশের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, প্রায় সকল লোকেই, প্রকৃতপক্ষে, একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মতনই, প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে গৃহস্থ বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবের, জ্ঞানমার্গাবলম্বী তান্ত্রিকের এবং ভক্তিপন্থাবলম্বী ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। সকলেই সংসারের স্নেহপ্রেমভক্তির সম্বন্ধকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। এ মায়ার বন্ধনকে অতিক্রম করিবার জন্য সকলেই ইচ্ছুক। আর মৃত ব্যক্তির এই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্যই ইঁহারা বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া, পুরকপিণ্ডাদি দান করেন। যাঁহারা ভেকধারী বৈষ্ণব, দণ্ডীসন্ন্যাসীদের ন্যায়, কেবল তাঁহাদেরই শ্রাদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসীদের মৃত্যুতে "ভাণ্ডারা" আর ভেকধারী বৈষ্ণবের মৃত্যুতে "মহোচ্ছব" দিয়াই জীবিতেরা তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু পারলৌকিক কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধের সত্য অর্থ বুঝিতে হইলে, সকলের আগে, এই মধ্যযুগের সন্ন্যাসমুখী মায়াবাদকে অতিক্রম করিতে হইবে। এ সংসার মায়ার খেলা নয়, কিন্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ নিত্য-রসলীলারই বহিরাভিনয়, এইটি যে বিশ্বাস না করে, সে সত্যভাবে শ্রাদ্ধের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলিয়া ডাকি। সত্যই কি তিনি পিতা?

পিতৃত্ব ধর্ম্ম কি সত্য সত্যই তাঁর স্বরূপের অন্তর্গত? তাহা যদি হয়, তবে এই পিতৃত্বের সার্থকতার জন্য, তাঁর স্বরূপের মধ্যেই পুত্রত্বেরও স্থান করিতে হইবে। খৃষ্ট-ধর্ম্মেতে এই তত্ত্বটিকে খুবই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া খৃষ্টীয়ান্ ত্রিত্ববাদ বা Trinity, তাঁর অজ বা অগ্রজ একমাত্র পুত্রেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল পিতা বা Father নহেন; কিন্তু পিতা এবং পুত্র, Father এবং Son, আর এই পিতা-পুত্রের দ্বৈতকে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা ও নষ্ট করিয়া, যে তত্ত্ব ইঁহাদের একত্ব প্রস্ফুট ও রক্ষা করিতেছে, সেই Holy Ghost বা "পবিত্রাত্মা"—এই তিন মিলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্বের বা পরম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব এই পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আপনার জ্ঞান-প্রেমাদিকে সম্ভব ও পূর্ণ করিতেছে। অনাদিকাল হইতে পিতা-পুত্রের মধ্যে এই লীলা চলিয়াছে। আমাদের ভক্তিশাস্ত্র যাহাকে লীলা বলেন, খৃষ্টীয়ান শাস্ত্র তাহাকেই Eternal Colloquy between the Father and the Son—অর্থাৎ পিতাপুত্রের মধ্যে অনাদ্যনন্ত "স্বগতোক্তি" বলিয়াছেন। নাম ভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক। ঐ পারমার্থিক পিতৃত্ব-পুত্রত্বের অনুকরণেই সংসারের পিতৃ-পুত্র সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, এই সম্বন্ধও সত্য; এই সম্বন্ধের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সত্য। সংসারের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ এই পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতেই গড়িয়া উঠে, তাহারই সঙ্গে যুক্ত বলিয়া, সকল সম্বন্ধই সত্য।

কেন সত্য? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব খৃষ্টীয় সাধনা যতটা ধরিতে পারিয়াছে, আমাদের দেশের ভক্তিসাধনা তদপেক্ষা অনেক বেশী ধরিয়াছে। আমাদের ভক্তিসাধনা পরমতত্ত্বেতে কেবল পিতা-পুত্রের নহে, কিন্তু সংসারের সকল প্রেমের বা রসের সম্বন্ধেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভগবানের স্বরূপের মধ্যে দাস-ও-প্রভু, সখা-ও-সখা, পিতামাতা-ও-পুত্রকন্যা, পতি-সতী, প্রণয়ী-প্রণয়িনী, নায়ক-নায়িকা, সকল রসের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ভাবে আমাদের ভক্তি-

পন্থা তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্য-লীলার মধ্যে, এই সকল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অপ্রত্যক্ষ ও নিত্যসিদ্ধ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য এই চারিটিকে স্থায়ীরসরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই স্থায়ী রসচতুষ্টয়ের অনাদি, অনন্ত, নিত্য আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বলিয়াই, ভগবানকে এই ভক্তিপন্থা নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তিরূপে ভজনা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত জটিল ও বিশাল ও বিচিত্র বিশ্ব-সমস্যার আর কোনও মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি?

সংসারের বিবিধ স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিগূঢ়, অভেদ্য রহস্য জাগিয়া রহে, তার মীমাংসা করিবে কে? এ সকল সম্বন্ধ মাত্রেই অহেতুকী। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা যে তার কল্যাণ-ধ্যানে নিযুক্ত হন, সেই অদৃষ্ট সন্তানের মুখ দেখিবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত হইয়া রহেন, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যে সেই রক্তমাংসের পিণ্ডকে প্রাণ দিয়া প্রাণের ভিতরে টানিয়া লয়েন, এই অদ্ভুত বিশ্ব-বিজয়ী স্নেহের মূল কোথায়? শত শত কুমারীর মধ্যে যে কোনও না কোনও যুবকের প্রাণ দৃষ্টিমাত্র একজনকে আপনার বলিয়া বাছিয়া লয়, এই প্রেমেরই বা মূল কোথায়? শত শত বালক বা বালিকার মধ্যে যে আমরা শৈশব-যৌবনের প্রদোষালোকে দাঁড়াইয়া, এক একটিকে নিজের বলিয়া প্রাণে টানিয়া আনি, এই সখ্যেরই বা মূল কোথায়? এ-ই যে ইহাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, এমনটা ত মনে হয় না। এইরূপ সত্য রসের সম্বন্ধ যেখানেই গড়িয়া উঠে, সেই-খানেই, তার পশ্চাতে যেন একটা অনন্তকালের ইতিহাস, একটা অনাদ্যনন্ত রহস্য লুকাইয়া আছে,—মনে হয়। ইহা কি কেবলই কল্পনা? কল্পনাই যদি হয়, তবু এ কল্পনাও ত অহেতুকী নহে। অকারণে বিশ্বে কোনও কার্য্যই ত কল্পনা করা যায় না। এই যে রসের ক্রিয়া, তাহাকে তবে অকারণ বলিব কেমন করিয়া? বিশ্বের সর্ব্বত্রই একটা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই

সকল রসের সম্বন্ধেরই কেবল কোনও পূর্ব্বাপর নাই, এরূপ কল্পনা করিব কেমনে? এসকল মায়ার খেলা বলিলেও, মূল সমস্যার মীমাংসা, গোড়ার প্রশ্নের কোনও উত্তর—হয় না। মায়াই বা আসিবে কেন? আসিল কোথা হইতে? মায়াকে অহেতুকী বলিলেও ইহার মীমাংসা হয় না! যাহার হেতু নাই, তাহা খেয়াল। এই খেয়াল কার? খেয়ালটা নিতান্তই "গোলমেলে" বস্তু। সে কোনও শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ হয় না; কোনও বিধিবাঁধন মানে না; কার্য্যকারণ-জালে ধরা পড়ে না। সংসারের মূলে যদি এই খেয়ালই থাকে, তবে সংসারে কোনও শৃঙ্খলা ত সম্ভবে না। শৃঙ্খলা না থাকিলে, নিয়ম ত হয় না। নিয়ম না থাকিলে, বিজ্ঞানও সম্ভব হয় না, নীতিও গড়ে না। নীতি না গড়িলে, পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি নষ্ট ও মিথ্যা হইয়া যায়। মায়ার সিদ্ধান্তে কেবল যে সংসার মিথ্যা হয় তাহা নহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভালমন্দ, ভজনপূজন, সাধনা ও সাধ্য, ভক্ত ও ভগবান সকলই মিথ্যা হইয়া যায়। Cosmos chaos'এতে পরিণত হয়। ফলতঃ এই সিদ্ধান্ত মানিলে কেবল ধর্ম্ম নয়, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রস-বিজ্ঞান বা এস্থেটিকস্, সমাজবিজ্ঞান, সকলই নষ্ট হইয়া যায়। জীবনে কোনও কিছুরই সত্য প্রতিষ্ঠা থাকে না।

আর সংসারের সম্বন্ধ সকলকে যদি মায়িক বা আকস্মিক—illusory বা accidental—বলিয়া উড়াইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে পরমতত্ত্বের মধ্যেই ইহাদের মূল খুঁজিতে হইবে।

এ সংসারে যার আরম্ভ হয়, তারই শেষ দেখি। জন্মেতে, অথবা জন্ম বলিতে যদি ভূমিষ্ঠ হওয়া বুঝি, তাহা হইলে তার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে—এই দেহের আরম্ভ হয়। মৃত্যুতে এই দেহের অবসান প্রত্যক্ষ করি। দেহের উপাদান যে একান্ত নষ্ট হয়, তাহা নহে; কিন্তু এ সকল মিলিয়া যে একটা বিশিষ্ট-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, একটা বিশেষ যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছিল, মৃত্যুতে তাহাই ভাঙ্গিয়া যায়, তার যন্ত্রত্ব বা দেহত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা আর দেহ-রূপে

থাকে না ও কার্য্যকরী হয় না। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধই দেহের জীবন বা দেহের রূপ বা দেহের দেহত্ব। এই সম্বন্ধের একটা আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধ শেষ হইয়া যায়। আত্মা বলিয়া যে বস্তুকে বলি, তাহার যদি কাল-বিশেষে আরম্ভ হয়, তবে আশুই হউক আর বিলম্বেই হউক, এই আত্মারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য, আমাদের দেশের আত্মতত্ত্বেতে জীবের আত্মবস্তুর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই;—জন্ম নাই বলিয়াই মৃত্যু নাই;—এই কথা চিরদিন বলিয়া আসিয়াছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এই আত্মা জন্মে না, মরে না; হইয়া নষ্ট হয় না, নষ্ট হইয়া পুনরায় হয় না; ইহা জন্ম-রহিত, ইহা নিত্য, ইহা চিরন্তন, ইহা পুরাতন, শরীর হত হইলে ইহা হত হয় না—ইহাই আমাদের দেশের আত্মতত্ত্বের মূল কথা। এটি না মানিলে, বিশ্বের বিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আত্মার অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়।

নাসতে বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ

যাহা সৎ তাহার অভাব হয় না, যাহা অসৎ তাহার প্রকাশ বা অস্তিত্বও সম্ভবে না। আত্মবস্তু সৎবস্তু। তাই আত্মা অবিনাশী। এই জন্যই আমরা এই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। আমাদের প্রাণ মানে না, মন বুঝে না যে মানুষ মরণে একেবারে নষ্ট হয়—এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত আকাঙ্ক্ষা, এত অনন্ত পিপাসা, এত উন্নতির সম্ভাবনা যে মানুষের মধ্যে দেখি, হঠাৎ তার সব ফুরাইয়া গেলে, বোধন হইতে না হইতে তার বিসর্জ্জন হইল, জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ নিভিয়া গেল;—ইহা আমাদের প্রাণ মানে না, মন বুঝে না,—এই ভাবে অপর লোকে আত্মতত্ত্বের, পরলোকের, মৃত্যুতে মানুষ যে একান্ত বিনিষ্ট হয় না, এ সকল কথার প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা বলি,—কেবল তাহা নহে। আমাদের জ্ঞান, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল সূত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে এই

নাস্তদস্তীতিবাদের—ইহলোকের পরে আর কিছু নাই, এই মতের—মৌলিক বিরোধ উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞান-প্রয়োজনে, necessity of thoughtএর দ্বারা প্রেরিত হইয়া, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি। এই আত্মা যদি অমর না হয়, তবে জগৎ অসৎ, বিশ্ব মিথ্যা, সংসার ইন্দ্রজাল, জীবন নিরর্থক, ঈশ্বর অসিদ্ধ হন। যে পথে আমরা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করি, সেই পথেই আত্মার প্রতিষ্ঠা করি। যে পথে ঈশ্বরকে পাই, সেই পথেই আত্মাকে পাই। আত্মাকে পাইয়া ঈশ্বরকে পাই। ঈশ্বরকে পাইয়া আত্মাকে পাই। এই পথে আমরা আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উভয় তত্ত্বকে পাইয়াছি বলিয়া আমাদের আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্ব একই বস্তু। উপনিষদ আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাই-য়াই ব্রহ্মতত্ত্বের এবং ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই আত্ম-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন অনাদ্যনন্ত সচ্চিদানন্দ বস্তু, আমরা যাহাকে আত্মা বলি, এই অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক বস্তুও সেইরূপ অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ঈশ্বরের সঙ্গে এই আত্মার এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা আছে বলিয়াই, আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি, ঈশ্বরের ভজনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা অস্বীকার করিলে ধর্ম্মের মূল নষ্ট হইয়া যায়। এই সজাতীয়তা বা স্বজাতীয়তা অঙ্গীকার করিয়াই প্রাচীনকাল হইতে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা-বন্দনাকালে—

> অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্
> সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান—

প্রতিদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ ও এই জ্ঞান সাধন করিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্ম যেমন যুগপৎ নির্গুণ, অর্থাৎ সকল সম্বন্ধের অতীত, এবং সগুণ, অর্থাৎ যাবতীয় সম্বন্ধ লইয়া পূর্ণ হইয়া আছেন, জীবাত্মাও সেইরূপ একই সঙ্গে এই নির্গুণ ও সগুণ

স্বভাবপন্ন হইবেই হইবে। ঈশ্বর জ্ঞাতা, তাঁর আপনার মধ্যে নিত্য-কাল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ভোক্তা, তাঁর আপনার মধ্যে নিত্যকাল ভোক্তাভোগ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি পিতা, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল পিতা-পুত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি প্রভু, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল প্রভু-দাস সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি সখা, তাঁর মধ্যে নিত্যকাল এই সখ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি পতি বা প্রণয়ী, তাঁর মধ্যে এই মাধুর্য্যের সম্বন্ধও নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। এ সকল সম্বন্ধের অভাবে তার জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ দুই' বিলোপ প্রাপ্ত হয়। পরমতত্ত্বের আপনার স্বরূপের মধ্যে এ সকল সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই, আমরা তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ পুরুষ বলিয়া জানি। এই সকল নিত্যসিদ্ধ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। এ সকল সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অজ্ঞেয় কিম্বা কেবল সত্তামাত্রজ্ঞেয় হন। তাঁহার পুরুষবিধত্বের * বা Personalityর প্রতিষ্ঠা থাকে না। এই পুরুষবিধত্ব বা Personality বস্তুটিই এসকল জ্ঞান প্রেমের সম্বন্ধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ সকল সম্বন্ধর বিলোপে ঐ পুরুষবিধত্বের বা Personalityর বিলোপ হয়। এ সকল যদি নিত্য-সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে যাঁহাকে ভগবান বা পুরুষ বলি, তাঁহারও নিত্যত্ব থাকে না। এ সকল যদি মায়িক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের পুরুষবিধত্ব বা Personalityও মায়িক হয়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীগণ এই

---

* ইংরাজিতে আমরা Person বলি, তাহাকেই তৈত্তিরীয়োপনিষদে "পুরুষ" বলিয়াছেন, আর এই পুরুষের লক্ষণকে "পুরুষবিধতাম" বলিয়াছেন।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ।

তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্।"

এইজন্য এখানে পুরুষবিধত্বই ব্যবহার করিলাম। পুরুষত্ব কথাতে এই অর্থটি সম্যক ব্যক্ত হয় না।

জন্যই ঈশ্বরতত্ত্বকে মায়াধিষ্ঠিত বলেন। ভক্তিবাদী ইহা অস্বীকার করেন। কারণ, পরমতত্ত্ব যদি পুরুষ না হন, পরমতত্ত্বের মধ্যে যদি দাস্যসখ্যাদি স্থায়ীরসের লীলা-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে, এ সকল রসের পথে তাঁর নিত্য ভজনার সম্ভাবনা থাকে না। আর এই ভজনাই যে ভক্তির চরম সাধ্য।

পরমাত্মা পুরুষ—Person ; কারণ তাঁহার আপনার মধ্যে জ্ঞান-প্রেমাদির বিচিত্র অনন্ত সম্বন্ধ সকল নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এসকল সম্বন্ধের অভাবে তাঁর পুরুষবিধত্বের বা Personalityর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। তিনি নিত্য, অনাদ্যনন্ত—এ সকল সম্বন্ধও তাঁর মধ্যে নিত্য ও অনাদ্যনন্ত। তিনি পূর্ণ, তাঁর মধ্যে এসকল সম্বন্ধও পূর্ণ হইয়া আছে। আমরাও পুরুষ, আমরাও Person। এই পুরুষবিধত্ব, এই Personality আমাদের আত্মার নিত্য-সিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহাই আমাদের আত্মত্ব, আমাদের ব্যক্তিত্ব। এই Personality যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার অমরত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের ব্যক্তিত্ব নিত্যকাল থাকে, এই বৈশিষ্ট্য ও এই ব্যক্তিত্ব অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে —শরীর হত হইলে এই Personality, এই বৈশিষ্ট্য, এই ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয় না—ইহাই সত্য, ইহাই একমাত্র পারলৌকিক সিদ্ধান্ত। ইহারই উপরে আমাদের পরলোকে বিশ্বাস, পরলোকের আশা ভরসা, পরলোকের শান্তি ও উন্নতি সকলে নির্ভর করিতেছে। আর এই Personality, এই বৈশিষ্ট্য, এই ব্যক্তিত্ব যদি সত্য হয়, ইহা যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল জ্ঞানের প্রেমের সেবার ভক্তির সম্বন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের এই বৈশিষ্ট্যের এবং এই ব্যক্তিত্বের, এই Personalityর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যে সকল সম্বন্ধের সাহায্যে আমাদের এই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য, এই পুরুষবিধত্ব বা Personality ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, সে সকল সম্বন্ধও আমাদের আত্মার নিত্যসঙ্গী হওয়া আবশ্যক। জানিবার যন্ত্র নাই, অথচ

জ্ঞান আছে; বিষয় নাই, অথচ বিষয়ী আছে; স্নেহের পাত্রপাত্রী নাই, অথচ স্নেহ আছে; সখাসখী নাই, অথচ সখ্য আছে; প্রণয়প্রণয়ী নাই, অথচ প্রণয় আছে; প্রেম-পাত্র বা প্রেম-পাত্রী নাই, অথচ প্রেম আছে; ভক্তির পাত্রপাত্রী নাই, অথচ ভক্তি আছে; এসকল সম্বন্ধের ও রসের আশ্রয় নাই, অথচ এ সকল রস ও সম্বন্ধ আছে; ইহা হইতেই পারে না। এই সকল সম্বন্ধ লইয়া যদি আমার পুরুষবিধত্বের, আমার Personalityর, আমার বৈশিষ্ট্যের, এক কথায় আমার আত্মত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে, এই আত্মার অমরত্বের প্রয়োজনে এই সকল সম্বন্ধ যে নিত্য, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে।

উপনিষদ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে,—বলিয়া জগতের জন্ম স্থিতি ও পরিণতির মূলে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র সর্ব্বোপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই জগতের জন্ম-আদি যাহা হইতে হয়, বলিয়া এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মৃত্তিকা লইয়া কুম্ভকার ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে; এই ঘটনির্ম্মাণ-কার্য্যে মৃত্তিকাকে উপাদান কারণ ও কুম্ভকারকে নিমিত্ত কারণ কহে। এই ব্রহ্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ দুই'। এই চরাচর বিশ্বের, এই চেতনাচেতন-পদার্থ-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানও ব্রহ্ম, আর ইহার ক্রমবিকাশের নিমিত্তও ব্রহ্ম। এই যদি সত্য হয়; তাহা হইলে, এই বিশ্ব ও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও যাবতীয় জীব, সকলে—বর্ত্তমান বিকাশ-ধারাতে বা সৃষ্টি-ধারাতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মেরই মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা মানিতেই হয়। চিত্রকরের মনের মধ্যে, তাঁহার ধ্যানেতে, যেমন চিত্রবিশেষের পরিপূর্ণ ছবিটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে; এই বিশ্ব সেইরূপে, সেইভাবে, অনাদিকাল হইতে এই জগৎ-কারণরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। চিত্রকরের চিত্তপটের পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তি যেমন তিলে তিলে

তাঁর সম্মুখের চিত্রপটে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ এই সৃষ্টিধারাতে বিশ্বের ঐ নিত্যসিদ্ধ পরিপূর্ণ স্বরূপটিই ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মেতে যাহা নিত্য-সিদ্ধ—eternally realised—তাহাই সৃষ্টিতে ক্রমবিকাশ পাইতেছে। এই বিকাশ-ধারা সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই ইহার পূর্ণাপূর্ণ, ভালমন্দ, ছোটবড় প্রভৃতির বিচার হইয়া থাকে। ওখানে, ব্রহ্মস্বরূপে, ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ; এখানে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছে। ওখানে ইহা পরিস্ফুট, এখানে ক্রমে ফুটিতেছে। যখন যতটা পরিমাণে এই বিশ্ব সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের প্রকাশ করে, তখন তাহাকে তত শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকি। যখন যতটা ঐ স্বরূপ হইতে নীচে পড়িয়া থাকে, তখন তাহাকে তত নিকৃষ্ট বলি। আমাদের সকল সমালোচনার, সকল পরিমাণের, সকল বিচারের মাপকাঠি ওখানে, ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবস্তুতে। ঐটি না থাকিলে, আমাদের সত্যাসত্যের, ভালমন্দের, পূর্ণাপূর্ণের, ধর্ম্মাধর্ম্মের, সুন্দরকুৎসিতের, সুখদুঃখের এ সকলের কোনও অর্থ থাকে না।

কিন্তু উপনিষদ যাহাকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া বিশ্বের আদি কারণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কি এই ব্রহ্মাণ্ড কেবল সমষ্টিরূপেই নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, না এই বিশ্বের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টির ব্যষ্টিত্বও সেখানে ঐরূপ পরিপূর্ণ, প্রস্ফুট, এবং নিত্যসিদ্ধ eternally realised হইয়া রহিয়াছে? যদি ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ভিন্ন ভিন্ন জীব, ব্রহ্মেতে ব্যষ্টিভাবে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised না থাকে, তাহা হইলে, ব্যষ্টিত্বের, ব্যক্তিত্বের আমাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের ও নিজ নিজ বিকাশ-ক্রমের, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পুরুষবিধত্বের বা Personalityর ক্রমোন্নতির ও ক্রমস্ফূর্ত্তির—আমাদের individual development বা evolution বা progressএর—আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতির কোনও অর্থ ত থাকে না। গতি আছে, কিন্তু চরম গন্তব্য নাই; নিয়ম আছে,

কিন্তু লক্ষ্য নাই; ফুটিতেছে, কিন্তু ফুটিয়া ফুটিয়া অন্তে কি যে হইবে তার ঠিকানা নাই;—এও কি কখনও হয়? উন্নতি বলিতেই, উন্নীত অবস্থা যে একটা আছে, ইহা বুঝায়। জীবের সে অবস্থা কি? জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, ইচ্ছাতে উন্নতিলাভ করিব, ইহাই আমাদের নিয়তি, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরিপূর্ণ জ্ঞানের, পরিপূর্ণ প্রেমের, পরিপূর্ণ পবিত্রতার একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থা আছে, ইহাও মানিতেই হইবে। আর এই উন্নীত অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যষ্টিত্ব বা বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়, এটি না মানিলেও এই ব্যক্তিত্বের উন্নতির কোনও বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় না। চরমাবস্থায় আমরা কি সকলে একাকার হইয়া যাইব, না ব্যষ্টিরূপে থাকিব? একাকারত্বই চরম নিয়তি হইলে, ব্যক্তিত্ব-লোপই মুক্তির অর্থ হয়। ইহা ত অদ্বৈতবাদীর কৈবল্যেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। আমাদের ব্যক্তিত্ব যে নিত্য-বস্তু ইহা না মানিলে, মানবাত্মার অমরত্বের কোন অর্থ থাকে না। আর এই আত্মার জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি যখন জ্ঞানপ্রেমাদির বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়, সম্বন্ধ ছাড়া হয় না, তখন এই সকল সম্বন্ধের পূর্ণতার দ্বারাই জ্ঞানপ্রেমাদি পূর্ণ হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। আর এসকল সম্বন্ধ যখন ইহ সংসারে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, প্রত্যক্ষ করিতেছি; ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে উদার, অশুদ্ধ হইতে শুদ্ধ, পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম—এইভাবে উন্নত হইতেছে, ইহাও দেখি ও বুঝি; তখন এ সকল সম্বন্ধের এক একটি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ যে আদিকারণের মধ্যে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাও মানিতেই হয়। হঠাৎ ত শূন্য হইতে আমরা এলোকে আসিয়া উৎপন্ন হই নাই। অসৎ হইতে ত সতের উৎপত্তি হয় না। আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সত্তাই আমার পূর্ণতম অপ্রত্যক্ষ সত্তার সাক্ষ্য দেয়। আমি যে তিলে তিলে একটা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছি, তাহাতেই আমি অনাদিকাল হইতে কোথাও পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটভাবে, বিদ্যমান আছি, ইহা প্রমাণ করে। গীতা—

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্

"হে পার্থ! আমাকে যাবতীয় ভূতসকলের সনাতন বীজ বলিয়া জান"—এই ভগবদ্‌বাক্যে এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীজ কাহাকে বলে? যাহাতে কোনও বস্তুর সমগ্র রূপটি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাকেই আমরা সেই বস্তুর বীজ বলি। বটবীজে পরিপূর্ণ বট বৃক্ষটি লুকাইয়া আছে। আমরা বীজের মধ্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও ইহা জানি যে তাহাতে অসংখ্যশাখ দিগন্তবিস্তৃত অভ্রভেদী বনস্পতির সমগ্র, পরিপূর্ণ স্বরূপটি নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া আছে। ঐ নিত্যসিদ্ধ, সমগ্র, সম্পূর্ণ বট-স্বরূপই ক্রমে এই বীজ হইতে বিকাশধারায় ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্মের মধ্যে এই বিশ্ব বীজরূপে ছিল, নিত্যকাল আছে, নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। বিশ্বের ব্যষ্টিবস্তুসমূহ, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক জীব তাঁর মধ্যে বীজরূপে ছিল, নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে। আমরা প্রত্যেকে সেখানে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছি। আমাদের ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপকেই গীতা ভগবানের বিভূতি বলিয়াছেন।

আর এই আমরা ত একা নই। আমরা আমাদের সকল সম্বন্ধকে লইয়াই আমরা হইয়াছি। আমার জ্ঞেয় নাই, প্রেয় নাই, শ্রেয় নাই; জ্ঞানের বিষয় নাই, প্রেমের পাত্র নাই, কর্ম্মের ক্ষেত্র নাই, এক কথায় যাহাকে সংসার বলে, অর্থাৎ এই সংসারের জ্ঞান-প্রেম-স্নেহ-সেবা-ভক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধ নাই, অথচ আমি পূর্ণ হইয়া আছি, ইহা ত হয় না। আমাদের আমিত্ব ব্যক্তিত্ব সকলই এই সংসারকে লইয়া। সুতরাং এই সকল সম্বন্ধেতে আবদ্ধ হইয়াই আমরা অনাদিকাল হইতে, ভগবানের মধ্যে, তাঁর নিত্যসিদ্ধ বিভূতিরূপে ছিলাম, এখনও রহিয়াছি; এই সৃষ্টিধারাতে সেই নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ সকলকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ঐ ভগবদ্বিভূতিকেই তিলে তিলে ফুটাইয়া তুলিতেছি। ঐ বিভূতিই আমাদের স্বরূপ; এ সংসারের রূপ ঐ স্বরূপেরই প্রতিবিম্ব।

এই ভাবে যখন নিজেদের দেখি, এই ভাবে যখন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যষ্টিত্ব বা আত্মত্বকে দেখি, তখন দেখি যে পিতামাতা প্রভৃতি

প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেবল দুদিনের নয়, কিন্তু চিরদিনের। অনাদিকাল হইতে আমরা তাঁহাদের পুত্র কন্যা ছিলাম। অনাদিকাল হইতে আমরা তাঁহাদের বাৎসল্যের ও তাঁহারা আমাদের দাস্যের আশ্রয় হইয়া আছেন। অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমরা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য ও দাস্য-মূর্ত্তিকে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তুলিব ও অন্তে তাঁহার বিভূতির সারূপ্য লাভ করিয়া, তাঁর নিত্যলীলার সহায় ও সহচর হইয়া থাকিব।

পিতার বা মাতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি কেবল এই বর্ত্তমান জীবনের না চিরদিনের? যদি এই জীবনেই এই সম্বন্ধের আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ হইবে না, বা হয় নাই একথা কে বলিবে? এ জগতে যারই আরম্ভ আছে তার শেষও হয়। যে সম্বন্ধের দেশকালেতে আরম্ভ হইয়াছে; দেশকালেতে তার শেষও অনিবার্য্য। অন্ততঃ তাহা অনন্ত কালের হইতে পারে না। জন্মের সঙ্গে যে সম্বন্ধের আরম্ভ হয়, তার আশ্রয় এই দেহ। এই দেহের বিনাশে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর সম্বন্ধ মাত্রেই বিশিষ্টকে আশ্রয় করিয়া গড়ে। নির্ব্বিশেষের কোন সম্বন্ধ নাই। পিতামাতার পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বিশিষ্ট সন্তানকে আশ্রয় করিয়া ফুটে। সন্তানের পিতৃমাতৃভক্তি বিশিষ্ট পিতামাতাকে আশ্রয় করিয়া জন্মে ও সেই আধারকে ধরিয়াই বিকশিত হইয়া উঠে। এই বিশিষ্ট আশ্রয় নষ্ট হইলে সত্য সম্বন্ধও নষ্ট হইয়া যায়। পিতামাতার সঙ্গে তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্র-কন্যার সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, অনাদিকাল হইতে যদি ইঁহারা পরস্পরে এই সম্বন্ধে আবদ্ধ না থাকেন, তবে ইঁহা-দিগকে আশ্রয় করিয়া,এসংসারে ভগবানের বাৎসল্যলীলার অভিনয় অস-ম্ভব হয়। নিত্যকাল আমি আমার পিতার পুত্র, নিত্যকাল তিনি আমার পিতা, নিত্যকাল আমাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার বাৎসল্য ফুটিয়া আসিতেছে, নিত্যকাল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার পিতৃভক্তি ও দাস্যরস ফুটিয়া আসিয়াছে, এ যদি সত্য না হয়, তবে তাঁর সঙ্গে

আমার সম্বন্ধ জীবনাবধি, মৃত্যুর পরে সে সম্বন্ধের অনুকরণ বা অনু-শীলন করা কুসংস্কার ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

আর এ সম্বন্ধ যদি নিত্য না হয়, তবে বাৎসল্য এবং দাস্য এই দুই রসকে স্থায়ী রসও বলিতে পারি না। আর এসকল রস যদি স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে পিতৃশ্রাদ্ধের প্রয়োজনই বা কি? তাহা হইলে রসের পথে ও ভক্তির পথে ভগবানের ভজনাও কবি-কল্পনাতে পরিণত হয়।

এ সংসারে পিতাকে পাইয়াছি বলিয়াই ঈশ্বরকে পিতারূপে জানিতে ও ভাবিতে পারিতেছি। এ সংসারে মাতাকে পাইয়াছি বলিয়াই বিশ্বজননীকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণ জুড়াইতেছি। এই পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ যদি অনিত্য ও মায়িক হইয়া যায়, তবে ঈশ্বরের পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের প্রমাণপ্রতিষ্ঠাই বা থাকে কোথায়? তাহা হইলে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব যে বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক ও মায়িক হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিত্য-সিদ্ধ বলিয়াই সংসারের পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র সম্বন্ধ পরিণামী হইয়াও নিত্য। এই সম্বন্ধ ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণ ও প্রস্ফুট হইয়া আছে, এই সংসারে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতর ও স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রতিবিম্ব। এই বাৎসল্য সেই বাৎসল্যেরই প্রতিবিম্ব; এখানে তিলে তিলে ফুটিতেছে; সেখানে প্রস্ফুট হইয়া আছে; এখানে তিলে তিলে গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে সুগঠিত ও পরিপূর্ণ হইয়া আছে; এখানে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেখানে নিত্য-সিদ্ধ হইয়া আছে। আমাদের এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব পুত্রত্ব কন্যাত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধের মধ্যে, দর্পণে যেমন লোকে আপনার মুখ দর্শন করে, ভগবান সেইরূপ অনাদিকাল হইতে আপনার নিত্য-সিদ্ধ রসমূর্ত্তির অনন্ত বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেদিন এই ছবি সেই মূলের সমতুল হইয়া উঠিবে, সেদিন তাঁহার "বহু" হইবার বাসনা তৃপ্ত হইবে। "বহুস্যাম প্রজায়েয়েতি" বলিয়া তিনি প্রজা-সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছিলেন;

সেদিন তাঁর সেই সংকল্প সার্থকতা লাভ করিবে। তারই জন্য এসকল সম্বন্ধকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। এই সকল নিত্য সম্বন্ধের নিত্যত্বের জ্ঞান জাগাইয়া রাখিবার ও প্রোজ্জ্বল করিবার জন্যই, ভক্তিপথের পথিকের নিমিত্ত এই সকল শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ প্রাচীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ন্যায় কেবল একটা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া নহে। তাঁহার নিকটে শ্রাদ্ধ একটা বাহ্য সামাজিক ক্রিয়াও নহে। তাঁহার নিকটে শ্রাদ্ধ ভক্তিপথের একটা শ্রেষ্ঠ সাধন!

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রশ্নোত্তর

হে প্রণয়ী, নিত্য তব এমন কেন
নানান্ ভাব কহ ?
কভু বা তুমি মুখর, কভু
নীরব হয়ে রহ।
কখন তুমি দাসের সম
কখন মোর প্রভু,
নয়ন তব বেদনা-ভরা
চপল হাসে কভু!
কভু বা তুমি শীতল কর
কভু বা মোরে দহ!
নিত্য তব এমন কেন
নানান্ ভাব কহ ?

হে প্রেয়সী, সরস মম জীবন-বীণা
পরশ তব পেয়ে,—
কত-না সুরে বাজিয়া উঠে,
কত-না রাগে গেয়ে!

হে সাধক, নিত্য কেন পড় গো তুমি
মন্ত্র নব নব ?
কত-না আন অর্ঘ্য মোরে,
কোন্‌টি আমি লব ?

নিরালা কভু নয়ন মুদি
ধেয়ানে রহ রত,
কভু বা তুমি কাঙাল সম
মাগিছ বর কত!
বলিছ মোরে কমলা কভু
কভু বা রাধা তব!
নিত্য কেন পড় গো তুমি
মন্ত্র নব নব!

'হে দেবী, ভাবের সুধা-সাগর মাঝে
রতন আছে কত—
কত-না রূপে কত-না রঙে
রঙীন শত শত!'

হে শিল্পী, হর্ম্যে মম আঁকিলে ছবি
গাহিলে কত গান,
আজো কি তব কাজের, বল,
হল না অবসান?
কত-না মালা কত-না হার
গাঁথিলে মোর তরে,
কত-না বাতি জ্বালালে তুমি
আমার ঘরে ঘরে।
পাষাণ কাটি মুরতি গড়ি
করিলে মোরে দান,—
আজো কি তব কাজের, বল,
হল না অবসান?

'হে সুন্দরী, তোমারে হেরি হরষ মম
পেয়েছে রূপে কায়া—
যা কিছু গড়ি যা কিছু গাহি
সবি যে তব ছায়া!'

শ্রী——

সমুদ্র-দর্শনে

[পুরীধামে লিখিত]

কবিতার মুখরতা হইল নীরব,
থেমে গেল সঙ্গীতের সুর,—
সমুদ্রের মহাগান করে অভিভব
মন, বুদ্ধি; চিত্ত ভরপূর।

ভাষা ডুবে ভাবে, ভাব প্রাণের স্পন্দনে,
সর্ব্বেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়তায়;
বাহ্য ডুবে অভ্যন্তরে;—নিগূঢ় মরমে
কি এ সিন্ধু আনন্দ ছড়ায়!

এ কি নিদ্রা? এ কি স্বপ্ন? এ কি জাগরণ?
এ কি দেহ? কই, আমি কই?
শুধু ঢেউ—শুধু ঢেউ—অমৃত-প্লাবন,
সুধা-সিন্ধু করে থই থই!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ভ্রমাবর্ত্ত

১। শিক্ষা

শুনিতে পাই বাঙ্গালা দেশে আজকাল নাকি একটা নূতন ভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া বাঙ্গালী জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত অতি গভীর ভাবে নাড়া দিয়াছে ও তাহারই ফলে চারিদিকেই একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং সেই প্রচুর তাজা রক্তের তপ্ত স্রোতে বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির বিলোল শিরা-উপশিরা গুলিতে ভাদ্র মাসের ভরা নদীর মত টান পড়িয়া পুষ্টির আনন্দের কল-রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। এ নাকি একটা পূরাদস্তুর renaissance.

শুনিতেই মনটা আনন্দে আপনিই নাচিয়া উঠে ও বড় ইচ্ছা হয় কথাটা সত্য হোক। কিন্তু যখন বাস্তব-ক্ষেত্রে নামিয়া চারি-দিকে চাহিয়া দেখি, তখন একটা গভীর নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে আসিয়া মনটাকে জুড়িয়া বসে। কিন্তু একটা বন্যা যে আসিয়াছে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কারণ বন্যাই যদি না আসিবে, তবে শুক্‌নো ডাঙা পাঁকে ভরাইয়া বাঙ্গালার আনাচে-কানাচে এত ঘোলা কাদা জল ঢুকিল কোথা হইতে? নদনদী খানা ডোবা সবই বানের জলে একাকার! কিন্তু আজ একজন মাঝিকেও ত পাল তুলিয়া বাঁধন খুলিয়া বন্যার আনন্দে ভাটিয়ালী সুরে তান ধরিয়া নৌকা খুলিতে দেখিলাম না। শুধু দেখিতেছি বন্যার প্রবল ঘূর্ণিপাকে বঙ্গবাসী আজও কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে হাবুডুবু খাইয়া প্রচুর পরিমাণে কাদাজল গলাধঃকরণ ও সময়ান্তরে তাহা উদ্গীরণ করিতেছে। এই বন্যাটি যে বাঙ্গালী জীবনে কিছু

মাত্র খাত-সহা হইয়াছে তাহার কোনও লক্ষণই ত এপর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গেল না।

বন্যার যাহারা অপেক্ষা রাখে ও তাহার জন্য আপনাদের প্রস্তুত রাখিতে পারে, বন্যা তাহাদের জন্যই মুক্তি ও আনন্দের বার্ত্তা লইয়া আসে। কিন্তু শুষ্ক মরুভূমির তপ্ত বালুতে পড়িয়াও যাহাদের অন্তরের মাঝে উন্মত্ত বিপ্লবের ডম্বরু বাজিয়া উঠে না, সনাতনী নাগ-পাশের কঠিন বেষ্টনের ভিতর অসাড় হইয়া পড়িয়া একদিনও যাহাদের মরিয়া হইয়া উঠিবার সাধ্য ঘটে নাই, বন্যা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—ঘূর্ণিপাকে তাহাদের শুধু হাবুডুবু খাইয়া মরাই সার! গভীর সংশয় জাগিতেছে—আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রস্তরীভূত-সামাজিক আচারের ত্রয়াবর্ত্তে পড়িয়া আমরা শুধু ঘুরিয়া মরিতেছি। এই ঘূর্ণিবেগ ছাড়া বাঙ্গালী জীবনে আর কোনও প্রকার গতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ঘূরপাক ব্যাপারটা যেমন নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক, নিরর্থক ও অতি কিম্ভূত-কিমাকার, বাঙ্গালীও আপনার দ্বারা ক্রমশঃ সেই ভাবটা জাগাইয়া তুলিয়া নিজেকে শুধু হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে।*

শিক্ষার ভিতর সাধনা নাই—আছে শুধু ফাঁকি, আর শুধু আমরা ছাড়া সেই ফাঁকিতে আর কেহ পড়িতেছে না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া-কলাপের ঘোরপ্যাঁচ, নিরর্থক জটিলতা, ও নিক্তিওজনে দিন-কাল নির্ণয় প্রভৃতির অশেষবিধ ব্যাঙ্গমার মত শিক্ষার বিচিত্র ব্যবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যখন গণ্ডীর সীমানায় আসিয়া পৌঁছাই, তখন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারি—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মতই আমাদের শিক্ষার এই লঙ্কাকাণ্ডও বস্তুত আগাগোড়াই এক ভূতগত ব্যাপার। শুধু হৈচৈ—চিত্তের সহিত কোনো সম্বন্ধই

* আজ শুধু শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই—ত্রয়াবর্ত্তের আর দুটি আবর্ত্ত অর্থাৎ সমাজ ও সাহিত্যের কথা ক্রমশঃ তুলিব।

নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মানুষের ভিতরকার সত্য মানুষটিকে জাগাইয়া তুলিবে ও তাহার অভ্যন্তরস্থ গর্দ্দভটিকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিবে, যেন মধ্যরাত্রে সে তাহার অসহ্য উচ্ছ্বাস সুরু করিয়া না দেয়। অনেক সময় সত্য সত্যই সন্দেহ হয়, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক ইহার উল্টাদিকেই কাজ করিয়া যাইতেছে কি না।

হাতে-খড়ির পর হইতে বাঙ্গালীর কিরূপ শিক্ষালাভ হয় তাহা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেই অবস্থাটা অতি সহজেই বোধগম্য হইবে।

শিশুকাল হইতে চিরকালই বাঙ্গালীর ছেলে 'তেলেজলে' মানুষ বলিয়া, একটা কথা চলিয়া আসিতেছে। আমি সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ করি না। প্রবচনটির গূঢ়ার্থ এই মনে হয় যে, বাঙ্গা-লীর জলভরা মাথায় যা কিছু বিদ্যা প্রবেশলাভ করে তাহাই তেলের মত উপরে ভাসিয়া থাকে। তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই সুলভ। যাহা হউক, শিক্ষা সুরু হইতে না হইতে পাঠ আরম্ভ হইল—গোপাল বড় সুবোধ বালক, তাহাকে যে যা দেয় তাই খায় ও যে যা বলে তাই করে। যে প্রাণীকে যে যা দেয় তাই খায় ও যে যা বলে তাই করে, সে যে কি জন্তু তাহা কোনও প্রাণী-তত্ত্ববিৎ তাঁহার জীবন-ব্যাপী অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে স্থির করিতে পারেন কি না সন্দেহ—অন্ততঃ জগতের কোনও পশুশালায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ একটি জীব সংগৃহীত হয় নাই। তারপর সনাতনী বিদ্যার গোযানে সংযুক্ত হইয়া গুরুমহাশয়ের লাঙ্গুলমর্দ্দন উপভোগ করিতে করিতে বাঙ্গালী-নন্দন সেই যুগসম্মানিত চক্রাঙ্কে চলিতে সুরু করিল। এইরূপে শনশনায়মান বেনুবনের মধ্যদিয়া ভূতভয়গ্রস্ত বেচারীর মত সচকিত চিত্তে বিদ্যামার্গের বহুতর স্মৃতিচিহ্ন পৃষ্ঠে আঁকিয়া কোনোরূপে খাবি খাইতে খাইতে সে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়। সেখানে আসিয়া মাথার ভিতর তাহার সবই গোল বাধিয়া যায়।

এতদিন চারিদিকের তাড়ায় যে বুদ্ধিবৃত্তি তাড়াহত মূষিকের মত কূটস্থ হইতেই শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছিল, আজ বড় বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিতেই ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যামিতি প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের ভিতর ছড়াইয়া পড়িবার জন্য তাহার উপরে কড়া হুকুম আসে। পাঠশালায় বেচারা তাড়া খায়, ছড়াইয়া-পড়া বুদ্ধিবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য,—আর সকুলে আসিয়া আবার তাহাকে বিকেন্দ্রীকরণ করিবার জন্য তাড়া খাইতে খাইতে তাহার প্রাণ যায়। এইরূপে তাপমানের এক যায়গায় ঠাসা পারদকে হঠাৎ একবারে ভাঙিয়া দিলে তাহার যে দশা হয়, ইহাদের অবস্থাও কতকটা সেইরূপই দাঁড়ায়। তারপর দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে পরীক্ষার বিষম ঠেলা ও তাহার তাড়নায় মরিয়া হইয়া শিক্ষার্থীদিগের, বাজারের বর্ত্তমান কালের পেটেন্ট ঔষধের মত 'সর্ব্ব-রোগহর' নোট মুখস্থ করিবার পালা। সুতরাং ঘটে যাহা দাঁড়ায় তাহা বুঝাই যায়। তারপর অবিভাবক ও পাড়ার বিজ্ঞ মুরুব্বি-দিগের উপদেশ এবং সভ্যতাভব্যতা শিখাইবার অসহ্য অত্যাচার। এই নীতিশিক্ষা ও হিতোপদেশের ফলেই তাহারা শৈশবে অকালপক্ক যৌবনে মহাপ্রবীণ ও বুড়োবয়সে নতুন খোকা সাজিতে শিখে।

এইরূপে অন্তঃসার নামক পদার্থটির নিঃশেষ-বিনিময়ে অমূল্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া তরুণ বঙ্গ-সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে জগৎজয়ে উৎফুল্ল দশাননের মত বীরদর্পে 'রণং দেহি'র পরিবর্ত্তে 'বিদ্যাং দেহি' বলিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। মহাকায় বালীর মত আমাদের বিপুল ইউনিভার্সিটি গম্ভীর ভাবে তাহার বিশাল লাঙ্গুলে সমাগত বিদ্যার্থীটির কণ্ঠদেশ মক্ষমরূপে জড়াইয়া ধরিয়া পরীক্ষার সপ্ত সমুদ্রে পরম যত্নের সহিত বার বার উত্তমরূপে চুবাইয়া অবশেষে লাঙ্গুল-পাশ হইতে যখন তাহাকে মুক্ত করে, তখন সে বেচারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে কি খাবি খাইয়া মরিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে

পারে না। অতঃপর চিরজীবনটাই তাহার গলাধঃকৃত লবণাক্ত সলিলরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে প্রাণান্ত হইতে হয়।

এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিঙ্গনের দৃঢ় পাশ হইতে বিদ্যার্থী যখন মুক্তিলাভ করিল তখন সে বহুদিনের জালে জড়ানো শুষ্ক পুরাণো নিঝুম মাছিটি! লোকে ভাবে বিদ্যার আধিক্যবশতঃ চাঞ্চল্য ও প্রগল্ভতা ত্যাগ করিয়া সে গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। চোক মুখ পা ডানা সবই আছে, নাই শুধু প্রাণ নামক একটি পদার্থ—Finished and finite clods, untroubled by a spark.

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের পরম গৌরবের বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি লৌহ নিষ্কাসনের চুল্লী বিশেষ (blast furnace)। এখানে বঙ্গ খনিজাত তরুণবয়স্ক যত খনিজ লৌহ (ores) প্রবেশ করাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে খাঁটি লৌহের অংশটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাসিত করিয়া অবশেষে ডিগ্রী পাশের দ্বার দিয়া অপদার্থ অঙ্গার-রূপে (slags) সংসারের ক্ষেত্রে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

এই অবস্থায় যখন পৌঁছান গেল, তখন বঙ্গসন্তান বহিরাকারে 'কুব্জ পৃষ্ঠ-ন্যুব্জ দেহ' এবং পৃষ্ঠে একগাদা অজ্ঞাত ভূতের বোঝা লইয়া সংসারের মরুভূমির মধ্য দিয়া একটা অকারণ যাত্রা করিয়াছে। বয়সে নবীন হইলেও দেহে মনে তখন সে বৃদ্ধ—মাথা হইতে তাহার স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি, আশা-আবেগ ও উদ্দাম-আকাঙ্ক্ষা-সম্বলিত মগজটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাসিত হইয়াছে। তখনই হইল শিক্ষার সমাপ্তি। অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে অদৃষ্টের যে একটা মস্ত পরিহাস ছিল, সেটা সে প্রচুর রসিকতার সহিত পুরাদস্তুর সারিয়া লইল। বাঙ্গালী জীবনের এই নাট্যটিকে ট্র্যাজিডি বলা উচিত, না ইহা বাস্তবিকই প্রহসন আখ্যা পাইবার যোগ্য, তাহা নির্দ্ধারণ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

বাস্তবিকই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে

যে মানুষকে আর কিছুতেই মানুষ থাকিতে দেওয়া হইবে না। যে খুঁটিটাকে অবলম্বন করিয়া ও যাহার জোরে পৃথিবীর সব টানাহেঁচ্‌কা আমরা সহ্য করিব, সেই খুঁটিটাকেই সে বিষম ঢিলা করিয়া দিতেছে। সুতরাং একটু ঠেলা লাগিলেই—একটু টান পড়িলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বাস্তবিকই পুরুষত্বহীন করিবার, উৎসাহ উত্তেজনা ও উদ্দাম আগ্রহকে দমাইয়া দিবার এমন ধন্বন্তরি আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মত আর আছে কি না সন্দেহ।

বাজীকরের কি সম্মোহন ভেরীই আজ বাঙ্গলার দিকে দিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। মনের আবেগ উদ্যমকে ছেলে-ভুলানো ছড়ায় ঘুম পাড়াইয়া, আপনার ব্যক্তিত্বকে উঁচাইয়া ধরিবার শক্তি ও আগ্রহকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া সার্জ্জারীর বিষম ছুরি চালাইয়া আমাদের মূর্চ্ছিতাবস্থায় সে আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডটা কাটিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। তিন দিনে একটা লাল রক্তের তাজা মানুষকে পোষা বিড়াল বানাইয়া দেয়—এমন যাদুকর আর কি কোথাও আছে?

মেয়েদের শিক্ষার অবস্থাটাও ঠিক ঐ একরকমই। অর্দ্ধশতাব্দী কালেরও অধিক 'স্ত্রীশিক্ষা' 'স্ত্রীশিক্ষা' করিয়া এত আড়ম্বর এত চীৎকার যে আমরা করিলাম তাহার ফল কি হইল? শুধু অশিক্ষায় যদি ইহার পর্য্যবসান হইত তাহাতে বিশেষ ক্ষোভ কিম্বা ক্ষতির কারণ ছিল না। কারণ সাত শ বছরকার অন্ধকারের মহাসমুদ্রে পঞ্চাশ বৎসরের অশিক্ষার কৃষ্ণসলিলা স্রোতস্বিনীটি এমন বিশেষ কিছু আর আধিক্য আনিতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃত পরিতাপের বিষয় এই যে, অশিক্ষা নয়, কুশিক্ষাই আমরা আমাদের নারী-সমাজের হাতে পরম আদরে তুলিয়া দিয়াছি।

পুরুষের শিক্ষার তবু একরূপ ব্যবস্থা আছে বলা চলে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে সেরূপ কোনো অপবাদ দিবার যো নাই। মেয়ে-

দের শিক্ষার ভারটা সম্পূর্ণই আমরা মিশনারীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আশু ও ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'সুকথিত বক্তৃতা' ও 'সুলিখিত প্রবন্ধের' অভাব হইবার আদৌ কথা নহে। কিন্তু সৌখীনতাটা যে অতবড় একটা জরুরী ব্যাপার তাহা ত ইতিপূর্ব্বে মোটেই জানা ছিল না। কারণ আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষাটা একটা সখ বই আর কি? মিশনারী মেয়ে-স্কুলে আর কি হয়? সেখানে বোলতার মত কোমর-বাঁধা যত বিবির দল ক্রমাগত ভন্ ভন্ করিয়া মেয়েদের কাণে অনায়ত্ত খৃষ্টান ধর্ম্মের ধান ভানিতে থাকে ও মাঝে মাঝে শিবের গীতের মত দু'চার পাত ইংরাজী পড়া হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর মেয়েরা খৃষ্ট ভজনা করিতে শিখুক বা না শিখুক, ভারতের আবহাওয়াটাকে অসহ্য বোধ করিতে ও ভারতীয় জীবনের আদর্শটাকে অবজ্ঞা করাটাই শিক্ষিত মহিলাজীবনের দস্তুর মনে করিতে বিলক্ষণ শিখে। কারণ অধিকাংশ মিশনারীই অশিক্ষিত ও পেশাদার খৃষ্টভক্ত। ভারতের আদর্শ, প্রথা ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের যে জ্ঞান, আপনাদের প্রচার্য্য খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্বের সত্যার্থবোধও তাহাদের তদ্রূপই। কাজেই তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির অধিষ্ঠান স্থানটিকে মূঢ়তা ও অজ্ঞতার গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং উক্ত মিশনারী-বুদ্ধির প্রয়াগ মহাতীর্থে স্নান করিয়া আমাদের বালিকারা যে কি শিক্ষালাভ ও পুণ্যসঞ্চয় করেন তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। বৎসরের পর বৎসর দরিদ্র বিশীর্ণ ভারতের রক্তে তাহাদের চির-অনিবৃত্ত পিপাসা মিটাইবার চেষ্টা করিয়া মেয়েরা শিখে শুধু বিলাতি প্যাটার্ণে কার্পেট বুনিয়া শোভন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ঘরের দেওয়াল অশোভন করিয়া তুলিতে ও সস্তা বিলাতি আসবাবপত্রে ঘরখানির পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য একেবারে লোপ করিতে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের আরও কয়েকটি পরম উপকার সাধন করিতেছে। পচা পিয়ানোর দুই

চারিটা ঠুংঠাং শব্দ করিতে শিখাইয়া তাহারা আমাদের দেশের অতুলনীয় সঙ্গীত-কলার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা এখন পিয়ানো ও অর্গ্যানে মশ্‌গুল্‌। দেশের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যে সঙ্গীত-কলা নানা যন্ত্রসহযোগে একদিন সমস্ত দেশখানিকে আনন্দের আবেশময় ঝঙ্কারে মুখর করিয়া তুলিত, আজ তাহা অতীতের অখণ্ড স্তব্ধতার অতলতায় ডুবিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় এখন—

নীরব ররাব বীণা মুরজ মুরলী।

ভারতীয় সঙ্গীতের নিত্য নব নব লালিত্য-ভঙ্গিমাময় যে চিরন্তন রাগিণীটি একদিন আমাদের পরিক্লান্ত অন্তরেও শান্তির সুধাধারা বর্ষণ করিতে বিরত থাকিত না, আজ পশ্চিমের ঝোড়ো হওয়ায় সে রাগরাগিণী, সে সঙ্গীতালাপ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা তাহাতে কিছুমাত্র বিষাদের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া ঝোড়ো হাওয়ার সুর ভাঁজিতেই সুরু করিয়া দিয়াছি! বৈষ্ণব কবিদের সেই পূর্ব্বরাগ সম্ভোগ অভিসার মান বিরহ ও মিলনের মধুময় সঙ্গীত, বাউলদের আপন-ভোলা ও মন-উদাস-করা একতারায় বাজানো গানগুলি, রাখাল কৃষাণের মেঠো সুর, মাঝিদের ভরা-বাদলের ভাটিয়ালী আলাপ, নর্ত্তকীদের হাস্যলাস্য ও আবেগ মাধুরীপূর্ণ গীত ও নৃত্যকলা, প্রবীন তপস্বীদিগের জীবনব্যাপী সাধনার প্রাণময় জীবন্ত সঙ্গীত বর্ত্তমানের পৃষ্ঠা হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া বাঙ্গালায় আজ তাহা অতীতের স্মৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বীণা, তানপুরা, সারেঙ, মৃদঙ্গের স্থলে হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোনকে পরম আদরের সহিত বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেখানে সঙ্গীতের স্পন্দমান্‌ জীবন্ত মূর্ত্তি বিরাজ করিত, আজ সেখানে জীবনহীন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—যেখানে তপস্যা ও সাধনা ছিল, কার্য্যাবকাশের সৌখিনতা আসিয়া সেস্থান অধিকার করিয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছি শিক্ষা

আমাদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। মনের ক্ষুধা মিটাইতে পারে বা জগত-ব্যাপারে কাজে লাগিতে পারে এমন কোনো সম্বলই সে আমাদের হাতে দিতে পারিতেছে না। আমাদের দেশে একটা ধূয়া উঠিয়াছে যে বর্ত্তমান বিদ্যাটা—'অর্থকরী' বিদ্যা। এই 'অর্থ' যদি শ্বশুর মহাশয়ের অর্থ না হয়,তবে কথাটার কোনো অর্থই নাই। কারণ প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি সম্বন্ধে কোনো বিশেষ কার্য্যকারী জ্ঞানই আমাদের হইতেছে না। আমাদের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের theorist হইবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা আছে। তাই কি practical কি theoretical যে কোনো বিষয়েই শিক্ষালাভ করিয়াও আমরা আগাগোড়া সকলেই অবশেষে হতাশভাবে theorist হইয়া পড়িতেছি। সর্ব্বাপেক্ষা কোনও কার্য্যকারী (practical) বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াও শিক্ষার শেষে আমরা উক্ত কার্য্যকারী বিদ্যাটিকে সম্পূর্ণরূপে একটি অকেজো theoryতে পরিণত করিতেই বরাবরই আশ্চর্য্যরূপ দক্ষতা দেখাইয়া আসিতেছি। কাজে কাজেই অর্থনীতির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও আমরা আইন ব্যবসা ও অধ্যাপনা ছাড়া আর কোনও কাজই খুঁজিয়া পাই না। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লোকে সাধ্য-পক্ষে যাইতে চায় না। এ বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা ও চেষ্টা উভয়েরই সমান অভাব। সুতরাং আমাদের বিদ্যাটা যে অর্থকরী বিদ্যা, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? অর্থকরী হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দুঃখিত হইবার বিশেষ কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু গভীর অনুতাপের বিষয় এই যে, বিদ্যাটা আমাদের কোনও মতেই অর্থকরী ত নয়ই, বরং বহু বিষয়েই যে ঘোরতর অনর্থকরী, দুঃখের বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিয়া কোনও লাভ নাই।

আমাদের শিক্ষার এই 'অর্থকরী' অভাবটার ক্ষতি যে সুরুচি ও লালিত্য বোধের (æsthetic culture) দ্বারা আংশিক ভাবেও পূরণ হইয়াছে জানিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিব তাহারও উপায় নাই।

কারণ সুরুচি ও লালিত্য বা সৌন্দর্য্য-বোধ বলিয়া কোনো শস্যের চাষ বর্ত্তমানে বাঙ্গালার মাটিতে আদৌ হয় না, যদিও পূর্ব্বে ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণেই হইত। এবিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা নিষ্প্রয়োজন; কেননা প্রতিনিয়তই ইহা আমাদের আচারে ব্যবহারে বেশ-ভূষায় ও দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতেই অতি নির্লজ্জ-ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

পরিচ্ছদ আমাদের কি অপূর্ব্ব! ধুতির উপর কামিজ, কলার ও বুকখোলা কোট পায়ে মোজা ও বুট। এ এক অপরূপ অর্দ্ধ-বাঙ্গালী অর্দ্ধ-ফিরিঙ্গী মূর্ত্তি যেন মধ্যযুগের ইউরোপের পরিকল্পনার মৎস্যমানব বা merman.

নারীর অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। ফিরিঙ্গী বা পার্শী সমাজ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার স্বর্গরাজ্য বা utopia। কি কুক্ষণেই বঙ্গদেশের নারীসমাজে পার্শী ঢং আসিয়া ঢুকিয়াছিল। আজকাল একদল ফিরিঙ্গী অপর দল রূপান্তরিত পার্শী ঢঙে মশ্গুল! যেন বাঙ্গালার বেশ বা বাঙ্গালীর রুচি ও লালিত্যবোধ বলিয়া কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নাই। এই হীন অনুকরণ-স্পৃহা মানুষকে যে অধঃপতনের পথে ক্রমশঃ টানিয়া আনে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দেশীয়তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাটাই এখন আজকালকার দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ঢাকাই শাড়ী ও মসলিন, বেনারসী শাড়ী ও রেশম, মুর্শিদাবাদের গরদ, অমৃতসরী শাল্ প্রভৃতি গিয়া জার্ম্মাণ সিল্কের পার্শী শাড়ী ও জাপানী সিল্কের বীভৎস বডিসের রাজত্ব ও প্রতিপত্তির দিন আসিয়াছে।*

আসল কথা, আমাদের গোড়ায় হইয়াছে গলদ এবং সঙ্কট হইয়াছে উভয় দিকে। সমস্যাটা দাঁড়াইয়াছে ঐ খানেই। নূতনে ও পুরাতনে যে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহারই মাঝে পড়িয়া

* লেখক এখানে পঁচিশ বৎসরের আগেকার কথা কহিতেছেন।

আজ আমরা নিষ্পেষিত হইয়া মরিতেছি। কেহ কাহারও বশ মানিতে চায় না। পরস্পর পরস্পরের হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া প্রাণস্পন্দনকে নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিতে চায়! আপোষে আপনাদের বিবাদ কেহ মিটাইতে রাজী নহে। পৌরাণিকী কল্পনাতে ও বৈজ্ঞানিক তথ্যে, প্রাচীন স্মৃতির আধিপত্যে ও বর্ত্তমানের নূতন অবস্থা-জাত নব নব প্রয়োজনের দাবীতে, দেশের আবহাওয়ায় ও বিদেশের শিক্ষায় চিরদিনের সংস্কারে ও আজিকালিকার আকাঙ্ক্ষাতে, বিরামের আলস্যে ও ছুটিবার বেগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। বিবাদ কেহ মিটাইতে চায় না—আক্রোশ কেহ ভুলিতে চায় না। কিন্তু বিবাদ মিটাইতেই হইবে, আক্রোশ ভুলিতেই হইবে—আপোষের যথেষ্ট সময় হইয়াছে।

কিন্তু আপোষের কোনও চেষ্টা এপর্য্যন্ত ত দেখা গেল না। পুরাতন পন্থী যাঁহারা, তাঁহারা ভারতের সৌধ-শ্মশান হইতে জীর্ণ ইট কুড়াইয়া তাহারই সাহায্যে প্রাচীনের আদর্শ বজায় রাখিয়া ভারতের নব গৌরবের মহামন্দির রচনা করিতে চান—কিন্তু জীর্ণ ইটে নূতন এমারত বনাইবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবেই। অপর দিকে নূতন বা পাশ্চাত্যপন্থীরা বিলাতী ইট ও মালমসলায় শক্ত করিয়া এক নূতন অট্টালিকা তৈয়ার করিতে চাহেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য বটে। কিন্তু যখন তাঁহারা সেই নূতন অট্টালিকাটিকে একটি মার্চ্চেণ্ট হৌসে পরিণত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান, তখন তাঁহারা একটা নিতান্ত ভ্রান্তি ও হৃদয়হীনতার কাজ করিয়া বসেন। দুই দলই দুই সীমানায় উৎকট রূপে ঝুঁকিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং কাজ কিছুই হইতেছে না—অনর্থক শুধু দ্বন্দ্ব বাধিতেছে। কারণ জীর্ণ ইটে নূতন মন্দির রচনা ও চিরন্তন মন্দিরের ভিটায় সওদাগরী হৌস খাড়া করিতে যাওয়া এই উভয় চেষ্টাই যে ব্যর্থ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রকৃত প্রয়োজন এখন প্রতীচ্য কারখানার ইট ও মালমসলার সাহায্যে অতিদৃঢ় ও সুদৃশ্য

করিয়া ভারতের চিরন্তন ও নিত্য আদর্শের অনুরূপে একটি সুবিশাল নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করা। ইউরোপীয় কারখানার শক্ত মালমসলার পরিবর্ত্তে ভারতের প্রাচীন জীর্ণ ইট ব্যবহার করিলে চলিবে না বা ভারতের চির-আনন্দ-নিকেতন কত যুগযুগান্তের সুখদুঃখ ও পতন অভ্যুদয়ের স্মৃতি-জড়ানো মন্দিরের পরিবর্ত্তে সওদাগরী হৌসও তৈরি করিলে চলিবে না। ভারতের আদর্শ ও প্রতীচ্যের মালমসলার সহ-যোগে যাহা দাঁড়ায়—আমাদের তাহারই এখন প্রয়োজন।

সারা বাহির যখন বর্ত্তমানের দক্ষিণে হাওয়ায় মাতাল হইয়া উঠি-য়াছে, অন্তরের কুন্দ কুসুমটিকে তখন আর বাতাসের লহর হইতে আড়াল করিয়া অতীতের কোটরের ভিতর সংগুপ্ত রাখিলে চলিবে না। বর্ত্তমানের দক্ষিণে হাওয়ায় অন্তরের কোরকটিকে তখন ফুটা-ইয়া তুলিতেই হইবে। মানুষের জাতীয় জীবনটা এইরূপ কতকটা ফুল গাছের মতই। তরুটি যখন নবীন ও সতেজ থাকে তখন সে আপনার সঞ্চিত রসের অসহ উচ্ছ্বাসে সারা বৎসর ধরিয়াই দলে দলে অজস্র ফুল ফুটাইয়া তুলিতে থাকে। গ্রীষ্মের প্রখরতা, বর্ষার অশ্রান্ত ধারাকুল কাতরতা, শীতের তুহিনাঘাত তাহার সেই ভিতর-কার বসন্তের উদ্দাম আনন্দের উচ্ছ্বসিত ফেনিল বিকাশকে কোনো মতেই আর বাধা দিতে পারে না। একটা নবোন্মেষিত জাতির প্রগল্‌ভ প্রতিভাকে রোধ করিতে পারে, এমন দুর্দ্ধর্ষ বাধা পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সেই ফুলের গাছই আবার যখন প্রাচীন হইয়া আসিতে থাকে—যখন তাহার ভিতরকার জীবনী-সুরার সফেন মাদকতার তীব্রতা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আনন্দের অসহ আবেগ মন্থর হইয়া আসে, তখন গ্রীষ্মের তাপে সে ম্রিয়মাণ হইয়া মাটিতে নুইয়া পড়ে—শীতের অসাড়তা তাহাকে আর্ত্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ভাঙ্গা দেউলের মলিন সিংহাসন তাহার সারা বৎসর শূন্য পড়িয়াই থাকে—শুধু ভরা বসন্তের মহোৎসবের দিনে পুরাতনের স্মৃতি ও চিরদিনের প্রথা বজায় রাখিবার জন্য শীর্ণ দু'চারিটি কিশলয়ে

পূজার উপচার সাজাইয়া আনন্দহীন উৎসবের ক্ষীণ আয়োজন হয়! বসন্তের সুরা আর তাহার প্রাণে সে যৌবনের তীব্র মাদকতা ফিরাইয়া আনিতে পারে না। তাই উৎসবময় অতীত জীবনের আনন্দের স্মৃতি মনে জাগাইয়া চক্ষে শুধু জল আনে।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

গান

তেমনি করে হেসে হেসে
এস, এস, এস হে!
সকল ব্যথা জুড়িয়ে যাবে
মধুর তব পরশে!
সকল দুঃখ ডুবিয়ে দেব,
নীরব তব হরষে!

চোখের জল ফুলের প্রায়
ঝরবে তব পদ-তলায়!
হাস্‌ব আমি আরো হাস্‌ব
তব হাসির ঢেউয়ে ভাস্‌ব
আমি সারাজীবন ছড়িয়ে দেব
মধুর তব পরশে!
তবে তেমনি করে হেসে হেসে
এস, এস, এস হে!

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।

[১১]

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথায় গেল ?

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাঙ্গালা হইতে লোপ হইয়াছে একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কিছু কিছু ছিল। ইংরাজেরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানেরা সেরূপ পারেন নাই। অনেক স্থানেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ছোট ছোট রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দিন বোলবন্ যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোণার-গাঁওএর রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন নব-দ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব্ব বাঙ্গালা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোণারগাঁওএর রাজারা যে সব হিন্দু ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা একখানি পঞ্চ-রক্ষার পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানি ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃঃ অব্দে লেখা। পঞ্চরক্ষার পুঁথিখানি বৌদ্ধ, উহাতে পাঁচখানি পুঁথি আছে। পাঁচখানিই আরম্ভ হয়—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান" ইত্যাদি। লেখক বলি-তেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধু-সেন আমাদের রাজা। মধুসেন যে পূর্ব্ব বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ না পাইলে আমরা মধুসেনকে বল্লালসেনের বংশধর

বলিতে চাহি না। তবে ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন একথা বেশ বলা যায়। এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত সে কথাও বলা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থসকল রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নগ্নাঃ বৌদ্ধাদয়ঃ"। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাঙ্গলা অক্ষরে তালপাতায় লেখা বোধিচর্য্যাবতারের পুঁথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৩৬ সালে। বোধিচর্য্যাবতারখানি মহাযানের পুঁথি—বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুঁথি। পুঁথিখানি সোহিনচরী প্রদেশে বেণুগ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধভিক্ষু উহা লেখেন আর একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাঙ্গালার অনেক কায়স্থ যে তখনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্ব্রিজে একখানি বাঙ্গলা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধধর্ম্মের পুঁথি আছে। সেখানি ইংরাজী ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুঁথি। পুঁথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোন বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে "পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্ব্বে আরও অনেক পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ মিউজিয়মে ঐরূপ আর একখানি তালপাতার পুঁথি আছে, সেখানি ১৪৭৯ বিক্রম সংবৎ বা ১৪২৩ খৃঃ অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি। বৌদ্ধস্থবির শ্রীবররত্ন মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপ্‌লিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিস্ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরও অনেক-

গুলি কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুঁথি আছে। তাহার মধ্যে দুই একখানি বাঙ্গলা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধবিহার ছিল বৌদ্ধস্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি বিশেষণ এই "শূন্যতাসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী" "সর্ব্বালম্বনবিবর্জ্জিতাদ্বয়বোধিচিত্তচিন্তামণিপ্রতিরূপক"। সুতরাং পনর শতকেও বাঙ্গালায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুঁথি-পাঁজীও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি নামে একজন বড় পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের নিকট "রায়মুকুট" এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনরখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অমরকোষের টীকার তারিখ ইংরাজী ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্ততঃ শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুঁথি পড়িতে বাধ্য হইতেন—একথা বেশ বুঝা যায়।

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাজী ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবন-চরিত লেখা হয়। চূড়ামণি দাস একখানি চৈতন্য-চরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয় তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ আর একখানি 'চৈতন্য-চরিত' লিখিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাঙ্গালা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উর্গানামক নগরে এক মহাবিহারে তারানাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধ-গুপ্ত নাথ নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাঙ্গালাদেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুঁথি-পাঁজী ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম্ম-পণ্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভধন নামে একজন পণ্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইখানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে পান। কিন্তু সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধিমন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে কোন বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট, প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধ-গুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধী-গর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরি-গুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড় বড় তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দিরি পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে। উহাকে এখন

'পাটন' বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য্য ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধিস্তূপের মত একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্ম্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া উহার একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহা-বোধি নামে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। নীচের দিকে একটু একটু লোণা ধরিয়াছে কিন্তু উপরের অংশ ঠিক আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোধিগয়ার মন্দির ইংরাজেরা মেরামৎ করিয়া দিলে যেরূপ হইয়াছে সেটিও ঠিক সেইরূপ! মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্য্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠার শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ ১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমত কাশীর রামাপুরায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি পাঁচ জন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে-বার লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুঁথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এসিয়াটিক সোসাইটীতেও আছে। কিন্তু সেটা মূল পুঁথি নয়—নকল করা। পুঁথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম দুইই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম্ম ছিল। মিনহাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথাকামান ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা "ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব মাথাকামান ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। আকবরের সময় নানাদেশের ও নানাধর্ম্মের পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনও তাঁহারা ইংরাজ-অধিকৃত দেশে কোন বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকবার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড় কদাচারী হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথম বিদ্রূপ করিতেন পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রূপের একটা উদাহরণ "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীমা "বুদ্ধবিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও

ছিলেন না—শৈবযোগীরাই উঁহাদের প্রধান শক্র ছিল। শেষ-কালের বৌদ্ধগ্রন্থসকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈবযোগীদের উপর উঁহাদের বড়ই রাগ। স্বয়ম্ভুপুরাণ নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজী চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। স্বয়ম্ভুপুরাণের শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাঙ্গালাতেও বোধ হয় শৈবযোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময় মনে হয়, এই সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীর আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জ্জিলিঙ্গ, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালী বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জ্জিলিঙ্গের বৌদ্ধেরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ্গে কিরূপে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবেশ করে তাহার কতক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। সেটা সমস্ত তিব্বত হইতে আসা। নেপালেও তিব্বতীরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরাণ ভারত-বর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লাভ করেন, সে ধর্ম্মও বর্ম্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙ্গামাটিতে যে সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু

নিকটবর্ত্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ, যে উহাতে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহামান্য শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড গেট সাহেব আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া পুঁথি ও কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বোধ হয় যে উড়িষ্যার সরাকী তাঁতিরা এখনও বৌদ্ধ। তাহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই সরাকী তাঁতি যে কেবল জঙ্গল মহলেই আছে এমন নহে। পুরী জেলার দুই একটি থানায় এবং কটকেরও কয়েকটি থানায় সরাকী তাঁতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়ও সরাকী তাঁতি আছে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এই সকল বৌদ্ধকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আগামী বারে দেওয়া যাইবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিয়োগের বিলাস

এ জগৎটা ছুটেছে একটা মোহবন্ত মিলনেরি ঝোঁকে! মিলন! মিলন! মিলন! যোগ! যোগ! যোগ! হে যোগীবর! ঐ যে তুমি যোগে যোগে যুক্ত হ'তে মিলনেরি ভজনা কর্‌ছ, তুমি কি চিরতরে তাতে মিলিত হ'তে পেরেছ? আর তুমি প্রেমিক! তুমি যে বাহুপাশে বেঁধে, বঁধুয়াকে বুকে ধরে রয়েছ, তোমার এ বঁধুয়া লাভ কতক্ষণের? ওগো মা জননি! আপনার গায়ের রক্ত দিয়ে ঐ যে প্রতিমা গড়ে তুলেছ, একি তোমার আজন্মের আত্মবস্তু নিত্য ধন? যদি তাই না হলো, যদি পাওয়ার পরও আতঙ্ক রয়ে গেল, যদি আঁক্‌ড়ে ধরেও নিশ্চিন্ত হ'তে না পার্‌লে, তবে আর মিছে কেন মিলন মিলন ক'রে মর্‌ছ? অমন ক'রে তার পিছু পিছু ছুট্‌ছ! মিলনে কি মিলে বল?

কিন্তু মুখে বল্‌লে কি হয়! প্রাণটা যে পড়ে আছে ঐ মিলনেরি পায়। বুঝ হয়ে অবধি এরি চক্রান্তে পড়ে, দিবানিশি কেবল "থাক" "থাক" "থাক", "রহ" "রহ" "রহ" রব শুন্‌তে শুন্‌তে, কাণের ভিতর তারি পড়্‌তা পড়ে যায়, না-থাকার কথা কেমন কাণে বাজে! ওকথা শুন্‌লে কেমন প্রাণটা ধড়ফড়িয়ে উঠে! মনে হয় ঐ যা গেল! বুঝি সব গেল গো! ওগো মিলন! এ তোমার কি খেয়াল? তুমি হেলে দুলে এসে, খেলার ছলে এই মুখে, চক্ষে, বক্ষে যা কিছু জড়িয়ে জড়িয়ে রেখে যাও, বিয়োগ এসে ত্রস্ত হাতে তা ছিঁড়ে দিতে গিয়ে, আরো তা শক্ত বাঁধনে বেঁধে দেয়। আমি তখন এক দরশনে আসক্ত, পরশনে আসক্ত, শ্রবণে আসক্ত হয়ে, নিতান্ত অশক্তের মত কেঁদে কেঁদে ডেকে বলি, "কোন্ ঋণদায় হতে মুক্ত হবার জন্যে, ওগো মাধব! ওগো রাজার দুলাল! তুমি অমন ক'রে আমাকে বিয়োগের

হাতে বিকিয়ে দিয়ে যাও? সে যে আমাকে পিচ্ছিল পথ দিয়ে, বন্ধুর পথ দিয়ে নিয়ে চলে। আমি যে এপথে চল্‌তে পারি না প্রভো! পা ফস্‌কে গেলে, কে আমায় ধরে তুল্‌বে বল? তুমি হাত বাড়াও, করুণার বশে হাত বাড়াও! আমি ও-হাতে ভর করে একবার সোজা হয়ে চলি। দেখা না হয় তুমি দিও না, দেখা আমি চাই না! চাই শুধু ভর কর্‌তে! পিচ্ছিল পথে ভর কর্‌তে পার্‌লেই আমার চল্‌বে, বন্ধুর পথে ও-বাহু পেলেই আমি বর্ত্তে যাব। এক মিনতি, শক্ত ক'রে ধরো, যেন আমার পা ফস্‌কে গেলেও তোমার হাত ফস্‌কে না যায়। ভয় কোরো না, ও হাতের পরশ আমি আপ্‌নি সাম্‌লে নিতে পার্‌ব। তখন দয়াল! আর ত দূরে রইতে পার না। মুহূর্ত্তে পুলকসর্ব্বস্ব হয়ে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে তা ঢেলে দেও, আমি যেন কদমেরি ফুল হয়ে যাই। আর তুমি বনমালি! তারি মূলে বসে, এক ধৈর্য্য-বিলোপী দৃষ্টিকে চোখে রেখে, দেখার নেশায় আমায় মাতিয়ে তোল। এক মরা-জিয়নো কণ্ঠস্বরে আমার সমগ্র প্রাণটাকে একটা কাণ করে ছাড়। আমি যখন সে কাণ পেতে, চক্ষু মুদে কেবলি একটা শোনার মধ্যে বিভোর হয়ে থাকি, তুমি সেই ফাঁকে একেবারে অন্তর্ধান হয়ে যাও। শোনার শেষে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি আবার সেই ভোগ-বাড়ানো বিয়োগ! নাই তুমি নাই!

চলেছিলাম এভাবেই, যোগ আর বিয়োগের লুকচুরির মধ্যে পড়ে, একটা কুহেলিকার ভিতর দিয়া, বড় দুঃখে। "সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি, দুঃখ রহে তারি ঠাঁই"। দুঃখের উপর দুঃখ এসে বোঝাই হয়ে আমায় ঘিরে ফেল্‌ছিল। আর আমি তারি উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদ্‌তাম যখন তখন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। জান্‌তাম না যে, আমার এই অশ্রুজলই সে দুঃখরাশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাকে দাবিয়ে দাবিয়ে দৃঢ় করে আঁটো করে তুল্‌বে। দেখ আজ আমি সেই দুঃখকে ভিত্তি করে, তার উপরে উঠে

দাঁড়াতে পেরেছি। দুঃখ আজ আমার পদতলে পড়ে! সে আর আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারছে না। এখন যত দুঃখকে পাই, ততই উঁচুতে উঠে যাই। তবু যে এখনও মাঝে মাঝে অশ্রুজল! সে শুধু এ ভিত্তিকে ভিজিয়ে রাখতে। নয় ত শক্ত জমীতে ঘা পড়লেই যে ফাঁটল ধরত। তখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেলে পর, আর ত জোড়া লাগত না। চির-শত্রু সে অবিশ্বাস, ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করে দ্বেষের খাতিরে, খুঁড়ে খুঁড়ে, শক্তকে শিথিল করে আবার স্তূপাকার করে তুলত। আবার সে স্তূপ আমার বুকে এসে ঠেকত। ধন্য গো বিয়োগ! ধন্য তোমার রুদ্র বিলাস! বিভূতি মুর্ত্তিতেই তুমি বিরাট! তরাসে কাঁপানোতেই তুমি কৃপাময়! অবসাদে কাঁদানোতেই তোমার শৈব শক্তির পরিচয়! এতদিন বুঝি নাই, বুঝি নাই, আমি বুঝতে পারি নাই তোমার এ বিলাসের স্বরূপ।

আজ দুঃখদৈন্যের উপরে আমাকে দাঁড় করে, পূর্ণকাম হয়ে তুমি ত্যাগী এসেছ আমাকে বিশ্ব-বিবাগীর বেশে সাজাতে! পরায়ে দিয়েছ সে নাম-জপমালা আমার কণ্ঠে, সে নামের নিছনি আমার কর্ণমূলে, দগ্ধ দেহের ভস্ম আমার ললাটে! পরায়ে দেছ বাধার রুদ্র-অক্ষমালা আমার করে! আমি একে একে সে রুদ্রাক্ষ ঠেলে ঠেলে নীচে নামিয়ে দিচ্ছি, দেখে তুমি উল্লাসে অট্ট হাসি হাসছ! তোমার হাসি শুনে মনে হয় বুঝিবা আমার ভোলানাথ নিজে! ওগো বিলাসিন! তুমি অঙ্গের ব্যাবধান সইতে পারলে না বলে বুঝি আকার সরিয়ে দিয়েছ, ব্যাবধানের বিভীষিকা ভাঙ্গবে বলেই বুঝি এই বিয়োগের বেশে এসে এ বিলাস করছ? তুমি নিজে শ্মশানবাসী, ভস্মের মহিমা তুমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না। পোড়াবার ভঙ্গীতে কেউ ত আর শূন্যকে অমন করে পূর্ণ করে দিতে পারে না। এখন যে অদর্শন অসম্ভব! দূরে থাকা যে হ'তেই পারে না।

"সঙ্গম বিরহ বিকল্পে, বরমিহ বিরহো ন সঙ্গম স্তস্যাঃ
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"

এই বিশ্বচরাচরে অংশে অংশে যাকে প্রকাশ করছে, একাধারে কেউ যাকে ধরতে পারছে না, সেই বিশ্বম্ভর পূর্ণ ভাবে, আজ আমাতে বিদ্যমান! তাবৎ স্থাবর জঙ্গমে যার হাসির কণা লয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, সে পূর্ণ হাসির বিকাশ আজ আমার চিত্তে! এ নিখিলের উদ্দাম বাতাস, যার পরশের আভাস দিতে দিগন্তে ছুটাছুটি করছে, সে দুর্লভ পরশ আমাতেই নিবিড় হয়ে রয়েছে। আজ আমি নভোমণ্ডল হতেও বৃহৎ, ত্রিভুবনের সীমা আজ আমি পেয়েছি। ওগো জনার্দ্দন! যদি এ ক্ষুদ্র তব নিষ্ঠুর পীড়নের প্রসাদেই এত বড় হয়েছে, যদি এভাবে রঙ্গ করেই বিয়োগের বিলাস, বিয়োগের বিকাশ দেখিয়েছ, জানিয়েছ, তবে এভাবে অনঙ্গ হয়েই বেদন চেতনে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ জাগিয়ে রাখ। আমি অতন্দ্র হয়ে তোমার ভূমা সত্বার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, এই মিলনকে আর ব্যাবধানকে, যোগকে আর বিয়োগকে এক বলে জানি। জানি আর ডুবি, ডুবি আর ডুবাই। তখন ডুব্‌তে ডুব্‌তে রুদ্ধ শ্বাসে বদ্ধ নয়নে হে রুদ্র! বল্‌তে থাকি "মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান"।

শ্রীজগদম্বা দেবী।

মায়াবতী পথে

[২]

প্রত্যুষে জন-কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বাঁকিপুরে উপনীত হইয়াছি। শরৎকালের স্নিগ্ধ প্রভাতের মধুর আলোকে আমাদের কক্ষটি ভরিয়া গিয়াছিল। গতরাত্রের অনিদ্রা-বশতঃ চক্ষে তখনও ঘুম জড়াইয়াছিল—কিন্তু সেই আলোক ও কোলাহলের মধ্য হইতে এমন একটা উদ্দীপনা অনুভব করিলাম যে প্রয়োজন সত্বেও পুনর্ব্বার শয্যা-গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। দেখিলাম শুধু আমার নহে, আমাদের কক্ষের সকলেরই চক্ষে, প্রভাত-সূর্য্যের রশ্মি একই প্রকার ক্রিয়া করিয়াছে। আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকলেই একে একে উঠিয়া বসিলেন।

এই বাঁকিপুর ষ্টেশন দিয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছি—এই বাঁকিপুর সহরে কতদিন, কত মাস যাপন করিয়াছি—কিন্তু আজিকার কোলাহল, উত্তেজনা, উদ্দীপনার মধ্যে যেন একটি বিশেষ প্রকার সজীবতা অনুভব করিলাম। এ যেন দীর্ঘ রজনীর নিদ্রার পর জাগ্রত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার চঞ্চলতা। এ যেন সহজ-লব্ধ সৌভাগ্যকে অনুভব করিবার একটা উদ্দাম আনন্দ। হইতে পারে এ অনুভূতির কারণের অস্তিত্ব বাঁকিপুর ষ্টেশনে বিশেষ কোন জিনিসের মধ্যে না থাকিয়া আমার মনের মধ্যেই প্রধানতঃ ছিল—কিন্তু বাস্তবিকই আমার মনে হইতেছিল এ যেন এক নূতন বাঁকিপুর। প্লেগ কলেরার লীলাক্ষেত্র এই অপ্রশস্ত দীর্ঘ অপরিচ্ছন্ন সহরটিতে একটি বিস্তৃত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী একদিন যে তাঁহার বাসা বাঁধিবেন, এ কথা চারি বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও বোধ হয় কাহারও গোচর ছিল না। শুনিয়াছিলাম প্রাদেশিক রাজধানীর

উপযুক্ত করিবার জন্য সহরের পশ্চিম দিকে বহুসংখ্যক গৃহ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। . গাড়ী ছাড়িলে আমরা আগ্রহ সহকারে এই ভবিষ্যৎ রাজ-নগরীর চূণ-সুরকির কঙ্কাল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। হাইকোর্ট, রাজ-প্রাসাদ, রাজ-দপ্তর, নবাগতগণের জন্য অসংখ্য গৃহ প্রভৃতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত করিয়া লইবার জন্য একটা বিপুল ধূম লাগিয়া গিয়াছে! চূণ সুরকি ও ইঁটের স্তূপে স্তূপে রেলের দুই দিক ভরিয়া গিয়াছে। দেখিলাম বাঁকিপুর বিস্তৃত হইয়া প্রায় দানাপুরের প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। এক-দিকে জাহ্নবী এবং অপর দিকে রেল লাইন কর্ত্তৃক আবদ্ধ হওয়ায় এই শীর্ণ সহরটির পক্ষে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বাড়া ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। তাই সহরটিকে রবারের মত টানিয়া যতই বড় করা হইতেছে ততই যেন সরু হইয়া পড়িতেছে। ভবিষ্যতে এই সহরের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম একটি মাত্র ট্র্যাম্ লাইন যাইলেই সহ-রের সকল স্থান সুগম হইবে—এমন কি পর্য্যটকের পক্ষে ট্রেণ হইতে অবতরণ না করিয়া ট্রেণের গবাক্ষ হইতেই নগর পরিদর্শন করা একরূপ চলিতে পারিবে।

বেলা নয়টার পর আমরা মোগলসরাই পৌঁছিলাম। এইখানে আমাদের গাড়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাঞ্জাব-মেল হইতে কাটিয়া আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের পাঞ্জাব-মেলে যোগ করিয়া দিল। সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ধাবনের পর আমরা বেরেলী ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। বেরেলী আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের একটি খুব বড় ষ্টেশন। এখানে নানাদিক হইতে অনেকগুলি লাইন মিলিত হইয়াছে। আমাদিগকেও এইখানে গাড়ী বদল করিয়া রোহিলখণ্ড কুমাউন ছোট লাইনে এক রাত্রির পথ কাঠ-গুদাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

বেরেলীতে নামিয়া আমাদের ব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। কারণ রাত্রি এগারটার সময়ে অর্থাৎ তিন ঘণ্টা পরে—কাঠ-গুদামের

গাড়ী ছাড়িবে। ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে পোষ্ট-অফিস্ দেখিয়া চিঠি লিখিবার বাসনা বলবতী হইল। ডাকঘরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পোষ্ট-মাষ্টার, একটি পশ্চিমদেশীয় যুবক, বিশেষ ব্যস্ততাসহকারে ডাক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, "কি চাই আপনার ?" চাই ত আমার সবই ! থাকিবার মধ্যে আমার মণিব্যাগে পয়সা ছিল। কহিলাম, "খাম, পোষ্টকার্ড, এবং বিশেষ অসুবিধা যদি না হয়, দোয়াত-কলম।" মনে মনে বলিলাম, "এবং একটু বসিবার জায়গা।" পোষ্ট-মাষ্টার আমার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বাক্স হইতে খাম পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যেহেতু তিনি দোয়াত-কলম লইয়া কাজ করিতেছিলেন, দোয়াত-কলম দেওয়া সুবিধা হইবে না—তৎপরিবর্ত্তে কপিয়িং পেন্সিল আমাকে দিতে পারেন; এবং কপিয়িং পেন্সিল্ যে দোয়াত-কলম হইতে নিকৃষ্ট নহে বরং উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে আমার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাকে এমন ভাব ও ভাষা প্রকাশ করিতে হইল যে পোষ্ট-মাষ্টার মনে করিলেন যে লিখিবার যত প্রকার সরঞ্জাম আছে তন্মধ্যে কপিয়িং পেন্সিলই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করি—এবং গৃহে আমার লিখিবার জন্য দোয়াত-কলমের স্থলে একমাত্র কপিয়িং পেন্সিলেরই ব্যবস্থা আছে। দুইখানি চিঠি লিখিয়া লেটর্-বক্সে ফেলিতে গেলাম। পোষ্ট-মাষ্টার লেটর-বক্সে ফেলিতে না দিয়া আমার হস্ত হইতে চিঠি দুইটি লইয়া ব্যাগে পুরিয়া দিলেন। কহিলেন চিঠি দুটি তখনই কলিকাতা রওয়ানা হইবে—লেটর-বক্সে ফেলিলে একদিন বিলম্ব হইত। এই অযাচিত উপকারে আপ্যায়িত হইয়া পোষ্ট-মাষ্টারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

রাত্রি এগারটার সময় গাড়ী ছাড়িলে আমরা শুইয়া পড়িলাম।

সমস্ত রাত্রি ট্রেণের পথ হইতে সম্পূর্ণভাবে অগোচর থাকিয়া প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকার সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কাঠগুদামে পৌঁছিয়াছি! গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া মন নাচিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ, গম্ভীর মধুর রহস্যময় পর্ব্বতের শ্রেণী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে—আদি নাই অন্ত নাই! এই দেব-ঋষি-মুনি-পবিত্র হরপার্ব্বতীর লীলাক্ষেত্র চির-পুরাতন চির-নবীন রহস্যময় হিমালয়ের প্রায় নব্বই মাইল ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে মায়াবতী পৌঁছিতে হইবে।

ট্রেণ হইতে নামিয়া শুনিলাম সোজা পথে আমাদের মায়াবতী যাওয়ার সুবিধা হইবে না, আলমোরা হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে আমাদের এক দিনের পথ বেশী পড়িবে; কিন্তু কুলি প্রভৃতির বিষয়ে সুবিধা হইবে।

কুলি, ডাণ্ডি, ঘোড়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কাঠগুদাম হইতে আমাদিগকে রওয়ানা করিবার জন্য ষ্টেশনে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইনি কাঠগুদামে বাস করেন—অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ ইঁহাকে আমাদের বিষয় সংবাদ দিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট অবগত হইলাম যে কুলিদিগের মধ্যে একটা কোন গোলযোগের মত উপস্থিত হওয়ায় কাঠগুদাম হইতে মায়াবতী পর্য্যন্ত বরাবর এককুলি পাওয়া যাইবে না। কাঠগুদাম হইতে আলমোরা গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত কুলি সার্ভিস আছে—সেই জন্য আলমোরা পর্য্যন্ত যাইবার কোন অসুবিধা হইবে না এবং সেইজন্যই আমাদিগকে আলমোরা হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হইবে। আলমোরা হইতে পুনরায় নূতন কুলির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শুনিলাম আলমোরাতে কুলি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

মালপত্র ওজন করিতে এবং যথোপযুক্ত কুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের রওয়ানা হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গেল। এই ওজন করা

ব্যাপারটি নিতান্ত সাধারণ নহে। প্রত্যেক কুলি বহন করিতে পারে এমন ভাবে পৃথক করিয়া সমস্ত জিনিস ভাগ করিয়া ওজন করা, শুধু সময়ের নহে, বিশেষ কৌশলের কার্য্য। ৫টার সময় আমরা নামিয়াছিলাম। বেলা ৯টার সময় দেখা গেল আমাদের ডাণ্ডি এবং নিতান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিবার মত কুলি কোন প্রকারে সংগ্রহ হইয়াছে। আর বিলম্ব করিলে সে রাত্রে আমরা রাত্রি যাপনের স্থল রামগড়ে উপস্থিত হইতে পারিব না বলিয়া আমরা আমাদের অধিকাংশ দ্রব্যাদি পশ্চাতে ফেলিয়া রওয়ানা হইলাম। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি আমাদিগকে বিশেষভাবে ভরসা দিলেন যে যাহাতে আমাদের দ্রব্যাদি আমাদের সহিত একসময়ে রামগড়ে পৌঁছিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত তিনি করিবেন।

আমাদিগকে বহন করিবার জন্য আটখানি ডাণ্ডি ও কয়েকটি ঘোড়া ছিল। শ্রীমান চিররঞ্জন (ওরফে শ্রীমান ভোম্বোল) অশ্বারোহী হইয়া অগ্রগামী হইলেন এবং পশ্চাতে আমরা দোলায় চড়িয়া দুলিতে দুলিতে অনুগামী হইলাম। যাঁহারা কোন না কোন গিরিনগর ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট ডাণ্ডির পরিচয় অনাবশ্যক। যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদিকে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে ডাণ্ডি একপ্রকার মনুষ্য-যান—আমাদের দেশের পাল্কী, ডুলি বা খাটুলির মত নহে। একটি কাঠের চেয়ারে দুইদিকে পাল্কীর মত দুইটি দাঁড়ি দিয়া এবং সেই দুইটি দাঁড়িতে আর দুইটি দাঁড়ি আড়ভাবে বাঁধিয়া চারিজন লোকে বহন করিলে অনেকটা ডাণ্ডি বলা যাইতে পারে। অধিকন্তুর মধ্যে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য সামান্য আচ্ছাদন এবং পদ প্রসারিত করিয়া বসিবার জন্য একটু ব্যবস্থা থাকে।

বেলা ৯টার পর আমরা কাঠগুদাম হইতে রওয়ানা হইলাম। কাঠগুদাম অনেকেরই নিকট পরিচিত। কারণ নাইনিতাল ও আলমোরা উভয়স্থানে যাইতে হইলেই কাঠগুদাম হইয়া যাইতে হয়।

একটি ডাকবাঙ্গলা, দুই চারিখানি ক্ষুদ্র দোকান এবং কয়েকটি ঘোড়ার আস্তাবল লইয়া কাঠগুদাম। সহর নহে, এমন কি গ্রামও নহে। ষ্টেশনের পিছনদিকে পথের উপর ডাণ্ডি, টঙ্গা ও ঘোড়া যাত্রীগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পর্ব্বতারোহীর সংখ্যা দেখিলাম নিতান্ত অল্প—কারণ তখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার সময় পড়িয়াছে।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কাঠগুদামের বাজারের পথ। বাজার অতিক্রম করিয়া প্রায় একমাইল যাওয়ার পর দেখিলাম পথখানি দ্বিধা-ভিন্ন হইয়া দুইদিকে গিয়াছে। বামদিকের পথটি নাইনিতাল গিয়াছে এবং দক্ষিণদিকেরটি আমাদের গন্তব্যস্থলে গিয়াছে। নাইনিতালের পথ অপেক্ষা আলমোরার পথ অনেক অপ্রশস্ত এবং নিকৃষ্ট। সেই জন্য আলমোরার পথে টঙ্গা চলিতে পারে না—ডাণ্ডি বা ঘোড়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ডাণ্ডির উপর আরূঢ় হইয়া, কখন বা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদব্রজে আমরা ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। বেলা বাড়িবার সহিত সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু যতই আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই হাওয়া শীতল হইতেছিল বলিয়া রৌদ্রে কোন কষ্টবোধ ছিল না; তদ্ভিন্ন মন লিপ্ত এবং প্রফুল্ল থাকিবার পক্ষে আরও দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ প্রকৃতির মধুর এবং বিচিত্র দৃশ্য এবং দ্বিতীয়তঃ ডাণ্ডিওয়ালাদের গল্প। এই ডাণ্ডিওয়ালা কুলিগুলি দেখিলাম অদ্ভুত সরল-প্রকৃতির লোক। ইহারা গল্প শুনিতে যেমন ভালবাসে গল্প বলিতেও তেমনি ভালবাসে। ইহাদের এই প্রকৃতিটি বিশ্লেষণ করিয়া আমার মনে হইল বিদেশী লোকের নিকট গল্প শুনিয়া এবং বিদেশী লোককে গল্প শুনাইয়া ইহারা পরিশ্রম ক্লেশ হইতে নিজেদের অন্যমনস্ক রাখে। কথোপকথনের মধ্য দিয়া ইহাদের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ দেওয়া নহে, আনন্দ পাওয়াও বটে। আমি দেখিলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ কখন ইহা-

দের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছি—এবং আমাদের মধ্যে অবাধে নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিতেছে।

এই সংক্রান্তে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। ডাণ্ডি-ওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলিদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেখিলাম হয় ক্ষত্রিয় নয় ব্রাহ্মণ। তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই অধিকাংশ। মুসলমান ত' একেবারেই ছিল না—ইতরজাতি হিন্দুও নিতান্ত অল্প। আমার চারিজন ডাণ্ডিওয়ালার মধ্যে চারিজনই ব্রাহ্মণ। চারিজন ব্রাহ্মণের স্কন্ধে বাহিত হওয়ার পরম সৌভাগ্য যে জীবদ্দশাতেই কপালে লেখা ছিল তাহা জানিতাম না—মহাপ্রস্থানের দিনই সেরূপ সমারোহের সহিত যাত্রা করা যাইবে মনে মনে ধারণা ছিল। তাই সম্মুখের দুইজন কুলির স্কন্ধে উপবীত লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতের দুজনেরও যখন দেখিলাম একইরূপ অবস্থা এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিলাম চারজনই ব্রাহ্মণ, তখন মনের মধ্যে একাধিক ভাবে সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলাম! মৃত্যুর পরে যাহা প্রাপ্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিলেই বোধ হয় অন্তরাত্মা তৃপ্তি বোধ করে। আমাদের এই অল্পদিনের বাস-ভবন পৃথিবী এবং অনন্তকালের এক নগণ্য অংশ বর্ত্তমান জীবনের আয়ু এই দুইটি ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত ব্যাপারের মধ্যে আমাদিগকে এমন দৃঢ় ও চিরস্থায়ী ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করি যে এই দুইটি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অবস্থা কল্পনা করিতে আমাদের অন্তর একেবারে বিরূপ হইয়া উঠে। ইহা একবারও মনে ভাবিনা যে এই অন্তবিহীন জীবন-রেলপথের মধ্যে মৃত্যু একটি বড় ধরণের জংশন, যেখানে গাড়ী বদল করিতেই হইবে, মালপত্র ছড়াইয়া সংসার পাতিয়া নিজের কামরাটিতে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভুলিয়া যাই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দৃষ্টি অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মচারীর দৃষ্টি এড়াইবার উপায় নাই, সে যথাসময়ে এবং যথাস্থানে ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দিবেই।

আমার ডাণ্ডিওয়ালা চারিজনই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রায় সমগ্র ডাণ্ডিওয়ালা এবং ভারবাহী কুলিই ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়। দ্বিজ জাতির এখানে এরূপ অদ্ভুত অবনতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এ শুধু এখানেই নহে। কাঠগুদাম হইতে মায়াবতী এবং মায়াবতী হইতে টনকপুর সর্ব্বত্র একই প্রকার ব্যাপার দেখিলাম। শিমলার পথে, কিম্বা শিমলায়, কুলিগণের মধ্যে অধিকাংশ পাঠান কিম্বা নিম্নশ্রেণীর পাহাড়ী হিন্দু, ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় একজন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এ অঞ্চলে কিন্তু ব্যাপার একেবারে বিপরীত। কুলিগণের নিকট হইতে এবং পরে অন্যান্য লোকের নিকট হইতে ইহার এইটুকু কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম যে পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কতকটা আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কুমাউন প্রদেশ এক হিন্দুরাজবংশের রাজত্ব ছিল এবং তাহার কয়েকটি রাজধানীর মধ্যে হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থিত চম্পাবতীও একটি রাজধানী ছিল। এই হিন্দু-রাজবংশের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-পরিবার আসিয়া এই রাজ্যে বাস করে—বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশাঞ্চলে মুসলমানদিগের প্রভাব যখন খুব বাড়িয়া উঠে সেই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া এই পার্ব্বত্য হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় লয়। তাহাদেরই বংশধরগণের এখন এরূপ অবনত অবস্থা হইয়াছে। কৃষিই প্রধানতঃ ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়—উপরন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুলির কার্য্যও ইহাদিগকে করিতে হয়। অনিচ্ছায় কিরূপ করিতে হয় সে কথা পরে বলিব।

কাঠগুদামের পর আমাদের প্রথম আশ্রয়স্থলের নাম ভীমতাল, কাঠগুদাম হইতে আট মাইল পথ। কথা ছিল ভীমতালে পৌঁছিয়া তথায় আহারাদি সমাপন করিয়া বেলা ২টার সময়ে আমরা পুনরায় রওয়ানা হইব এবং সন্ধ্যার সময় আমাদের রাত্রি-যাপনের স্থল রামগড়ে পৌঁছিব। রামগড় ভীমতাল হইতে এগার মাইল দূরে।

বেলা ১১টার পর হইতে দেখিলাম দলে দলে লোক নামিয়া যাইতেছে। ইহারা পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হইতে প্রধানতঃ আলমোরা হইতে, নামিয়া আসিতেছে। শীতকালে দরিদ্র লোকের পক্ষে নানা কারণে পাহাড়ের উপর বাস করা সুবিধা নহে। প্রথমতঃ বিপর্যায় শীতের জন্য শারীরিক ক্লেশ। দ্বিতীয়তঃ সেই শারীরিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ইন্ধনাদির অতিরিক্ত ব্যয়। তৃতীয়তঃ ঘোড়া গরু মহিষ প্রভৃতির আহার্য্য দুর্ল্ভ এবং অক্রেয় হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আনুসঙ্গিক এবং স্বতন্ত্র কারণও অনেক আছে। এই সকল কারণে শীতের প্রারম্ভেই অনেকে পাহাড় হইতে নামিয়া আসে, এবং শীতকালের কয়েক মাস সমতল ভূমিতে বাস করিয়া শীতের শেষে পুনরায় উপরে ফিরিয়া যায়।

বিশেষ আগ্রহ ও কৌতুকের সহিত আমরা এই নিম্নদেশের যাত্রী-গণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক একটি পরিবার, কখন বা দুই তিনটি পরিবার একত্র হইয়া নামিয়া চলিয়াছে—সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। যাহাদের গো মহিষ ছাগল প্রভৃতি আছে তাহারা নিজ নিজ পশু হাঁকাইয়া চলিয়াছে। প্রায় সকলেই পদব্রজে চলিয়াছে; যাহারা নিতান্ত অশক্ত ও অক্ষম, যথা শিশুগণ, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ এবং বৃদ্ধ ও পীড়িতগণ—তাহারা মালবোঝাই ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। যাহারা সক্ষম তাহাদের শুধু হাঁটিয়াই অব্যাহতি নাই—যুবকগণের মাথায় বা পৃষ্ঠে বোঝা এবং যুবতীগণের ক্রোড়ে শিশু। শিমলা অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদ হইতে এখানকার স্ত্রী-পরিচ্ছদ একটু পৃথক দেখিলাম। শিমলা অঞ্চলের অধিকাংশ রমণী পায়জামা ব্যবহার করে—এ অঞ্চলে ঘাগরার ব্যবহারই অধিক দেখিলাম। তবে অঙ্গা-বরণ ওড়না শিমলার ন্যায় এ প্রদেশেও খুব প্রচলিত।

রমণীগণের মধ্যে কয়েকটি দেখিলাম অপূর্ব্ব সুন্দরী এবং অধি-কাংশই সুশ্রী। বর্ণ গঠন এবং আকৃতি, সর্ব্বতোভাবেই ইহারা

সৌন্দর্য্যের দাবী করিতে পারে। অনেকের মনে ধারণা আছে যে পাহাড়ী রমণীগণ দেখিতে খুব সুন্দরী হয়। এ ধারণা সাধারণতঃ অভ্রান্ত নহে। যাহারা পাহাড়ের আদিম নিবাসী, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ আকৃতির সৌন্দর্য্য অল্পই দেখা যায়। পাঞ্জাবে ও যুক্ত-প্রদেশাঞ্চলে আমাদের বাঙ্গালা দেশের সুবর্ণবণিকের অনুরূপ এক বণিকশ্রেণী আছে। সেই শ্রেণীর রমণীগণ দেখিতে খুব সুন্দরী। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের গিরি-নগরীগুলিতে এই শ্রেণীর বণিক বা বেণিয়া অনেকে আসিয়া বাস করিয়াছে। বহুদিন হইতে শীতপ্রধান দেশে বাস করায় ইহাদের সৌন্দর্য্য, বিশেষতঃ বর্ণগত সৌন্দর্য্য, বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

কুলিগণের মুখে ভীমতালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ শুনিয়া ভীমতাল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। নাইনিতালের মত ভীমতালেও একটি বৃহৎ 'তাল' বা হ্রদ আছে—যাহা হইতে স্থানের নাম হইয়াছে ভীমতাল।

বেলা ১টার সময় আমরা ভীমতালে উপনীত হইলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

নবীনচন্দ্রের "শৈলজা"

[২]

শৈলজা আত্ম-পরিচয়-চ্ছলে কি করুণ শোক-গীত আত্মহারা অর্জ্জুনকে শুনাইতে লাগিল!

শৈলজার এই আত্ম-পরিচয় শুধু শোক-গীত নহে, ইহা অনাদি অনন্ত অতল-স্পর্শ অশ্রু-পারাবার! মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস প্রবল বাত্যার ন্যায় ইহার বক্ষে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইয়া ইহাকে ভাষণ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। মহাজলধিমন্থনে একদিন বিশ্ব-লক্ষ্মীর উদয় হইয়াছিল, আর এই মহা অশ্রু-সিন্ধু মন্থন করিয়া আমরা প্রেমময়ী শৈলজাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহাকবি নবীনচন্দ্র শৈলজার আত্ম-পরিচয় বিস্তৃতভাবে প্রদান করিয়াছেন। তাহার সমগ্রাংশ এস্থলে সঙ্কলিত করিয়া তাহার করুণ-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার স্থান আমাদের নাই। আমরা ইহা পাঠে সংক্ষেপতঃ ইহা অবগত হইতে পারি:—

শৈলজা খাণ্ডবপ্রস্থাধিপতি নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের কন্যা। একদিন এই নাগরাজবংশ প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেন এবং এই রাজছত্রের স্নিগ্ধ ছায়াতলে সমগ্র ভারতভূমি আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু যখন আর্য্য-বিপ্লব-ঝটিকা সেই সুবিশাল ছত্র উড়াইয়া নিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ মহারণ্যে পরিণত করিল, যখন ধ্বংস-শেষ নাগ-জাতি পাতালে পশ্চিমারণ্যে আশ্রয় লইল, যখন "পশ্চিম সাগরে অস্ত গেলা নাগ-রবি চিরদিন তরে," তখন নাগরাজ চন্দ্রচূড়ও অনার্য্য-স্বাধীনতা-রবির শেষ-রশ্মির ন্যায় ভ্রাতৃগৃহে নাগপুরে শরণ লইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলিয়া শৈলের পিতৃব্যসুত

কৃষ্ণদ্বেষী ক্রোধী দাম্ভিক বনের শার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণ নাগরাজ বাসুকীর সহিত মতভেদে তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হয় এবং "বেড়াইয়া বনে বনে, অচলে অচলে" ভারতের নানাস্থানে ছদ্মবেশে আর্য্য-ঋষিদের সেবা করিয়া আর্য্যবিদ্যা ও আর্য্যধর্ম্ম শিক্ষা করেন।

তারপর বিন্ধ্যাচলশিরে স্বচ্ছতোয়া সুনীরার তীরে পুলিন-কুটীর নামক একটি সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। সেই পুলিন-কুটীরে সেই শৈলশিখরে বালিকার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম "শৈলজা" রাখা হয়।—বক্ষভরা এত প্রেম যাহার, সে "শৈলজা" যে বাস্তবিকই শৈলনন্দিনী শৈলজা!

শৈলজার শৈশব-জীবন দেবদেবীমূর্ত্তি পিতামাতার স্নেহমাখা কোলে বনদেবীর শ্যামাঞ্চল-ছায়ায় বড় আনন্দে—বড় সুখেই কাটিয়াছিল;—প্রকৃতি-বালা শৈলজার শৈশব যে চিরকাল এমনই মধুময়!

পুলিন-কুটীরবাসী নাগরাজ চন্দ্রচূড় প্রিয়তমা কন্যা শৈলজাকে কতই আদরে আর্য্যভাষা এবং অস্ত্রসঞ্চালন শিক্ষা দিতেন এবং "কহিতেন পাপ অকারণ জীবহত্যা, জীবমনস্তাপ"। কৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মাচারী জনকের এ শিক্ষা শৈলজার জীবনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কতকটা পাইয়াছি, পরে আরও পাইব।

যাহা হউক, এমনি করিয়া হাসি-খেলা-সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে শৈলজার সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত হইল। তারপর শৈলজা বলিতেছে:—

"অষ্টম বৎসর যবে,—অষ্টম বৎসরে
ভাঙ্গিল কপাল, দেব, এই অভাগীর!—
অষ্টম বৎসর যবে, খাণ্ডবদর্শনে
গেলা সহৃদয় পিতা। যাইতেন সদা
দেখিতে সে অনার্য্যের গৌরব-শ্মশান,
মানিতেন তাহা যেন পুণ্যতীর্থ স্থান।

শুনিয়াছি কতদিন সে গৌরব-গাথা
গাইতে আকুল প্রাণে। জননীর কাছে
কহিয়া পূরব সেই গৌরব-কাহিনী
দেখিছি কাঁদিতে, মাতা কাঁদিতা বিষাদে,
শুনিতাম অঙ্কে আমি বসি অবসাদে।
হইনু পীড়িতা আমি; দুগ্ধ অন্বেষণে
গেলা পিতা ইন্দ্রপ্রস্থে, ফিরিলা না আর
তব অস্ত্রে"—

শৈলজার কথা আর শেষ হইল না—তাহার শোক-নির্ঝরিণী দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইল। কিন্তু অমনি—

উঠিয়া ফাল্গুনী—

"শৈলজে! শৈলজে! তুমি সে অনাথা বালা!
চন্দ্রচূড়-কন্যা তুমি!" উন্মত্তের মত
শোকের প্রতিমাখানি লইয়া হৃদয়ে
চুম্বিলেন বারবার নীলাব্জবদন
অশ্রুসিক্ত। কহিলেন "শৈলজে! শৈলজে!
আমি তব পিতৃ-হন্তা জানিয়া কেমনে
দেবতার মত তুমি সেবিলে আমায়
এতদিন? নাহি স্বর্গ, কে বলে ধরায়?
এযে স্বর্গ বক্ষে মম পূর্ণিত সুধায়!
করেছি বৎসর দশ তব অন্বেষণ
শৈল! আমি। আমি পাপী, ক্ষমিয়া আমায়
দেহ পিতৃ"—

নাগবালা তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না, সে ত্রস্তকরে অর্জ্জুনের মুখাবৃত করিল। অর্জ্জুন বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া নীরব হইলেন। শৈলজাও আবার তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল।

মহারথী পার্থের অন্তরে আজ কি মহাতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে,

মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি যে অজ্ঞান-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্য রাজ্য-সম্পদ আত্মীয়-পরিবার পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ দশটি বৎসর ধরিয়া পরিব্রাজকবেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আজ সকরুণ অশ্রু-বন্যার মধ্য দিয়া সে পরম শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া দেখা দিয়াছে—সেই অষ্টম-বর্ষীয়া অনাথা বালিকা তরুণী যোগিনীবেশে—মর্ত্ত্যলোকে সুধাপূর্ণ স্বর্গের শোভায় তাঁহারই বক্ষপাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাঁহার সমগ্র প্রাণের স্নেহ-করুণা আজ যে তাহাকে অভিষিক্তা করিয়া দিতে চায়!—হৃদয়ের ধারা এমনই ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈলজা, তোমার জননী কোথায়?"—শৈলের উত্তরটি বড়ই করুণ—বড়ই কবিত্বময়!

"যথায় জনক মম, বৈকুণ্ঠ যথায়!"
কহিতে লাগিল বামা—"শোকসমাচার
শুনিলা জননী, চাহি মুহূর্ত্ত আকাশ
পড়িলা ভূতলে, ছিন্ন এ জীবন-পাশ।
বিধির অপূর্ব্ব যন্ত্র,—দেবতা বিভব,—
মধ্য-গীতে ছিন্ন তার হইল নীরব।
এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য যুগল আমার
ডুবিল, বালিকা প্রাণ করিয়া আঁধার।
মুখে মুখ বুকে বুক দিয়া জননীর,
কত ডাকিলাম আর কত কাঁদিলাম।
কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতা জননীর বুকে
পড়িলাম ঘুমাইয়া"—

শৈলের মুখে আর কথা ফুটিল না। অবিরল ধারে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া অর্জ্জুনের যুগল চরণ সিক্ত করিয়া দিল।

পার্থ মনোবেদনায় অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে—

চাহি ঊর্দ্ধপানে
কহিলেন—"নারায়ণ! এ ঘোর পাপের
আছে কোন প্রায়শ্চিত্ত কহ এ দাসেরে।
কি পুণ্য-কুটীর শূন্য করিয়াছি আমি!
নিবায়েছি কিবা দুই পবিত্র প্রদীপ!
কি দুঃখীর সুখ-স্বপ্ন নির্দ্দয় অর্জ্জুন
করিয়াছে ভঙ্গ আহা! কপোতকপোতী
পাপ-মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিব করিয়া নির্ম্মাণ
ছিল সুখে। সেই স্বর্গ মম ধনুর্ব্বাণ
করিয়াছে ধ্বংস। আজি শাবক তাহার
পড়ি পদতলে মম করে হাহাকার!
হা কৃষ্ণ! নারকী হেন সখা কি তোমার?
ধরিব না ধনুর্ব্বাণ; দাও অনুমতি,
বীরবেশ পরিহরি যোগীবেশ ধরি
দেশে দেশে গাব এই শোকসমাচার;—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি বুঝি আর।"

অর্জ্জুনের—না, না, স্বীয় পিতৃহন্তার এ কাতরোক্তি প্রেমময়ী শৈলজার অন্তর স্পর্শ করিল—সে যে শান্তিকরুণারূপিণী দেবী-প্রতিমা! তাই সে পার্থের পদতলে লুটাইয়া সকাতরে বলিল—

"ক্ষম এই অনাথায়, কি মনোবেদনা
দিতেছে তোমায় দাসী। বৃথা মনস্তাপ
কেন পাও বীরমণি! পিতৃমুখে আমি
শুনিয়াছি, সুখদুঃখ পূর্ব্ব কর্ম্মফল।
তুমি যদি পাপী, তবে পুণ্যস্থান হায়,
আছে কোথা ধরাতলে কহ অবলায়!"

শৈলজা শুধু শান্তিকরুণারূপিণী নহে, সে কর্ম্মফল-বাদিনী—সে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা! তাই নিজে শোকসন্তপ্তা হইয়াও পিতৃহন্তা

পার্থকে এমন মধুর সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে এবং তাঁহার মধ্যে ধরাতীত পুণ্যস্থানের সন্ধান পাইয়াছে। তাই সে ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে, তাঁহার চরণ-সেবায় জীবন সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই।

যাহা হউক, অর্জ্জুন তাহাকে আবার আলিঙ্গন করিয়া কোলে লইয়া পর্য্যঙ্কে বসিলেন এবং গত দশ বৎসরের শৈলজার জীবন-কথা শুনিতে চাহিলেন।

মনুষ্যজীবনে এমন এক একটি মাহেন্দ্রক্ষণ আসে, যাহা সমগ্র জীবনের সকল সুখ-সৌভাগ্যের বিনিময়ে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না—জীবনের কোন আনন্দ-সম্পদ তাহার সহিত উপমিত হইতে পারে না। শৈলজা-জীবনেও আজ তেমনি পরম মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যাহা বড়ই রমণীয়—বড়ই অতুল! এক কথায়—"ন ভূত ন ভবিষ্যতিঃ!" তাহার তখনকার অবস্থা কবির ভাষায়—

"মুহূর্ত্তেক নাগবালা রহিল বসিয়া,—
সে মুহূর্ত্ত স্বর্গ তার; মুহূর্ত্তেক মুখ
রাখি সেই বীর-বক্ষে শুনিল নীরবে
বাজিতেছে কি সঙ্গীত, বুঝিল নিশ্চয়
দুইটি হৃদয়-যন্ত্রে এক তান-লয়।"

শৈলজার এ স্বর্গ-সুখ শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর সে আবার শোকসন্তাপপূর্ণ মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিল—অর্জ্জুনের পদতলে বসিয়া আত্মকথা বলিতে লাগিল।

আমরা তাহার এই করুণ আত্মকথা পাঠে জানিতে পারি—"দুঃখী নাহি মরে; মরিল না এই দাসী।" এতকাল সে তাহার পিতৃব্যপুত্র নাগরাজ বাসুকির গৃহে কাটাইয়াছে। তারপর পার্থ যখন রৈবতকে আসিলেন, তখন বাসুকি তাহাকে এই উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিল—

"পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে ; সম্মুখ সমরে
পরাভবে নাহি বীর ভারত ভিতরে।
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্ব গ্রহণ
কালভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।
আমায় সুযোগ দেখি দিবি সমাচার,
হরিব সুভদ্রা, চিরবাসনা আমার।
সন্দেহ আমার, সেই চক্রী নারায়ণ
পার্থে সুভদ্রার পাণি করিয়া অর্পণ,
যাদব-কৌরব-শক্তি করিবে মিলিত,
তা হলে অনার্য্য ধ্বংস হইবে নিশ্চিত।"

তারপর যে কি হইল, কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় অর্জ্জুনকে দংশন না করিয়া সে যে প্রথম দর্শন সময়েই কালভুজঙ্গিনীর দংশন হইতে তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিল, এবং সুভদ্রা-হরণে অনার্য্য দস্যুদলের সহায়তা না করিয়া তাহাকে রক্ষাই করিয়াছিল, তাহা আমরা যথাসময়ে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। শৈলজার অন্তরে এ ভাবান্তর ঘটাইল কে? কালভুজঙ্গিনীকে শান্তিকরুণারূপিণী সাজাইল কে?—বিশ্ব-বিজয়ী প্রেম যে ইহার মূলে!

যাহা হউক, অর্জ্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণের সুভদ্রাহরণাকাঙ্ক্ষী বাসুকিই সেই দুরাধর্ষ দস্যুপতি, তখন তাঁহার প্রাণ অপূর্ব্ব আবেগে পূর্ণ হইয়া গেল!—সেদিন যে শৈলজাই বিচিত্র বিক্রমে তাঁহাকে—তাঁহার সুভদ্রাকে রক্ষা করিয়াছিল! অমনি তাঁহার বিশাল হৃদয় ভেদিয়া পবিত্র গোমুখীধারার ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল—

"কি যে অভিসন্ধি তব ; ক্ষুদ্র হৃদয়েতে
প্রেমময়, কি রহস্য রয়েছে নিহিত

বুঝিতে না পারি আমি। নারায়ণ তব
রহস্য অপার! ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে
ফলে মুক্তা, কি সৌরভ ক্ষুদ্র যুথিকায়!”

আমরা দেখিতেছি, অর্জ্জুন এখনও শৈলজার হৃদয়-সৌরভ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সে সৌরভ যে ক্ষুদ্র যূথিকার নহে—সে সৌরভ যে বিশ্ব-দুর্ল্ভ নন্দন-পারিজাতের!

শৈলজা বলিল—“দেব! এ সৌরভ ত আমার নয়—এ যে তোমারই! আমি রৈবতকবনে দেবরূপ দেখিলাম—আমি দেবপুরে আসিলাম। শুনিলাম, তুমি আমার পিতার জন্য কি শোকপূর্ণ অনুতাপ করিতেছ? আমার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল! ফলে “করিনু অর্পণ, পিতৃহন্তা-পদে এই অনাথ জীবন!” কত সুখস্বপ্ন দেখিলাম!

“কিন্তু হায়, সে স্বপ্নসৃষ্ট আশার মন্দির বালিকার ক্রীড়া-কুসুম-কুটীরটির মত অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাসুকির সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, ঈর্ষাবশে তাহা আরও দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইল। আমি আত্মহারা হইয়া কুমারীব্রতের সংবাদ বাসু-কিকে দিলাম।”

পাঠক! শৈলজার এ ঈর্ষা কিসের জান? সে যে সমগ্র নারীজাতির অন্তরের নিভৃত ঈর্ষা! পাঠিকাগণ! ক্ষমা করিবেন।—আমি যাহাকে শুধু ‘আমার’ বলিয়া জানি—ভালবাসি, তাহাকে কোন্ প্রাণে অন্যের হাতে তুলিয়া দিব? সে যে ‘আমার’ নয়, সে যে অপরের, সে যে অপরকে ভালবাসে, এ কথা আমি কেমন করিয়া মনে করিব? কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিব?

শৈলজা বলিতেছে—“নাথ! উঠিল ভাসিয়া
ঈর্ষায় তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার
পূর্ণ শশধর সম মুখ সুভদ্রার,—
সেই চন্দ্রালোকে ভরা হৃদয় তোমার।

শৈলজা অপরাজিতা পাইবে কি স্থান
সেই সমুজ্জ্বল স্বর্গে?"

এই আশঙ্কার—এই বেদনার মূলেই এবম্বিধ ঈর্ষার জন্মভূমি! এই ঈর্ষা নারী-হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম—ইহাই মানবীয়তা। শৈলজা এই মানবীয় ধর্ম্মের বশীভূতা। তাই ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধারম্ভে বলিয়া আসিয়াছি, "অমরকবি নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা দেবী; শৈলজা দেবীভাবে মানবী।"

কিন্তু এই দেবীভাব লাভ করিতে হইলে—ঈর্ষা-যাতনা হইতে শান্তি-সান্ত্বনার রাজ্যে যাইতে চাহিলে, দেব-করুণার যে প্রয়োজন, আমাদের শৈলজা তাহা বিস্মৃতা হয় নাই। শৈলজার প্রেমিক পিতার প্রভাব এইখানেই অলক্ষ্যে বিদ্যমান। শৈলজা বলিতেছে—

"অনাথার নাথে
মাটিতে পাতিয়া বুক ডাকিনু কাতরে!
শুনিলেন দয়াময় ভিক্ষা এ দাসীর,
পাইনু অপূর্ব্ব শান্তি! কি ঘটিল পরে
জান তুমি প্রাণনাথ!"

সকল শান্তির প্রস্রবণ যিনি, শৈলজা সেই অনাথার নাথকে সকাতরে ডাকিয়া—তাঁহারই চরণে শরণ লইয়া ঈর্ষা-দগ্ধ বেদনা-কাতর প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়াছে। জীব এমনি করিয়াই শিব-পথের অধিকারী হয়।

কিন্তু শৈলজার আজ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের হৃদয়ে যে সুরটি সুনীরবে সুপ্ত ছিল, অথবা যে সুরটি হৃদয়ের হৃদয়ে ভয়ে ভয়ে আপনমনে মৃদুগুঞ্জন করিয়া বেড়াইত, প্রেমময়ী শৈলজা যাহাকে অতি যত্নে—অতি সতর্কতার সহিত গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা প্রেমাস্পদের নিবিড় মিলনে অতর্কিতে জাগিয়া উঠিয়াছে—বহির্জ্জগতে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলি-

য়াছে, অন্তরের অব্যক্ত অনুরণন ভাষাসম্পদে ধরা পড়িয়াছে! তাই শৈলজা আজ অর্জ্জুনকে অসঙ্কোচে প্রাণ ভরিয়া সম্বোধন করিতেছে—"প্রাণনাথ!"

পক্ষান্তরে অর্জ্জুন সুভদ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। তিনি শৈলজার প্রাণের গতি অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, সকাতরে বলিলেন—"শৈল, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোমাকে দুহিতানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব,

অনুতাপ মম,
তব পিতৃ-হত্যা-পাপ জুড়াইব, শৈল,
দেখি সুধা-হাসি তব সুধাংশুবদনে।

চল শৈল, ইন্দ্রপ্রস্থে চল! অথবা তোমার পিতৃরাজ্য খাণ্ডব আবাব উদ্ধার করিয়া তোমাকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করিব—

শৈলজে, তোমায় বক্ষে করিয়া ধারণ,
শোভিবে চন্দ্রিকা-বক্ষ শারদ গগন!"

তারপর—

"কে আছে ভারতে, নারীরত্ন! তব কর,
হৃদয়-অমরাবতী পবিত্র সুন্দর,
পাইতে আগ্রহে নাহি হবে অগ্রসর!

সত্য জানিও শৈল! জীবনের মরীচিকাকে অনুসরণ করিয়া যখন আমি সন্তপ্ত হইব, তখনই—

হৃদয় তোমার
হবে মম শান্তিরাজ্য, এই ক্ষুদ্র মুখ
লইয়া হৃদয়ে আমি জুড়াইব বুক!"

মহাবীর অর্জ্জুনের এ আকাঙ্ক্ষা—এ আকিঞ্চন, শান্তিকরুণা-রূপিণী প্রেমময়ী দেবীপ্রতিমার চরণে মুগ্ধ ভক্তের আত্ম-নিবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে! শৈলজা তাহা বুঝিল। কিন্তু শৈলজা

ত অর্জ্জুনের নিকটে আর এমনি ভাবে প্রেম-প্রতিদান চাহে না! সে নিষ্কাম-প্রেমের নিগূঢ় রসাস্বাদন করিয়াছে—তাহার তৃষিত অন্তরে দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়াছে—সে আর কামনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধা হইতে পারে না! তাই আকুল-চিত্ত অর্জ্জুনকে—শুধু অর্জ্জুনকে নহে, প্রত্যেক প্রেমিককে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহার করুণ কণ্ঠ অমৃত-বর্ষণ করিল—

"দাসীরও বাসনা তাহা! দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তিরাজ্য নাথ, হয়েছে স্থাপিত,
তুমি সে রাজ্যের রাজা। মাতা প্রকৃতির
বনে বনে অঙ্কে অঙ্কে করিয়া ভ্রমণ
বাড়াইব সেই রাজ্য। বিশ্বচরাচর
হবে সব পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝর, সলিল,
হইবে অর্জ্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জ্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর,
তুমি শৈলজার এক অনন্ত, ঈশ্বর!
যেই রক্তবাসে যোগী সাজি, প্রাণনাথ,
খুঁজিলে এ অভাগীরে; পরি সেই বাস
তব পুরাতন, নাথ! শৈলজা তোমার
চলিল খুঁজিতে আজি অর্জ্জুন তাহার।"

বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! জানি না, জগতে এমন কোন ভাষা-সম্পদ আছে কি না, যাহার দ্বারা ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়? এ সৌন্দর্য্য যে শুধু অনুভবের,—প্রকাশের নহে।

অহেতুকী নিষ্কাম প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই যে, সে কখনও প্রেমাস্পদকে কেবলমাত্র আপনার বহিরেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত

করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে না। সে আপন হৃদয়ের ধনকে হৃদয় দিয়াই স্পর্শ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে—অন্তরের নিধিকে সে সর্ব্বক্ষণ অন্তরেই রাখিতে, অন্তরেই পাইতে এবং অন্তরেই দেখিতে ও বেশী ভালবাসে।

পক্ষান্তরে নিষ্কাম প্রেমের মধ্যে যখন সুগভীর একনিষ্ঠতা আসে, তখন সে আপনার হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবধারা যুগপৎ সংহত করিয়া একমাত্র প্রেমাস্পদকেই সর্ব্বাত্মীয় মূর্ত্তিতে বরণ করিতে চায়—একমাত্র প্রেমাস্পদের প্রেমেই পিতা মাতা সখা ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেরই সন্ধান পায়।

তারপর এই একনিষ্ঠ নিষ্কাম প্রেম যখন সার্থকতার সর্ব্বোচ্চ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে প্রেমাস্পদের বিশ্বরূপ বা বিশ্বময় রূপ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আর চেতন-অচেতন-বোধ বা আত্ম-পর-ভেদাভেদ-জ্ঞান রহে না; সর্ব্বভূত প্রেমাস্পদের পরিপূর্ণ সত্বায় সজীব ও জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের প্রেমময়ী শৈলজা ধীরে ধীরে এমনি উন্নততর স্তরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার প্রত্যেকটি কথায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাহার হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, সে এখন তাহারই একছত্রাধিপতিপদে প্রেমাস্পদ অর্জ্জুনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতির রম্যনিকেতনে সে শান্তিরাজ্যের বিস্তার করিতে চায়! তাহার অভিলাষ এখন তাহার চক্ষে "বিশ্বচরাচর হবে সব পার্থময়!" এবং এই বিশ্বচরাচর-কায়া বিরাট অর্জ্জুনের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বিলুপ্ত হইয়া "রহিবে অভিন্ন নিত্য"। একমাত্র অর্জ্জুনই তাহার পিতা ভ্রাতা প্রাণেশ্বর হইবেন, সে তাঁহাকেই এক অনন্ত ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে। সে আপন অন্তরে যে অন্তর-দেবতার আসন রচনা করিয়াছে, সে পাঞ্চভৌতিক অর্জ্জুনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই চিন্ময় অর্জ্জুনের নিবিড় ও শাশ্বত-সান্নিধ্য লাভ করিতে সে আজ যাইতেছে। প্রেমাস্পদ অর্জ্জু-

নের স্নেহ-স্মৃতি, তাহার তৃষিত আত্মার অশন; তাঁহার পরিত্যক্ত গৈরিক-বাস, তাহার কমনীয় অঙ্গের ভূষণ। শৈলজা আজ যৌবনে যোগিনী—যথার্থ প্রেম-তপস্বিনী! তাহার এ কঠোর প্রেমের তপস্যা সার্থক হইবে না কি?

কোন মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রয়োজন। শৈলজা এমনি আত্মত্যাগেও আজ কুণ্ঠিতা নহে। সে বহির্জ্জগতে আপনার প্রিয়তম জীবনসর্ব্বস্বকেও অপরের করে সমর্পণ করিয়া চলিয়াছে, সে বলিতেছে—

"বাজিছে মঙ্গল বাদ্য, পুরনারীগণ
চলিয়াছে দ্বারবতী, যাও প্রাণনাথ,
শুভ বিভাবরী এবে হয়েছে প্রভাত।
লও এই ফুলমালা, রণান্তে যখন
পরিবে সুভদ্রা-হার, ত্রিদিব-ভূষণ,
শুকায়ে পড়িবে মালা, মালাদাত্রী হায়!
হয় ত বাসুকি-অস্ত্রে শুকাবে ধরায়।"

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! স্মরণ হইতেছে, এমনি 'আত্মত্যাগ' একবার আমরা অমর-ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েসায় দেখিয়াছিলাম; আর আজ দেখিতেছি, অমরকবি নবীনচন্দ্রের শৈলজায়! তবে উভয়ের উত্তর-জীবনে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রেমিকা আয়েসা আত্মত্যাগের পরে কোন্ নির্জ্জন যোগ-গুহায় প্রেমাস্পদের ধ্যানে নিমগ্না হইল, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সে কথা বলেন নাই—তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর ভিতরে আমরা আর আয়েসার সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁহার পরবর্ত্তী "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্যদ্বয়ের ভিতরেও শৈলজাকে গৌরব দান করিয়াছেন—শৈলজার প্রেমের বিচিত্র স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েসা, আত্মনিষ্ঠ প্রেমের সাধিকা; আর নবীনচন্দ্রের শৈলজা, বিশ্বজনীন প্রেমের উপাসিকা। এইজন্যই আয়েসাকে আমরা আর

ফিরিয়া পাই নাই; আর শৈলজা আবার কাব্য-জগতে দেখা দিয়াছে —আমরা তাহাকে শান্তিরাজ্যের শুধু প্রতিষ্ঠাত্রী নহে, অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

যাহা হউক, শৈলজার কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল; তিনি ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"ব্যাসদেব! আজি
তব ভবিষ্যৎ-বাণী ফলিল দুর্ব্বার
পিতৃহন্তা হোল আজি হন্তা অনাথার!"

হায়, অদৃষ্ট-লিপি! কিন্তু একি।—

মুছি অশ্রু ধনঞ্জয় দেখিলা বিস্ময়ে
নাহি সেই অনাথিনী! শৈলজে, শৈলজে!
ডাকিতে ডাকিতে পার্থ গেলা গৃহদ্বারে,
ছুটিয়া নক্ষত্রবেগে!

কিন্তু নাই! নাই! শৈলজা নাই! সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল, তেমনি অতর্কিতে চলিয়া গিয়াছে! অর্জ্জুনের জন্য রাখিয়া গিয়াছে, শুধু একবিন্দু অশ্রু—শুধু একটী করুণ দীর্ঘশ্বাস!

অর্জ্জুনের কাছে সবই স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে "সরথ দারুক" দাঁড়াইয়া আছে। তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত এক লম্ফে রথারোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

"রৈবতক" কাব্যে শৈলজা-জীবনের যবনিকা-পাত এখানেই হইয়াছে। কবি অদৃষ্টবাদের মধ্য দিয়া শৈলজাকে আনিয়াছিলেন—শৈলজার করুণ কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন; আবার অদৃষ্টফলের ভিতর দিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। আমরা শৈলজার—শুধু শৈলজার নহে, শৈলজার সহিত অর্জ্জুনের অদৃষ্ট-ফল প্রত্যক্ষ করিলাম। এক্ষণে এই অদৃষ্ট-ফলের পরিণতি কোথায় এবং কি ভাবে তাহা হইয়াছে, আমরা "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" আলোচনা সময়ে দেখিব।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গান

এ যে আমার ফুলের হার
এ যে আমার কাঁটার মালা
এ যে সকল মধুর মি'
এ যে আমার বিষের
দিয়েছ যা কিছু নিতে ।
যত না সুখ যত না ব্যা
ওই দেখ তব চরণ-মূলে
দিয়েছি ভরে কিসের ডাল'

গান

কোন্ তারেতে বা ল
ওগো প্রাণের বাজনদার !
প্রাণের মাঝে রাখ্‌ব বেঁধে
সইতে তব সুরের ভার !
একটুখানি আভাস পেলে
বাঁধ্‌ব প্রাণে প্রাণের তার ।
কঠিন কোমল সকল সুরে
ঝরবে তবে মধুর ধার ।

মোহিনী

[গল্প]

সমস্ত বিজয়প— ——দ্বারে দ্বারে প্রত্যেককে অনুরোধ করিয়াও ফটিকের মা ফটি —বার কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া, যখন গ্র— র হইলেন, তখন বেলা ঠিক দুপুর। সম্মুখে প্রকাণ্ড মা— জ্যৈষ্ঠমাস, চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিয়া আগুনের মত জ্বলি— । শুষ্ক তৃণের মত ছোট ছোট ধানগাছ-গুলি কদাচিৎ বাত— একটু একটু দুলিতেছে। ফটিকের মার মাথার মধ্যেও আগু— একমুঠা ভাত হইলে যে ফটি-কের খাওয়া হয়, সে— একজন লোকও বাড়ীতে রাখিতে স্বীকার করিল না! এ— আগুনে পুড়িয়া গেলে ফটিকের মার কোন দুঃখ নাই।

কিন্তু এই দারুণ বৈ— রৌদ্রে পুড়িয়া এই ঠিক দুপুরবেলা অনাহারে চার পাঁচ মাইল— া হাঁটিয়া কি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন তাই ভাবিয়া তিনি আরও অস্থির হইলেন। ফটিক বলিল, "মা, এই গ্রামে না কোথায় মোহিনী দিদির বাড়ী? এ বেলা তাঁর ওখানে থাকিয়া গেলে হয় না?" কথাটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। মা বলিলেন, "আচ্ছা, চল্; তার ওখানেই যাই, মোহিনীর কথা আমার মনে ছিল না। "আর এ গাঁয়ে আসিয়া তার সঙ্গে যদি দেখাটাও না করিয়া যাই তবে সেই বা কি মনে করিবে?" মা ছেলেকে লইয়া মোহিনীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। মোহিনী ফটি-কের মার দূর-সম্পর্কীয়া খুড়তুত বোনের মেয়ে। ফটিক মোহিনী-দিদির নাম শুনিয়াছে, কখনও দেখে নাই। তবে তাহার স্বভাব ও অবয়ব সম্বন্ধে সে মনে মনে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিল।

তাহার সেই কল্পনা-মূর্ত্তির সহিত এখনই সত্যিকার মানুষটিকে মিলাইয়া লইতে যাইতেছে,—ভাবিয়া ফটিকের ভারি একটা কৌতূহল হইল।

২

দুইজনে মোহিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মোহিনী তাহারি দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল। পাশে একটা লোহার খাঁচায় একটা টিয়াপাখী। তাহার লাল-টুক্‌টুকে ঠোঁট, দীর্ঘ পুচ্ছ, শ্যাম-চিক্কণ পালক আর সুরঞ্জিত কণ্ঠ। পায়ের কাছে একটা ছোট্ট সাদা বিড়াল-ছানা আরামে ঘুমাইতেছে।

মোহিনী ফটিকের মাকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না। অনেক দিন দেখে নাই—একটু বিহ্বল হইল।

ফটিকের মা—"মোহিনী, ভাল আছিস্" বলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইবা মাত্রই মোহিনী তাহাকে চিনিতে পারিল। "এ্যাঁ—মাসীমা, এ অসময়ে" বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইল। "আমার মত হতভাগিনীর কথা কি কেউ মনে করে—যেদিন মা ছাড়িয়া গেছে—" বলিতে বলিতে মোহিনীর বড় বড় চোখদু'টি ভরিয়া জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাসীমাকে ও ফটিককে বসিতে দিল।

বসিয়া, ফটিকের মা, মোহিনীর মার মৃত্যুর পর একটিবারও মোনীহিকে দেখিতে না আসার নানাপ্রকার ধারাবাহিক সন্তোষজনক কারণ দর্শাইলেন। তারপর, ফটিককে লইয়া বিজয়পুর আসার এক মস্ত ইতিহাস আরম্ভ করিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, ফটিক গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়াছে। এখন সহরের বড় স্কুলে পড়িবে। তাহাদের গ্রাম হইতে সহর পাঁচ ছয় মাইল দূর। বিজয়পুর হইতে সহর খুব নিকট—এক মাইল হইবে। তাই বিজয়পুরে কোন আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়ের বাড়ীতে ফটিকের থাকিবার একটা

বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য কাল সন্ধ্যাবেলা এখানে আসিয়াছেন। পরের কাজে পরে কখন করে না, তাই নিজেই আসিয়াছেন—লোকে যা বলে বলুক। কিন্তু কোনখানে কোন সুবিধা হইল না। তাই ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার মোহিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

এখনো তাহাদের স্নানাহার হয় নাই শুনিয়া মোহিনী তাড়াতাড়ি মাসীমার কথা বন্ধ করিয়া দিল। ফটিক ছেলে-মানুষ। এত বেলা না খাইয়া আছে। মোহিনী দেখিল ফটিকের কাঁচা মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার বড় কষ্ট হইল। ঘরে দুধ ছিল আম ছিল, পা ধুইতে জল দিয়া, তাড়াতাড়ি ঠাঁই করিয়া মোহিনী ফটিককে জল খাইতে দিল। ফটিক কখনও তাহার দুঃখিনী দিদির কথা মনে করে না, তাহার দিদির সংসারে আপনার বলিবার আর কে আছে, যদি বা সৌভাগ্যক্রমে ফটিক একদিন তাহার দিদিকে দেখিতে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার গরীবের ঘরে এমন কিছুই নাই যদ্দারা সে ফটিকের ও মাসীমার অভ্যর্থনা করিতে পারে—ইত্যাদি অনেক কথা মোহিনী এমন সরল ভাবে স্নেহের স্বরে বলিল যে, মোহিনীর আম-দুধের চেয়ে তাহার কথাগুলিই ফটিকের নিকট অধিক মধুর বলিয়া বোধ হইল।

৩

মোহিনী মাসীমাকে স্নানের জল দিয়া রান্নাঘরে গেল। ফটিক দেখিল, মোহিনী বড় স্নেহ করিতে জানে। সে বালিকার মত সরল, কিন্তু জননীর মত স্নেহময়ী। তাহার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু মুখখানি ঠিক বালিকার মত। শরীর রুগ্ন নয়, কিন্তু বড় কৃশ—বড় লঘু। শরীর অত্যন্ত কৃশ বলিয়াই তাহাকে একটু দীর্ঘাকৃতি দেখায়। দেহের এই লঘু কৃশতা তাহার সর্ব্বাঙ্গের কোমলতাকে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কান্তি দান করিয়াছে। রৌদ্র-তপ্ত ক্ষীণা লতাটির মত সে একটু শুষ্ক, কিন্তু বড় কোমল।

তাহাকে 'শ্যামাঙ্গী' বলিলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু তাহাকে গৌরাঙ্গীও বলিতে পারি না। তাহাকে দেখিলেই চঞ্চল বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই সে একটু চঞ্চল। কিন্তু তাহার এ চঞ্চলতার মধ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, এ চঞ্চলতা সজীব সরলতার চিরানু-সঙ্গিনী। তাহার চলা-ফেরায়, কাজ-কর্ম্মে, কথা-বার্ত্তায়—সর্ব্বত্রই এই মৃদু মধুর চঞ্চলতা। তাহার অন্যান্য অঙ্গে যখন এই চঞ্চলতার লীলা বন্ধ থাকে, তখনও তাহার বড় বড় উজ্জ্বল, অসঙ্কোচ চক্ষু দু'টিতে সে লীলার মৃদু-বিকাশ দেখা যায়। মোহিনী বাল-বিধবা। তাই কোন সংযত সসঙ্কোচ ব্যবহারের কৃত্রিম বন্ধন তাহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই, তাই সে একটু চঞ্চল।

প্রকৃতি নিজে মোহিনীকে একটু সংযম দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহাকে কখনও প্রবৃত্তির সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় নাই। তাহার জীবনের উপবনে কখন বসন্ত আসিয়াছিল—তাহা যে সে জানে না, তাহা নহে; আর সে বসন্ত এখনও আছে কি চলিয়া গিয়াছে, তাহারও সে যে কোন খোঁজ রাখে না, তাহাও নহে। তবে তাহার যৌবনে চৈত্রের খর-রৌদ্রের উত্তাপ ও দাহ ছিল না; বৈশা-খের ঝড়-ঝঞ্ঝা কখনও প্রবাহিত হয় নাই, জ্যৈষ্ঠের জোয়ার কখনও তটে আঘাত করে নাই, তাই বসন্তটা কবে আসিল কবে গেল—কি রহিল, সে বিষয়ে মোহিনী কোন হিসাব নিকাশ করে না।

বিধবা মার মোহিনী একমাত্র কন্যা। যতদিন মা ছিলেন, ততদিন মোহিনীর কোনও কষ্ট ছিল না। সে শুনিত বিধবারা বড় দুঃখিনী। কিন্তু কথাটা কতখানি সত্য তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তাহার মার হৃদয়ের অগাধ স্নেহের সেই একমাত্র অধিকারিণী ছিল। বিধবা হওয়ার পর মোহিনী আর শ্বশুর-বাড়ী যায় নাই। শ্বশুরের অবস্থা তত ভাল নয়। মোহিনী মাকে বড় ভালবাসিত। কিন্তু মাকে ভাল-বাসা দিয়া তাহার সমস্তখানি ভালবাসা ফুরায় নাই, অনেকে তাহার ভালবাসার অধিকারী ছিল। মোহিনীর মার একটি লাল রংএর

ছোট গোলগাল সুন্দর শান্ত গাই এখনও আছে। তাহার গলায় হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া তাহার কতক সময় কাটিত। নবজাত ছোট্ট চঞ্চল বাছুরটি যখন উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত, তখন সে কোন শিশু-পুত্রের জননীর চেয়ে নিজেকে কম সুখী মনে করিত না। সে যখন খাইতে বসিত তখন বিড়াল-ছানাটি কাছে না থাকিলে তাহার ভাল খাওয়া হইত না। তাহার খাঁচাটি কখনো শূন্য হইলে তাহার মন বড় শূন্য ঠেকিত। যেদিন সে হরি বসাকের ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া, মারিয়া ধরিয়া, চুমা খাইয়া একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলিত, সেদিন তাহার কোন কাজেই মন লাগিত না। ঠাকুর-বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েরা সকলেই তাহার সখী। বিকালবেলা চুল-বাঁধার সাজ-সরঞ্জাম হাতে করিয়া তাহারা দল বাঁধিয়া মোহিনীর দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

মোহিনীর মার সংসারে কোন অভাব ছিল না। সামান্য কিছু জমি-জমা ছিল। হাতে কিছু নগদ টাকা ছিল—লোকে বলিত অনেক। দুইটি বিধবার সংসারে কিই বা খরচ? বেশ দিন যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ চার-পাঁচদিনের জ্বরে মোহিনীর মার মৃত্যু হইল। মোহিনী চারিদিক অন্ধকার দেখিল। মা ছিল—মোহিনীর সব ছিল। মার অভাবে মোহিনী বুঝিল সংসারে তাহার কেউ নাই,—সে বড় একা। তাহার জীবনের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। সংসারে আর তার কি সুখ? কিন্তু সংসার অরণ্যই হোক্ আর মরুভূমিই হোক্, সংসার ছাড়িয়া ত কোথাও যাইবার উপায় নাই।

তাহার মার কেমন এক পিসী ছিল। সে বুড়ী আসিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু মোহিনী বড় একা। আর বুড়ী বড় একটা মোহিনীর কাছে স্থির হইয়া বসিত না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান বুড়ীর স্বভাব। মোহিনীকে কোন কোন

দিন রাত্রিতে একা থাকিতে হইত। মোহিনীর যা স্বভাব তাহাতে কাহারও মোহিনীর উপর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিধবা মোহিনী যুবতী হইয়াও কোন দুর্নাম-ভাগিনী নয়। ইহা কাহারও কাহারও বড় অসঙ্গত ঠেকিত। তাই কেহ কেহ মোহিনীর সাদা চরিত্রে দুই একটি কালির ফোঁটা ছিটাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। মোহিনী শুনিয়া একদিন মার জন্য বড় কাঁদিল। যাহা হোক্ সমাজের দুর্নাম-ব্যবসায়িনী প্রবৃত্তি এস্থলে কোন প্রকার পোষকতা না পাইয়া অল্পেই ক্ষান্ত হইল।

হরি বসাক সপরিবারে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাড়ীর মেয়ে কয়টির মধ্যে একটি সেদিন জলে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর দুইটির বিবাহ হইয়া গেল। মোহিনীর শূন্য-হৃদয় ভরিয়া তুলিবার মত আর বিশেষ কিছু নাই। এখন তাহার ভালবাসার পাত্র শুধু একটি বিড়ালছানা, একটি টিয়াপাখী আর সেই লাল গাইটি। কিন্তু মার গাইটির কাছে গেলে মার স্মৃতি বড় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠে, তাই মোহিনী আজকাল গাইটির কাছে বড় যায় না। আর পশুপক্ষীকে ভালবাসিয়া মানুষের হৃদয়ের সব আশা মেটে না। মোহিনা মার কথা ভুলিতে পারিল না।

মোহিনীর মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে একদিন হঠাৎ ফটিকের মা ফটিককে লইয়া মোহিনীকে দেখিতে আসিল। তাই মার কথা বলিতে মোহিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল।

৪

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া ফটিকের মা মোহিনীকে বলিলেন, "মা তবে আমরা এখন আসি। অনেক দূরের পথ; ঝড়-বৃষ্টির কথা বলা যায় না।—আর বেলাও বেশী নাই। ফটিক তোর বাড়ী দেখিয়া গেল, এখন হইতে সে মাঝে মাঝে আসিয়া তোকে

দেখিয়া যাইবে। মোহিনী মাসীমাকে অন্ততঃ সে বেলাটা থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে মোহিনী ফটিকের হাতখানি ধরিয়া ফটিকের সুন্দর, উজ্জ্বল, সলজ্জ মুখখানির উপর স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, "ফটিক, ভাই, আমার বড় সৌভাগ্য, তাই আজ তোর চাঁদমুখ দেখিলাম। তা এখনি চলে যাচ্ছিস্। তোর সঙ্গে দুটি কথাও বলিতে পারিলাম না। আজকার রাতখানা থেকে যানা ভাই!" ফটিক মার মুখের দিকে তাকাইল। মা মোহিনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"না মা, আজ আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না। ফটিকের জন্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে আমার কিছুতেই সোয়াস্তি নাই।" মোহিনী মাটির দিকে মুখ করিয়া বলিল—"মাসীমা, আমি একটি কথা বলি, রাখিবে?"

মাসী। কি?

মোহিনী। ফটিক যদি আমার এখানে থাকে তবে দোষ কি?

মাসী। দোষ? সে কি মা? তুই কি আমাদের পর? আমার নিজের যদি একটি মেয়ে থাকিত, আর সে যদি আদর করিয়া ফটিককে কাছে রাখিতে চাহিত, তবে কি ফটিক তাহার কাছে থাকিত না? তবে কথা কি মা, তুমি বিধবা, তোমাকে দেখিবার কেউ নাই। কোথায় আমরাই তোমার সময়-অসময় দেখিব, তা না তোমারি উপর আবার একটি ছেলের ভার চাপাইব? কথাটা ভাল মনে হয় না। এই জন্য তোমাকে কিছু বলি নাই।

মোহিনী। মাসীমা, এতে তুমি কোন সঙ্কোচ বোধ করিও না। আমার ঘরে ত দুটি ভাতের অভাব নাই? ফটিক আমার এখানে থাকিলে বরং আমার অনেক সুবিধা হইবে। একটি পয়সার জিনিস কিনিতে আমাকে সাত

জনকে খোসামোদ করিতে হয়। আর আমি আজ-কাল বড় একা মাসী মা! আর ফটিককে এখানে রাখিতে পারিলে তোমাদেরও মায়া-মমতা বাঁধিয়া রাখিতে পারিব। তবে আমার এখানে থাকিলে ফটিকের খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধা হইবে। সেইজন্য ভাবিতেছি।

মাসীমা। খাওয়া-দাওয়ার আবার অসুবিধা কি মা? আমরাও ত গরীব মানুষ! সোণা-রূপা ত আর খাই না? আর ফটিকের আমার কোন বাছা-বাছি নাই। সময়মত একটু কিছু হইলেই সন্তুষ্ট।

মোহিনীর কাছে থাকিয়া ফটিক বড় স্কুলে পড়িবে—ইহা স্থির হইল। ফটিকের মা তখন হৃষ্টচিত্তে স্থির হইয়া বসিলেন। সে রাত্রির জন্য মোহিনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। ফটিক এতক্ষণ ভারি ব্যস্ত ছিল—কি রকম লোকের বাড়ীতে না জানি থাকিতে হয়। মোহিনী-দিদির কাছে থাকিবার কথায় তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এক দণ্ডেই সে মোহিনীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।

বৎসর গণনায় ফটিকের বয়স ১৬ বৎসর হইয়াছে। চেহারা দেখিলেও তাই মনে হয়। সুগঠিত পরিপুষ্ট গৌর-কান্ত দেহ। চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল লাবণ্যের জ্যোতিঃ। মাথায় বড় বড় চুল—চোখের উপর আসিয়া পড়ে।

গঠন-প্রণালীর পরিমাপ হিসাবে তাহাকে সুন্দর বলা যায় না। মুখখানি যেন একটু বেশী বড়। ললাট, কপোল, চিবুক বড় প্রশস্ত। এক স্বাভাবিক সঙ্কোচ এবং লজ্জায় চোখ দুটি সর্ব্বদাই আনত। তা বয়স ও চেহারা যাই হোক, স্বভাবে সে বড় বালক। বালকের মতনই বড় সরল ও ভয়শীল। আর বালকের মত সে সহজেই ভালবাসে ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়।

বিকালবেলা ফটিক মোহিনীর বাড়ীখানা ঘুরিয়া দেখিল। চারি-দিকে অনেক আম-কাঁটালের গাছ। একটি কাল-জামের গাছে অসংখ্য

কাল-জাম ধরিয়াছে। ফটিক দেখিল গাছে উঠিতে কোন কষ্ট হইবে না। পূবের দিকে একখানা জমি, পরিষ্কার সবুজ দূর্ব্বা-ঘাসে ঢাকা। পাশে এক দিকে একটি কামিনী-ফুলের গাছ—তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল ফুটিয়াছে। অন্যদিকে অনেকগুলি কচি-কচি লাল-ডাঁটা, আর কতকগুলি পুরাণো বেগুণের গাছ। বাড়ীর চারদিক পরিষ্কার—কোথাও একটি আগাছা নাই। কয়খানা ছোট ছোট খড়ের ঘর। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরখানার পূবের কোণে একটি ডালিমের গাছ—লাল রংএর অনেক ফুল ফুটিয়াছে, আর ছোট ছোট ডালিম ধরিয়াছে।

পরদিন সকালবেলা ফটিক বাড়ী চলিয়া গেল। পুস্তকাদি জিনিসপত্র লইয়া আসিবে।

৫

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা মোহিনী কামিনা-গুচ্ছ হইতে একটি একটি ফুল ছিঁড়িতেছিল আর ভাবিতেছিল। জীবনে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবার ছিল না। অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহা তাহার অশান্তির এক প্রধান কারণ। মোহিনী দেখিল তাহার সম্মুখে একটু কর্ত্তব্য উপস্থিত! সে একটা কিছু কাজ হাতে পাইল। আর সে কাজ যতই ছোট হোক—বড় স্নেহের—বড় মধুর। মোহিনীর হৃদয় ইহা বুঝিল। সে বুঝিল না কিসে কেমন করিয়া তাহার শূন্য প্রাণ হঠাৎ ভরিয়া উঠিল। যে প্রাণ এতদিন চৈত্রের বাতাসে কার্পাস-খণ্ডের ন্যায় নিরুদ্দেশ ভাবে কেবলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আজ তাহা যেন একটু স্থির হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। ফটিকের লজ্জানম্র মধুর ভাবটুকুর কথা বার বার মোহিনীর মনে হইতেছিল। ফটিককে কোথায় কি ভাবে থাকিতে দিবে, ফটিককে কি করিয়া কি খাওয়াইবে, সে তার কাছে থাকিয়া মার কথা ভুলিতে পারিবে কি না - ইত্যাদি নানা কথা তাহার মনে হইতেছিল। এমন

সময় তাহার টিয়াপাখীটির উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মোহিনীর মনে হইল সে অনাহারে আছে। মোহিনী তাড়াতাড়ি তাহার অনাহারের ব্যবস্থা করিতে গেল।

৬

আজ সাতদিন হইল ফটিক মোহিনীর বাড়ী আসিয়াছে। সে দিন শনিবার। ফটিক স্কুল হইতে আসিয়া একটু দুধ ও দুইটি আম খাইয়া কোথায় খেলিতে গেছে। আষাঢ়ের নীল নবীন সজল মেঘে চারিদিক্ আচ্ছন্ন। মোহিনী বারান্দায় একটা থাম হেলান দিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। লাল গাইটি দড়ীগাছটি যতদূর সম্ভব টানিয়া লম্বা করিয়া—গলা বাড়াইয়া—দীর্ঘ জিহ্বা প্রসারিত করিয়া একটি অতি কোমল শ্যামল নববিকশিত কদলী-পত্রের আস্বাদ-মানসে বার বার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে। মোহিনী তাই দেখিতেছে। পাশে টিয়াপাখীটি একটি সুপক্ক রক্তবর্ণ লঙ্কার শাঁস খাওয়া শেষ করিয়া একই শব্দ বার বার অতি নীরসভাবে তীব্রস্বরে পুনরুক্ত করিতেছে।

এক নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে মোহিনীর এক নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে—মোহিনী তাহাই ভাবিতেছিল। সেবায় শুশ্রূষায় এত আনন্দ তাহা মোহিনী জানিত না। সে এই সাতদিন ফটিকের জন্য ভাত রাঁধিয়াছে, ফটিককে স্নান করাইয়াছে—খাওয়াইয়াছে—তাহার বিছানা করিয়া পুঁথি গুছাইয়া দিয়াছে। আজ মোহিনী বসিয়া ভাবিতেছে—এর চেয়ে আর রমণীর সুখ কি? সে এতদিন নিজের জন্য রাঁধিয়াছে—নিজে খাইয়াছে—নিজের জন্য ঘর-কন্না করিয়াছে—নিতান্ত না করিলে নয় তাই করিয়াছে;—কলের মত তাহার হাত কাজ করিয়াছে—তাহার মন সেখানে থাকিত না। কিন্তু এই কয়দিনে মোহিনী দেখিল—কাজে আনন্দ আছে—কাজে উৎসাহ আছে—কাজ নীরস নয়। যে কাজে প্রাণের সায় আছে সে কাজ সুন্দর।

মেঘের অন্ধকারের সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিতে লাগিল। ফটিক আসিল না। মোহিনী চিন্তিত হইল। সে ঘরে যাইয়া প্রদীপ জ্বালিল। টিয়ার খাঁচাটি যথাস্থানে রাখিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার হইল। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ফটিক আসিল না। মোহিনী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে রাঁধিবার জন্য চাল ডাল তরকারী সমস্ত বাহির করিয়াছিল—রাঁধিতে গেল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া ফটিকের জন্য অপেক্ষা করিল। অনেক রাত্রি হইল। বৃষ্টি থামিল না। তখন মোহিনী অনুমান করিল, ফটিক তাহার নূতন বন্ধু নিতাইদের বাড়ীতে আছে। বৃষ্টির জন্য আসিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর হইল না। খাওয়ার কথা মনে হইল না। মোহিনী বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হঠাৎ মোহিনীর হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। মোহিনী দেখিল—তাহার শূন্য হৃদয়ের বালুর চর ভাসাইয়া মৃদু-বীচি-মালিনী শান্ত-প্রবাহিনী নব-বারি-পূর্ণাঙ্গী এক স্নিগ্ধ তরঙ্গিণী বহিয়া যাইতেছে। আর সে প্রবাহ ঘেরিয়া এক অস্পষ্টচ্ছায়াচ্ছন্ন অস্ফুট মনোহর জ্যোৎস্নার মায়াময় আবরণ। মোহিনী বুঝিল না—কিসের সে প্রবাহ—কেমন সে জ্যোৎস্না! সে উন্নিদ্রায় সারারাত স্বপ্ন দেখিল—এক ছায়ায়-ঢাকা নিস্তরঙ্গ তটিনী—আর তাহার তীরে শিশুরা খেলা করিতেছে—জলে বালকেরা সাঁতার দিতেছে!

ভোরবেলা ফটিক আসিয়া ডাকিল—'দিদি!' মোহিনী চমকিয়া উঠিল।

৭

সেদিন ফটিক তখনও স্কুল হইতে আসে নাই। মোহিনীর বারান্দায় চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে। মোহিনী কালী চক্রবর্ত্তীর মেয়ে কুমুর চুলের গোছা লইয়া বসিয়াছে—বেণি গাঁথিতেছে। মোহিনী

বলিল—"কুমু, বল ত হেম তোর কে হয়?" কুমু কান্নার সুরে বলিল—"এ্যাঁ—এ্যাঁ—যাও;—আমি আর তোমার কাছে আস্‌ব না।" কুমু বড় ছেলে-মানুষ। সেদিন তার বিবাহ হইয়াছে! হেম তার স্বামীর নাম। বেণু পিছন হইতে মোহিনীর গলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বার বার করিয়া বলিতেছে, "মুনু-দিদি, তোমার ময়না আমাকে দেবে?" বেণুর পাখী-মাত্রই ময়না। মোহিনী—"হ্যাঁ—হ্যাঁ দিব—দিব" বলিয়া বেণুকে আশ্বাস দিল। চারুর পুতুলের জন্য নক্সা-ওয়ালা একখানা কাঁথা আজই সেলাই করিয়া দিতে হইবে—চারুর দাবী। মোহিনী তাহাও স্বীকার করিল। মোহিনীর আজকাল অনেক সখা-সখী জুটিয়াছে। মোহিনী আগেও ছেলে-মেয়ে ভাল বাসিত। কিন্তু আজকাল এই সব শিশু-হৃদয়ের মৌমাছিগুলি মোহি-নীতে কি মধু-চক্রের খোঁজ পাইয়াছে বলিতে পারি না। তাহাকে কেহই ছাড়িতে চায় না। আর যখন ফটিক স্কুলে যাইত—তখন মোহিনী এই শিশু-বন্ধুগুলিকে না পাইলে বড় ব্যাকুল হইত। আনন্দ ও স্নেহের সুধা-রসে যখন তাহার প্রাণ ভরিয়া ছাপাইয়া উঠিত, তখন তাহা অজস্র বিলাইয়া না দিলে সে শান্তি পাইত না।

৮

শ্রাবণের উচ্ছ্বসিত বন্যায় আর অবিরাম বর্ষণে দেশ ডুবু-ডুবু হইয়াছে। মোহিনীর বাড়ীর উঠানটুকু একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসি-তেছে। দশদিন ফটিকের স্কুল বন্ধ। রাত্রি এক প্রহর। ফটিক মোহিনীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে। ফটিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ-খানা আগাগোড়া পড়িয়াছে। মোহিনীকে প্রায় রোজই সে রামায়ণের গল্প শুনায়। ফটিক ধীরে ধীরে ছোট ছোট কথায় বেশ গল্প বলিতে পারে। সে শুধু শেখা-কথা আর শোনা-কথার আবৃত্তি করে না। সে নিজে নিজে একটু ভাবিতে পারে, এবং তাহার হৃদয়ের সুকোমল ভাব-রসে মিশাইয়া তাহার গল্পগুলি বেশ সরস ও মধুর করিয়া

বলিতে পারে। মোহিনী গল্প শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হয়—ফটিকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ফটিক বলে—"দিদি, শুন্‌ছ না?—কি ভাব্‌ছ?" মোহিনী বলে—"ভাব্‌ছি? কৈ না!—তুই বল্‌না!"

আজ প্রায় একমাস হইল মোহিনী ফটিকের কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন বসিয়া বসিয়া মোহিনী ফটিকের একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল। ফটিক বলিল—"কি দিদি, তোমার পড়্‌তে ইচ্ছা করে?" মোহিনী হাসিয়া বলিল—"আমাকে শেখাবি?" প্রথম কয়দিন পুস্তক হাতে করিতে মোহিনীর বড় লজ্জা করিত। এখন সে প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া 'কোমল-কবিতা' নামক একখানা সহজ কবিতার বই আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন গল্প বলা শেষ করিয়া ফটিক মোহিনীকে পড়াইতে আরম্ভ করিল। মোহিনীর পড়িবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু তাহার মন বড় চঞ্চল। ফটিক যখন বুঝায় তখন সে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া শোনে। কিন্তু অনেক সময় ফটিকের বলিবার ভঙ্গীর দিকে সে এতটা মনোযোগ দেয় যে, সে তাহার কথার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। ফটিক যখন জিজ্ঞাসা করে "কি বুঝ্‌লে?" মোহিনী হাসিয়া বলে 'বুঝ্‌লাম'। ফটিক যখন ভৎর্সনার স্বরে বলে—"যাও, তুমি ভাল বোঝও না, আর তোমার মনোযোগও নাই;—এমন কর্‌লে কিছু হবে না", তখন মোহিনীর বড় আনন্দ হয়। সে সব সময় ফটিককে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করে। সেই ফটিক যখন জ্যেষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষকের মত তাহাকে মৃদু তিরস্কার করে, তখন সে নিজেকে ছোট মেয়েটির মত মনে করিয়া ফটিককে এক সস্নেহ কোমল শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে—তাহা তাহার বড় সুন্দর লাগে। সেদিন যখন মোহিনী ফটিকের গায়ে সাবান মাখাইয়া দিতেছিল, তখন বড় স্নিগ্ধ সুধাময় বাৎসল্য রসে মোহিনীর যুবতী-হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজ আবার মোহিনী বালিকার মত বসিয়া ফটিকের

কাছে পড়া বলিতেছে। সে আনন্দে ভাল পড়া বলিতে পারিতেছে না। এটা সেটা বাজে বকিতেছে। ফটিক তখন শুইতে গেল। মোহিনী একটা বালিশ টানিয়া যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

৯

সরলা ও সৌদামিনী মোহিনীর প্রতিবেশিনী। সরলা এক-খানা ডিঙ্গিতে পার হইয়া সৌদামিনীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। সৌদামিনীর কোন কাজ ছিল না, তাই বসিয়া বসিয়া পাণের ধ্বংস করিতেছিল, আর ঠোঁটের লালের উপর লাল রং ফলাইয়া কাল করিয়া তুলিতেছিল। সরলা আসিয়া বলিল—"কি লো সুদু! কি কচ্ছিস্? তোর বাড়ী-ওয়ালার খবর-টবর পাস্ ত?" সুদু সুখে-দুঃখে অভিমানে-আহ্লাদে চোখমুখ বাঁকাইয়া অন্যদিকে তাকাইয়া বলিল—"হুঁঃ!—তুইও যেমন! আমি না ম'লে কি খবর কর্‌বে? তা যাক্ গে, এসেছিস্ ত দুটি অন্য কথা ক'।" সরলা চোখের কোণে ও ঠোঁটদুটিতে বাঁকা হাসি ঈষৎ ফুটাইয়া বলিল, "এক কাজ কর্‌-লেই পারিস্,—একটা ছাত্র-টাত্র বাড়ীতে রাখ্, একা থাকার দুঃখ ঘুচ্‌বে।" সুদু একেবারে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল, হ্যাঁ ভাই ঠিক্ ধরেছিস্! দেখ্‌দেখি মুনু মাগীর রকম! মাগী লাজ-লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে। বুড়ো বয়সে ঐ ছোড়ার সাথে কি রঙ্গটাই কর্‌ছে!

সরলা। ও সব কলির বাতাসে হয়। একালের মাগীরাও যেমন বেহায়া, ইস্কুলের ছোড়ারাও তেমনি ফচ্‌কে! ছোড়াটা আবার ডাকে 'মোহিনী দিদি'! লজ্জায় মরি! 'এঁড়ের পেটের বাছুর বলদের হয় নাতি'। বেশ সম্বন্ধ পাতিয়েছে!

সমাজের মঙ্গল-কামনায় সমাজ-হিতৈষিণী রমণীদ্বয় এইরূপে মোহি-নীর দুশ্চরিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া মোহিনীর মরণের জন্য অন্ধ-কূপোদকে

নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা করিল এবং অন্যান্য অপরাধী ও অপরাধিনীদিগের বিচারে প্রবৃত্ত হইল।

১০

আশ্বিন মাস আসিয়াছে। ক্লান্ত শীর্ণ সাদা মেঘগুলি দলে দলে আকাশ-প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়া বহুদূর গ্রামান্তের তরুশ্রেণীর উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

বিকালবেলা মোহিনী বারান্দায় বসিয়া আছে। উঠানে দুইটি শালিক বেড়াইতেছে। তাহাদের একটি শাবক একঘেয়ে সুরে হাঁ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা সৌদামিনী আসিয়া ধীরে ধীরে মোহিনীর পাশে বসিল। মোহিনী বলিল—'সুদু দিদি যে! বড় যে কপাল! কি মনে করিয়া?' সুদুর মুখ বড় গম্ভীর। মাটির দিকে মুখ করিয়া সুদু বলিল—"মুনু, তোকে বড় আপন মনে করি, তাই তোকে একটা কথা বল্‌ছি রাগ করিস্ না।" মোহিনী সুদুর মুখের দিকে চাহিল। সুদু একটু ভাবিয়া বলিল—"ছাই-কপালী মাগীরা তোর মিথ্যা বদ্‌নাম করে, শুনে বড় কষ্ট হয়"। মোহিনী বুকের মধ্যে একটা বিষাক্ত আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করিল। মুখখানি কালি হইয়া যাইতেছিল। বড় জোর করিয়া আত্ম-সম্বরণ করিয়া মোহিনী শুষ্ক-সুরে বলিল—"মানুষে কার না নিন্দা করে? তা তুই কার কাছে কি শুনে এলি?" সুদু বলিল, "যেই বলুক, আমি বলি পরের জন্য দুর্নাম কিনিয়া কি লাভ?" একথার কোন উত্তর দিতে মোহিনীর ইচ্ছা হইল না—কোন কথাই সে বলিতে পারিল না—সৌদামিনীর সংসর্গ অসহ্য বোধ হইল। সে বলিল—"আর এক সময়ে আসিস্। আমার গরু সারাদিন না খাইয়া আছে।" বলিতে বলিতে মোহিনী উঠিয়া গেল। সৌদামিনীও কুঞ্চিত অধরতলে একটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। এইরূপ একটা কথার

বাতাসের আঁচ কিছুদিন হইল মোহিনীর গায়ে লাগিতেছিল, আজ তাহা একটা বিষাক্ত তীব্র তীরের মত তাহার বুকে আসিয়া লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফটিক আসিয়া ডাকিল—'দিদি!' মোহিনী একটা হাসির আলোকে তাহার মুখের কালো-ছায়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কোমল স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"ফটিক, আজ এত দেরী?" ফটিক আজ একটু সকালেই আসিয়াছে। ফটিক মোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে একদিনের তরেও মোহিনীর মুখে বিষাদ দেখে নাই। সে যেদিন এখানে আসিয়াছে সেইদিন হইতেই দেখিয়াছে মোহিনীর মুখখানি সর্ব্বদাই দর্পণের মত স্বচ্ছ—চন্দ্রকিরণের মত উজ্জ্বল। সে মুখে একদিনের তরেও একটি ক্ষীণতম ছায়া-রেখা অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ আজ এ পরিবর্ত্তন কেন? ফটিক মনে করিল মোহিনীর কোন কঠিন অসুখ করিয়াছে। বলিল—"দিদি, তোমার অসুখ?" মোহিনী বুঝিল তাহার মুখ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বলিল, "অসুখ? কৈ না! যা, তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে পা ধুয়ে আয়; ক্ষিধেয় মর্‌লি।"

১১

একদিন ফটিক স্কুল হইতে আসিতেছে। নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর উপর দিয়া তাহার পথ। ঠাকুর ফটিককে ডাকিল।

নবীন। কি রে ফটিক, কেমন পড়াশুনা হচ্ছে?

ফটিক। হচ্ছে মন্দ না।

নবীন। বাড়ী-টাড়ী আর যাস্‌নে?

ফটিক। ছুটী কই?

নবীন। আর যেতেও বুঝি ইচ্ছে করে না?

ফটিক। ইচ্ছে কর্‌বে না কেন?

নবীন। আচ্ছা রাত্রে আমাদের এখানে এসে আমাদের ননীর সঙ্গে পড়্‌তে পারিস্ না? ননী একা পড়ে।

ফটিক। দিদি একা থাকেন।

নবীন। ও! দিদিকে পাহারা দিতে হয়! বেশ কাজ পেয়েছিস্!

ফটিক চিত্তে সরল ও শান্ত, কিন্তু বুদ্ধি কোন দুষ্ট্ ছেলের চেয়ে কম নয়। সে ঠাকুরের কথার মর্ম্ম বুঝিল। তাহার মনের মধ্যে একটা কালো ছায়া পড়িল, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। মোহিনীর স্নেহের জ্যোৎস্নায় তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি ভরপূর। সেখানে কোন ছায়া জমিতে পারে না।

১২

একদিন ছুটীর পর হেড্-মষ্টার মহাশয় ফটিককে ডাকিলেন।

মাষ্টার। তুই এখানে কার বাড়ীতে থাকিস্?

ফ। মোহিনী দিদির বাড়ী।

মা। সে তোর কেমন দিদি?

ফটিক জানে মোহিনী দিদি, কিন্তু কেমন দিদি, সে খোঁজ নেবার কখন দরকার হয় নাই। সে কিছু বলিতে পারিল না। মাষ্টার মশায় বলিলেন, "হুঁ! তোমার অবিভাবককে আমি জানাইয়াছি। তুমি ওখানে আর থাকিতে পারিবে না। দুই তিন দিনের মধ্যে অন্যত্র ব্যবস্থা কর গে'।"

বালকের কোমল হৃদয়ে লজ্জা, দুঃখ, ক্রোধ একসঙ্গে বাত্যা-বিতাড়িত বাষ্প-কুণ্ডলীর মত ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া তাহার পাঁজর ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। পুস্তকগুলি মেজেতে ছুড়িয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মোহিনী বাহির হইতে ডাকিল—"ফটিক এসেছিস্? ফটিক!" কোন উত্তর নাই।

মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ফটিককে দেখিয়া বলিল—"একি ফটিক? এসেই এমন ক'রে শুয়ে পড়েছিস্ যে?" ফটিক কোন উত্তর দিল না। মোহিনী ফটিকের কাছে গিয়া দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। ফটিক কাঁদিতেছে! মোহিনী তাড়াতাড়ি ফটিককে ধরিয়া তুলিবামাত্র তাহার নিরুদ্ধ অশ্রু-নির্ঝর শত-ধারে উৎসারিত হইয়া উঠিল। মোহিনী উচ্ছলিত স্নেহে ফটিককে বুকের কাছে টানিয়া লইল। কিছু না বুঝিতেই অনর্থক তাহার চোখ ভরিয়া জল আসিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। শেষে একটু শান্ত হইয়া ফটিককে আরও বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"ফটিক, দাদা, লক্ষ্মী, কি হয়েছে তোর? কে তোকে কি বলেছে?" ফটিক কেবল কাঁদিতে লাগিল।

মোহিনীর হৃদয়ের অমৃতময়ী স্নেহ-মন্দাকিনীর মধ্যে ডুবিয়া ফটিকের প্রাণের জ্বালা দূর হইল। ফটিক শীতল হইল। তবু সে কাঁদিতে লাগিল—দুঃখে নহে—আনন্দে। সে আনন্দে ফটিকের সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। নিবিড় যন্ত্রণার অন্ধকারময় জমাট মেঘ যে এত সহজে এমন স্নিগ্ধ সজলোজ্জ্বল হৃদয়ানন্দময় ইন্দ্র-ধনুতে পরিণত হইতে পারে, সে তাহা জানিত না।

ফটিক শান্ত হইল। কিন্তু ফটিকের হৃদয়ের ঐ বিষের স্রোত ফটিকের হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমে মোহিনীর শিরায় শিরায় সংক্রামিত হইতে লাগিল। মোহিনী অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াও ফটিকের নিকট কোন উত্তর পাইল না। কিন্তু উত্তরের আর দরকার হইল না। মোহিনী সমস্ত বুঝিতে পারিল—সমস্ত দেখিতে পাইল।

সেদিন ফটিক কিছু খাইল না। মোহিনীও কিছু খাইল না। মোহিনী ফটিককে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সে যে সব গল্প ভালবাসে সেই সব অনেক গল্প বলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন কথাই জমিয়া উঠিল না। ফটিক বেশী কথাই কহিতে পারিল না।

অন্য দিন ফটিক একাই সমস্ত কথা বলে—মোহিনী কেবল শোনে।

অনেক রাত ধরিয়া মোহিনী ফটিকের কাছে বসিয়া বাতাস দিল—ফটিকের কপালে হাত বুলাইল। ফটিক একটু ঘুমাইল। তখন মোহিনী বুঝিল তাহার বুকের মধ্যে রক্তস্রোত বিষাক্ত আগুনে টগ্‌-বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। মোহিনী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে একটুও বাতাস নাই—নিশ্বাস নিতেই কষ্ট হয়। আবার গিয়া ফটিকের পায়ের কাছে বসিল। সে কি ভাবিতে চেষ্টা করিল,—সমস্ত ভাবনা একসঙ্গে উলোট-পালোট হইয়া জড়াইয়া আসিল—মোহিনী ভাবিতে পারিল না। যখন ফটিক কি-একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সে দেখিল ঘরে আলো আসিয়াছে, আর সেই আলো অন্ধকারে ঢাকিয়া মোহিনীর কেশের রাশ বিছানায় ছড়াইয়া আছে! মোহিনী সারারাত জাগিয়া ভোরবেলা ফটিকের পায়ের কাছেই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

১৩

সেই দিন বেলা দশটার সময় ফটিক স্কুলে যাইতেছে। এমন সময় ফটিকের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিন পরে মাকে দেখিয়া ফটিক সব কথা ভুলিয়া গেল। কিন্তু মার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার উৎসাহ একেবারে দমিয়া গেল। ফটিকের মুখের দিকে না চাহিয়াই মা বলিলেন—"স্কুলে যাস্‌নে। কাপড়-চোপড় পুঁথি-পত্র বা'র কর। তোকে আজই বাড়ী যেতে হবে।"

মাসীকে দেখিয়াই মোহিনীর বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল। রুক্ষ কথা কয়টি শুনিয়া মোহিনীর সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিল—একটা থাম ধরিয়া মোহিনী বসিয়া পড়িল। ফটিকের মুখে কথা সরিল না। "ছুটী—আজ—"এইরূপ একটা কি শব্দ বাহির হইল। মা বলিলেন—"ছুটীর কাজ নাই, আজই চল"। ফটিক পুতুলের মত

দাঁড়াইয়া রহিল। মেঘমুক্ত প্রখর সূর্য্য-কিরণ তাহার আরক্ত ললাট পুড়াইয়া দিতে লাগিল। ফটিকের মা একবার তীব্র কটাক্ষে মোহিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—মোহিনী তাহা জানিল না। তারপর ঘরে যাইয়া তিনি ফটিকের বই কয়খানা, দুইখানা খাতা, কলম পেন্সিল হাতের কাছে যাহা পাইলেন সমস্ত দুইখানা কাপড় ভাঁজ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিলেন। বিচিত্র বর্ণের টিনের বাক্সটি বারান্দায় আনিয়া নামাইলেন। সঙ্গে একটা লোক আসিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নে মাথায় তুলে"। তারপর ফটিককে বলিলেন, "চল্, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে ?" ফটিক বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ফটিকের মা ফটিকের হাত ধরিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। ফটিক মন্ত্রাবিষ্টের মত সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মোহিনী এতক্ষণ সমস্ত স্বপ্নের মত দেখিতেছিল। ফটিক চলিয়া গেল দেখিয়া মোহিনী উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। ফটিককে লইয়া ফটিকের মা কতদূর চলিয়া গিয়াছেন। মোহিনী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মোহিনী বারান্দায় ফিরিয়া আসিয়া একখানা পিড়ী ছিল তাহাতে মাথা দিয়া মাটিতেই শুইয়া পড়িল।

বেলা দুইটার সময় যখন মধ্যাহ্নাকাশের নির্ম্মল-নীলিমা-নিঃসৃত উজ্জ্বল সূর্য্যালোক আসিয়া মোহিনীর বারান্দার উপর ছড়াইয়া পড়িল, তখন সে উঠিয়া ধীরে ধীরে সৌদামিনীর বাড়ীর দিকে গেল। সৌদামিনী দেখিল—মোহিনীর মুখ মৃতের মুখের মত ফ্যাকাশে হলুদে হইয়া গিয়াছে। আর গুচ্ছে গুচ্ছে ধূলি-ধূসর কেশগুলি সেই মুখের অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সৌদামিনী বলিল—"একি লো তোর কি হয়েছে ?" মোহিনী বলিল—"কিছু না, কাল একটু জ্বর হইয়াছিল।" মোহিনীর স্বর শুষ্ক বিকৃত। সৌদামিনীর হাত ধরিয়া মোহিনী ঘরে লইয়া গেল। তারপর যথাসম্ভব সহজ স্বরেই বলিতে লাগিল।—"তুই সে দিন গাইএর কথা বলেছিলি; আমার গরু-বাছুর কয়টি আজই আমি তোকে দিব—তোর

নিতে হবে। একমাস চল্‌বে এমন খড় ভুষি আমার ঘরে আছে, তোকে ভাব্‌তে হবে না। আমার শাশুড়ীর খুব অসুখ—আজ খবর পাইলাম। আমার যাওয়া উচিত—আজই যাব। তুই আমার বাড়ী-ঘর দেখিস্।” সৌদামিনী শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাত-জন্মে কোন দিন মোহিনী শ্বশুর-বাড়ীর নাম করে নাই। কিছুক্ষণ পরে সৌদামিনী বলিল, “তোর শাশুড়ীকে দেখ্‌তে যাচ্ছিস্—সে আর কয়দিন হ'বে? তা গরু-বাছুর আমাকে দিতে চাস্ কেন?” মোহিনী বলিল—“খুব দেরী হতে পারে। যদি ফিরে আসি তবে না হয় আমার গরু আমাকে দিস্।” মোহিনী জোর করিয়া কথা বলিতেছিল। হঠাৎ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্য হইতে একটা কৃষ্ণ-বাষ্পের উচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর দিকে আসিল। সৌদামিনী বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। মোহিনী আসিয়া তাহার কামিনী-গাছের ছায়ায় বসিল। হাতের কাছে একটা ছোট বেল-ফুলের গাছ ছিল। মোহিনী একে একে অনেকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর সেখান হইতে উঠিয়া ঘরে গেল। ঘরে যাইয়া দেখিল, যেখানে ফটিকের বাক্সটি ছিল, আর যেখানে তাহার খাতা পত্র পুস্তকাদি ছড়ান থাকিত, সে স্থান শূন্য। ফটিক একখানা পুরু কাগজে লাল নীল পেন্‌সিল দিয়া অনেক লতা পাতা আঁকিয়া মধ্যে উজ্জ্বল কালি দিয়া বড় বড় অক্ষরে ছাপার মতন করিয়া লিখিয়াছিল—“চিরদিন কখন সমান যায় না।” মোহিনী দেখিল সে কাগজখানা তেমনি রহিয়াছে। আর তার পাশে কয়েকখানা বড় বড় রেলিব্রাদার্সের কাপড়ের ছবি ফটিক লাগাইয়াছিল—তাহাও তেমনি রহিয়াছে। মোহিনীর বুকের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা ধূমাইয়া উঠিল। মোহিনী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় বসিল। তাহার ছোট বিড়াল-ছানাটি পায়ের কাছে আসিয়া মিউ মিউ করিতে লাগিল। মোহিনী কি ভাবিয়া বাচ্ছাটি কোলে তুলিয়া লইল এবং

হরি বসাকের বাড়ীতে যে এক ঘর পাটনী আসিয়া বাস করিতেছিল—ধীরে ধীরে সেইদিকে চলিল। কানাই পাটনীর মেয়েকে দেখিয়া সে বলিল—"কি গো পুঁটী, তোর বাপ কোথায়?" পুঁটী বলিল—"বাবা ও-বাড়ী গেছে—এখনি আস্‌বে, কেন?" মোহিনী বলিল, "তোর বাপ আস্‌লে বলিস্—আমি আজই দীঘলপুকুর যাব, আমাকে একখানা ডুলি দিতে হবে।" এই কথা বলিয়াই মোহিনী চলিয়া আসিতেছিল—আবার কি ভাবিয়া ফিরিল। পুঁটীকে বলিল—"ও পুঁটী, বিড়ালের বাচ্ছা নিবি?" পুঁটী বিড়াল বড় ভালবাসে—মোহিনীর কাছে দুইদিন চাহিয়াছিল। মোহিনী পুঁটীকে বিড়ালটি দিল।

বাড়ীতে আসিয়া মোহিনী খাঁচাটি নামাইল। একদৃষ্টে চঞ্চল-শ্যাম-চিক্কণ বিহঙ্গটীর দিকে তাকাইয়া দেখিল। তারপর খাঁচার দুয়ার খুলিয়া দিল। পাখী কিছুক্ষণ উকিঝুকি মারিয়া বাহির হইয়া উড়িয়া গেল। মোহিনী বলিল—'যা আকাশের পাখী আকাশে উড়িয়া যা।'

পাখী উড়িয়া গেলে মোহিনী বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। ফটিকের স্মৃতি সমস্ত বাড়ী ঘেরিয়া আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছে। মোহিনীর অসহ্য হইল। সেদিন শনিবার। ফটিক এতক্ষণ আসিয়া—'দিদি' বলিয়া ডাকিত—কত কথা বলিত—মোহিনীর মনে হইল। মোহিনী গোয়াল-ঘরে যাইয়া তাহার বড় স্নেহের গাইটির গলা জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুর একটি উচ্ছ্বাস আসিয়া মোহিনীর চোখের তটে লাগিল—চোখ ছাপাইল না।

মোহিনী আর ঘরে গেল না। বাহির হইতে শিকল টানিয়া দরজা বন্ধ করিল। সামান্য কিছু বেলা থাকিতে মোহিনী সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত মায়াজালের মত আপন বসত-বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম, এ।

ত্রিবিগ্রহ-তত্ত্ব

[পুরীধামে লিখিত]

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপাল নীলোৎপল নীলাচল-চূড়ে
একাকী বসিয়া;
সম্মুখে বিপুল বেলা, বায়ুপুঞ্জ মহানন্দে উড়ে
নাচিয়া নাচিয়া।
ঊর্দ্ধে শুভ্র মহাকাশ অসীমায় রয়েছে শয়ান
ধ্যান-নিমগন;
নিম্নে স্বচ্ছ নীলসিন্ধু, ঊর্ম্মি কণ্ঠে ওঙ্কার মহান
ফুটে অনুক্ষণ।

বিস্ময়ে হেরিল রাজা; কবি চক্ষু ফুটিল অন্তরে,
নেত্রে বহে নীর;
মহাকাশ—মহাসিন্ধু—মহাবেলা মরমে সঞ্চা[illegible]
তত্ত্ব সুগভীর।
সৎ—চিৎ—হ্লাদিনীর ত্রিবিগ্রহ, শ্রীমন্দির গড়ি,'
করিলা স্থাপন:—
বলরাম—জগন্নাথ—সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি মরি
করহ দর্শন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।